শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার দ্বিমাসিক

আল-আমীন বার্তা

জানুয়ারি-জুন ২০১৬

সেরা মেধাবীদের সেরা প্রতিষ্ঠান ■ উচ্চতায় অদ্বিতীয় উজ্জ্বলতায় অম্লান

আল-আমীন মিশন

উচ্চ-মাধ্যমিকে ২০১৬-র কৃতীদের হার্দিক অভিনন্দন

487 (97.4%)

ষষ্ঠ

তহমিনা পারভিন

482 (96.4%)

একাদশ

নাজিফা নাসরিন

Appeared	Outstanding 90%–100%	Excellent (A+) 80%–89%	Very Good (A) 70%–79%	Good (B+) 60%–69%
1535	54	752	626	101

৯০ শতাংশ ও তার ওপর নম্বর পাওয়া ৫৪ জন ছাত্র-ছাত্রী

94.6%

নাদিম পারভেজ খান

94%

রহমতুল্লাহ

93.8%

সামিউল গাজী

93.6%

রামিশ মণ্ডল

93.2%

মহ. হেফজুর আলম

93%

দিল রওশনারা

92.8%

সালমান আলি খান

92.6%

মামুন বিন মহম্মদ

92.6%

ইমরান মোল্লা

92.4%

সাহিন হোসেন

92.4%

নাসিরুদ্দিন সেখ

92.2%

রোজিনা পারভিন

92.2%

নাইফ নোয়েল

92.2%

মৌমিতা খাতুন

92.2%

আজমিরা পারভিন

92%

মহ. ইবনুল হাসান

91.8%

নাজমা খাতুন

91.8%

জুলি ফারহানা

91.6%

মহ. ইফতিকার

91.6%

এসহাক আলি

91.4%

সবনম সুলতানা

91.4%

রাইহান সেখ

91.4%

কবীর আলম

91.2%

উম্মে হাবিবা

91.2%

সাইফ আলামিন

91.2%

মহ. রফিকুল ইসলাম

91.2%

আসাফ আলি খান

91%

সেখ সাদরুল আলম

91%

সেখ নিজামুদ্দিন

91%

আসিফ রেজা

90.8%

মহ. মাসুম বিল্লাহ

90.8%

মহ. জাহিদ মণ্ডল

আল-আমীন বার্তা

বিশেষ সংখ্যা ১৪২৩

পরামর্শ পরিষদ
ননীগোপাল চৌধুরী একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান
সেখ মারুফ আজম এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
দিলদার হোসেন একরামুল হক শেখ
আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ
মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস
সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ
সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ
আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স
মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক সেন্ট্রাল অফিস ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা ● **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯
e-mail: alameenbarta@gmail.com
weblink: www.alameenmission.org
facebook.com/alameen.barta

মিশন সমাচার

এবার ফের মাধ্যমিক আর উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অতি অভিজাত বৃত্তে ঢুকে পড়েছে আল-আমীনের বেশ কয়েক জন ছেলে-মেয়ে। এই বিভাগে সেইসব সফল ছেলেমেয়েদের কথা, সমাচার।

ইতিহাসের সামনে আল-আমীন

৬ পাতায়

ফিরে দেখা

গোটা রাজনৈতিক জীবনে কখনও ভিড়ে মিশে যাননি। বরং ভিড়ই তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এই পাতায় সেই অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী শের-এ-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক।

লিখেছেন **জাহিরুল হাসান**

বাংলার মুসলমানের জাগরণকালের এক নেতা

১৯ পাতায়

সূ চি প ত্র

শিক্ষক-শিক্ষার্থী

শ্রেণিকক্ষ কেমন হওয়া উচিত? শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা কী? পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশ কীভাবে হওয়া সম্ভব? শিক্ষক-পড়ুয়ার সম্পর্কটি কেমন হবে?

লিখেছেন **একরাম আলি**

যত্নে মোড়া ক্লাসঘর

১৬ পাতায়

উজ্জ্বল প্রাক্তনী

গত তিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় চিকিৎসক

মহাম্মদ আলি

লিখেছেন **আসাদুল ইসলাম**

২৫ পাতায়

লড়াই করতে করতে এগিয়ে চলেছে জীবন

মনীষা

দেশের অজস্র শিক্ষাঙ্গনে ঘুরেছেন তিনি। মিশেছেন লাখো ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে। মন দিয়ে শুনেছেন তাদের কথা। উত্তর দিয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিটি প্রশ্নের। এখানে সেই প্রশ্নোত্তরের নির্বাচিত অংশ।

সংকলন ও অনুবাদ
একরামুল হক শেখ

৩১ পাতায়

চিরন্তন অনুপ্রেরণা আবদুল কালাম

সাত-পাঁচ

এটি নানান টুকরো-টুকরো বিভাগের সমন্বয়। ভাষা, দেশ, বই, মহাকাশ, কী নেই! রত্নে ভরা আলিবাবার গুহা যেন।

৬০ পাতায়

পাঠকনামা	০৪
সম্পাদকীয়	০৫
পুনর্মুদ্রণ	৪৩
লোককথা	৪৫
শিখরদেশ	৪৮
মুক্তভাষ	৫১
বিশ্ববিচিত্রা	৫৩
রত্ন চতুষ্টয়	৫৬
আমার বাড়ি আল-আমীন	৫৮
হাজার দুয়ারি	৬৫
আমাদের পাতা	৬৯

এতিমদের নিজেদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ সম্পদের সঙ্গে ভালো সম্পদের অদলবদল কোরো না। আর তাদের ধনসম্পদের সঙ্গে সংমিশ্রিত করে গ্রাস কোরো না। নিশ্চয় এটা বড়োই মন্দ কাজ।

— আল-কোরআন, সুরা নিসা, আয়াত ২

যে-জ্ঞান দ্বারা কোনো উপকার হয়নি, তা সেই রত্নাগারের তুল্য, যা থেকে আল্লাহ্‌র পথে কিছুই ব্যয়িত হয়নি।

— মিশকাত শরিফ

প্রবাসীর পত্র

জুলাই-অক্টোবর সংখ্যা

এককথায় অনবদ্য, চমৎকার একটি পত্রিকা। প্রচ্ছদ, সাইজ, পাতা, রঙের সমন্বয় নয়নাভিরাম। বলিষ্ঠ লেখনী। লেখকদের চিন্তাধারার বিন্যাস ও পরিবেশনশৈলীর মধ্যে মুনশিয়ানার ছাপ আছে। ভালোমতো পর্যালোচনার পর বিচারের দাঁড়িপাল্লায় ফেললে মনে হয়, পত্রিকাটি স্কুলের চৌহদ্দির চেয়ে বরং কলেজ পত্রিকার দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়তে চাইছে। এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা পেরিয়ে যাবারও উপক্রম হয়েছে। ওভার অল রিয়েলি ইম্প্রেসিভ।

'পাঠকনামা' ও 'সম্পাদকীয়' খুবই ভালো। মরহুম রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের যে বিস্তৃত কভারেজ দেওয়া হয়েছে, তা সময়োপযোগী। এটি দৃষ্টান্তমূলক ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র গঠনে পথনির্দেশকের কাজ করবে। খুব কম ক্ষেত্রে একসঙ্গে এত তথ্য পাওয়া যায়।

মারজিনার কথাই আমি সবচেয়ে বেশি করে শুনতে চাচ্ছিলাম। দেখতে পেয়ে খুশি হলাম। তার কথাটা খেয়াল করা উচিত যে, সবার হিন্দি ও ইংরেজিটা ভালো করে জানতে হবে। শুধু ভালোভাবে জানতে হবে, তা নয়, ইংরেজি ভাষায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান (সুপিরিয়র নলেজ) থাকা অত্যন্ত সহায়ক ও জরুরি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সবচেয়ে বেশি হয় ইংরেজি ভাষায়। খুব ভালো ইংরেজি জানা থাকলে জ্ঞান আহরণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় ও খুবই দ্রুত জ্ঞান আহরণ ও রপ্ত করা সম্ভব। 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' সুন্দর, উৎসাহব্যঞ্জক ও কাজের।

যেহেতু ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিংকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, সেজন্য স্বাস্থ্য চিকিৎসা প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে। সেভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর্কিটেকচারের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাজকর্ম নিয়েও আলোচনা থাকতে পারে। 'শিখরদেশে'র সায়রা বানুদের গল্প উৎসাহের উদ্রেক করবে। 'বিশ্ববিচিত্রা'র অনুরাষ্ট্রও বেশ মজার। 'হাজার দুয়ারি'র স্কলারশিপের ঠিকানা ও নির্দেশনা খুবই উপকারী।

আষাঢ়-শ্রাবণ ও ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা

'আল-আমীন বার্তা' লেখাটা অনেকটা আরবির মতো করে লেখার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, আমি নিশ্চিত নই। 'দৈনিক আজাদ', 'ইত্তেহাদ', 'ইত্তেকাফ', 'মোসলেম ভারত', 'বেগম' ইত্যাদি বাংলা চালু হরফের ছাঁচেই লেখা হয়েছিল বা হয়ে চলেছে। হয়তো আমরা 'মুসলমান বাঙ্গালী' না 'বাঙ্গালী মুসলমান'— এই নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে এখনও আছি।

'আল-আমীন মেরিট স্কলারশিপ' কি বাংলায় প্রদান করা যায়? আমাদের সময় যাদবপুরে ছিল 'মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ'। চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। পরেরটা বেশি উপযুক্ত বলে মনে হয়।

নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা

'পাঠকনামা' ও 'সম্পাদকীয়' চমৎকার। 'জ্ঞানবিজ্ঞান', 'দৃষ্টিপাত', 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী', 'মুক্তভাষ', 'শিশুর শিক্ষা', 'শিখরদেশ', 'বিশ্ববিচিত্রা', 'সাত-পাঁচ' ইত্যাদি বিভাগ বেশ যত্ন ও পরিশীলিতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। 'মিশন সমাচার' ও 'আমাদের পাতা'র বিন্যাস ভালো। 'হাজার দুয়ারি'র কথাই আমি বেশি করে বলতে চাচ্ছিলাম। সেগুলোর অনেক কভার হয়েছে এখানে।

তবে এসব সামান্য গ্রাফিক রদবদল ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বাদ দিলেও আল-আমীন মিশন ও তার মুখপত্র সমাজের বঞ্চিত অবহেলিতদের নিয়ে যা করেছে ও করে চলেছে, তার কোনো তুলনা নেই। এ-ব্যাপারে কোনো প্রশংসাই পর্যাপ্ত নয়। আল-আমীন আমাদের জাতি ও সমাজের একটা প্রধান গর্বের স্থান নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। ওপরওয়ালা, রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি— সবাই তাদের সহায়ক হোন, এই প্রার্থনা।

খায়রুল আনাম, শিকাগো, ইউএসএ।

একটি মহৎ উদ্দেশ্য

'আল-আমীন বার্তা' নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যাটি আমার অনুজ ও ভাতৃপ্রতিম এক বন্ধু মারফত হাতে আসে। পত্রিকাটির মন-মাতানো প্রচ্ছদ, ঝকঝকে মুদ্রণ নজর কাড়ে। মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজভাবনাকে উসকে দেবার জন্যে এটি উদ্যোক্তাদের একটি মহৎ উদ্দেশ্য মনে হয়। কেননা, এর বিষয়বৈচিত্র্যই সে ইঙ্গিত দেয়। আবুল হাসনাতের 'রবীন্দ্রগানে সুফি-ভাবনা' লেখাটি ভালো লাগল। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের গান ও কবিতাগুলিতে কীভাবে ফারসি-সুফি কাব্যের আত্মীকরণ ঘটেছে, লেখক তা প্রাঞ্জল ভাষায়, মনোজ্ঞ বিশ্লেষণে তুলে ধরেছেন। আবুল হাসনাত তাঁর বক্তব্যকে সুদৃঢ় করার মানসে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে আলোচনা প্রসঙ্গে জগন্নাথ চক্রবর্তী রচিত 'গীতাঞ্জলি অস্তিত্ব বিরহ' গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করে লেখক আফশোস করেছেন এই ভেবে যে, 'তুমি'র মধ্যে 'আমি' লুপ্ত হোক, এই ব্যাকুলতাকে জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্যের, মূলত বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন, সুফি কাব্যের প্রসঙ্গ টানেননি। এ-ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, এতে লেখকের আফশোস করবার কিছু নেই। কেননা, একজন লেখক তো তাঁর প্রজ্ঞা ও বৌদ্ধিক চিন্তাভাবনার নিরিখে এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো বিষয়ের অবতারণা করেন। ফলত প্রসঙ্গটি এখানে অমূলক। যাই হোক, প্রবন্ধটি প্রশংসার দাবি রাখলেও শেষমেষ প্রতিমা ছেড়ে ঢাকের বাদ্যিই বেশি কানে বেজেছে।

'জ্ঞানবিজ্ঞান' বিভাগে অতনুমিথুন মণ্ডলের আদি বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের রহস্যতত্ত্বটি ভালো লাগল। বিষয়টি এমনিতেই খুব জটিল এবং পদার্থবিদ্যায় সম্যক ধারণা না থাকলে বোধগম্য হওয়া শক্ত। তবুও লেখক স্বল্প-পরিসরে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে যে আন্তরিক চেষ্টা করেছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্থান-কালের ব্যাপারটা ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝতে সুবিধে হবে।

পত্রিকাটির 'সাত-পাঁচ' বিভাগে নেহা চৌধুরীর মঙ্গোলিয়া দেশ ও জাপানি ভাষা বিষয়ে লেখাটি তাঁর তথ্য-সন্ধানী দৃষ্টির প্রতি আলোকপাত করে। একটা ভাষা ভালোভাবে জানা থাকলে সেই ভাষাভাষীর মানুষদের ইতিহাসও জানা যায়— কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। 'বিশ্ববিচিত্রা'য় ফরিদা নাসরিনের 'বহু-সীমান্তের নদী' শীর্ষক লেখাটিতে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ ও তার হালফিল অবস্থার কথা স্বল্প-কথায় বোঝানো হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের কেরিয়ার গড়ে ওঠার দিকেও যে পত্রিকাটির উদ্যোক্তাদের সজাগদৃষ্টি আছে, তা 'উচ্চশিক্ষার নানা পথে' শীর্ষক নিবন্ধটি থেকে বোঝা যায়। এখানে দেশ-বিদেশে শিক্ষার নানা দিকের সুলুক সন্ধান রয়েছে। 'সবজান্তা' বিভাগে বিশ্ববিখ্যাত সুরকার ও সংগীত রচনাকার বিটোভেন ও বিশ্বে সাড়াজাগানো 'গ্যালিভার'স ট্রাভেলসে'র লেখক জোনাথন সুইফটের জীবন ও তাঁদের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত রয়েছে। এ ছাড়া ছোটোদের 'আমাদের পাতা'য় মহম্মদ সাইফুল্লাহের ছড়াটি উল্লেখ করার মতো।

সুভাষ বিশ্বাস, কল্যাণী, নদিয়া।

জীবনে সফলতা নানাভাবে আসে। সব সাফল্য সবার নজরে পড়ে না। যখন সবাইকে ছাপিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় কেউ, আলাদা করে দেখা যায় সেই উচ্চশির, সবাই তখন বলাবলি করে— দেখেছেন! অথচ সেই উচ্চশিরের পাশের মাথাটির উচ্চতাও কম নয়, যা বহু পরিশ্রমের ফসল। তবু আমরা গুরুত্ব দিই না তাকে। চোখ আমাদের টেনে নেয় সর্বাপেক্ষা উঁচু মাথাটি।

কয়েক বছর ধরে একটি কথা ইতস্তত হাওয়ায় ভাসছিল— মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে আল-আমীন মিশনের রেজাল্ট খুবই ভালো, তবু র‍্যাঙ্ক হচ্ছে না কেন? সেই যে প্রথম হয়েছিল মাধ্যমিকে একবার, তারপর আর দেখি না কেন?

অথচ প্রতিবছর আল-আমীনের মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল খুঁটিয়ে দেখলে গর্বে বুক ভরে উঠবে।

এ-বছর আল-আমীনের দু-হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। তাদের ফল দেখলে যে-কেউ সবিস্ময়ে বলবেন— এমন উজ্জ্বল রেজাল্ট! কিন্তু সবাই খুঁটিয়ে দেখেননি। তাঁরা চেয়েছেন, আল-আমীনের বেশ কয়েকটি পড়ুয়ার নাম রাজ্যের সব পড়ুয়াকে ছাপিয়ে সবার ওপরে জ্বলজ্বল করুক। প্রতিযোগী মনোভাবই আমাদের এমন করে দেখতে শিখিয়েছে।

তবু অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত উক্তিকে ভুলি কী করে, যেখানে তিনি বলেছেন— বাস্তবতা নিছক একটি বিভ্রম, যদিও এটি যথেষ্ট স্থায়ী!

এই বিভ্রমতা সত্ত্বেও বাস্তবতার স্থায়িত্বকে অস্বীকার আমরা করতে পারি না। আর পারি না বলেই আল-আমীনের সামগ্রিক ফল অত্যন্ত ভালো হলেও বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয় এবারের কয়েক জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর কথা, যারা উচ্চ-মাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে ষষ্ঠ আর একাদশ স্থানে রয়েছে এবং মাধ্যমিকে রয়েছে দশম আর দ্বাদশ স্থানে। এ ছাড়াও কুড়ির মধ্যে রয়েছে আরও কেউ কেউ। এদের সবাইকে আমাদের হার্দিক অভিনন্দন। সমস্ত সফল ছাত্র-ছাত্রীকে অভিনন্দন এই জন্যে যে, তাদের কঠোর পরিশ্রমের আমরা দিনরাতের সঙ্গী এবং সেই পরিশ্রমের মূল্য তারা পেয়েছে।

তবু আমরা মনে রেখেছি, র‍্যাঙ্ক একটি সিলমোহর মাত্র। পড়ুয়াদের মেধার আর শ্রমের এবং আল-আমীনের নিরলস প্রচেষ্টার ওপর এই যে সিলমোহর, এর আয়ু মাত্র এক বছর। পরের বছর আবার পরীক্ষা। আবার ফল বেরোনোর উত্তেজনা। আবার র‍্যাঙ্কের খোঁজখবর।

যারা র‍্যাঙ্ক করল, তাদের যেমন সারাটা জীবন পড়ে আছে নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার, তেমনই আল-আমীনও জানে— তার পথও দীর্ঘ। সেই দীর্ঘ পথে অনেক শিশু-কিশোর আসবে। আসবে তাদের অজ্ঞতা নিয়ে। আসবে মেধা আর কল্পনাশক্তি নিয়ে। আর, অনেকেই আসবে অপরিসীম দারিদ্র্য নিয়ে। তাদের কেউ কেউ পিতৃমাতৃহীনও। সবাইকে সযত্নে লালন-পালন করাই আল-আমীনের ব্রত। বাংলার মানুষের সহযোগিতায় এই ব্রত আল-আমীন মিশন পালন করে যাচ্ছে বিগত তিরিশ বছর। তাঁদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

এবার ফের মাধ্যমিক আর উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অতি অভিজাত বৃত্তে ঢুকে পড়েছে আল-আমীনের বেশ কয়েক জন ছেলে-মেয়ে। এই বিভাগে সেইসব সফল ছেলে-মেয়েদের কথা, সমাচার।

ইতিহাসের

আসাদুল ইসলাম

'আধুনিক শিক্ষা-বিমুখ একটা জাতি নতুন করে জেগে উঠতে চাইছে একটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। রাজ্যের প্রায় তিন কোটি মানুষের স্বপ্ন-প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে আল-আমীন মিশন। স্বপ্ন পূরণ করতে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী আল-আমীনের সংস্পর্শে আসতে চাইছে, ন-হাজার পড়ুয়া-সহ দশ হাজার সদস্যবিশিষ্ট আল-আমীন পরিবারের সদস্য হতে চাইছে। প্রতিবেশী সমাজের সঙ্গে সেরার দৌড়ে এগিয়ে যাওয়ার যে-স্বপ্ন, তা সফল করতে আল-আমীনকেই যেন দায়িত্ব তুলে দিতে চাইছে রাজ্যের প্রায় তিন কোটি সংখ্যালঘু মানুষ। সেই কারণেই আল-আমীনের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা তালিকায় দেখতে চাওয়ার প্রত্যাশা। প্রত্যাশা পূরণের জন্যে আল-আমীন মিশনকেই বেছে নেওয়াটা যথেষ্টই সম্মানের। একটা জাতির স্বপ্ন-প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার চেয়ে বড়ো সম্মানের আর কী হতে পারে?' আল-আমীন মিশনের মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল নিয়ে যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় 'আল-আমীন বার্তা'য়, গতবছর প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে নেওয়া উদ্ধৃত অংশ এটি। এখন প্রশ্ন হল আল-আমীন মিশন সংখ্যালঘু সমাজের তুলে দেওয়া এই দায়িত্ব কতখানি পালন করতে পারছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু করব আর-একটা উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে তুলে ধরার পর। 'এ-বছর (২০১৪) মাধ্যমিক পরীক্ষায় মিশনের ৬১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম হয়েছে রিজিয়া সুলতানা। শুধু মিশনের মধ্যেই নয়, গোটা রাজ্যে যে সাড়ে দশ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে সম্ভাব্য ত্রয়োদশ স্থান রিজিয়ার। রিজিয়া পেয়েছে ৬৭০ নম্বর। গতবছর (২০১৩) প্রথম হওয়া শরিয়াতুল্লাহ পেয়েছিল ৬৬৬ নম্বর। এখন মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিকের ফল বের হলে রাজ্যের মানুষ খোঁজ নেয়—প্রথম দশ জনের মধ্যে আল-আমীনের কেউ নেই?' এবার এই প্রত্যাশা পূরণে আল-আমীন মিশন কতটা সফল হচ্ছে, সেটা দেখা যাক।

২০১৩ সালে মাধ্যমিকে ৬৬৬ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে প্রথম হয়েছিল সেখ শরিয়াতুল্লাহ। ২০১৪ সালে ৬৭০ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে প্রথম এবং রাজ্যস্তরে ১৩-তম স্থান পেয়েছিল রিজিয়া সুলতানা। ২০১৫ সালে ৬৬৫ নম্বর পেয়ে মিশন-সেরা হয়েছিল মহম্মদ হাসিব হোসেন। রাজ্যস্তরে তার স্থান ছিল ১৯-তম। আর এ-বছর, ২০১৬-র মাধ্যমিকে মিশনের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক শাহারুক নাওয়াজ রাজ্যস্তরে দশম হয়ে মেধা-তালিকায় প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে। রাজ্যস্তরে মাধ্যমিকে প্রথম হওয়ার রেকর্ডও অর্জন করেছে আল-আমীন মিশন। ২০০৭ সালে মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছিল মিশনের ছাত্র মহম্মদ আরিফ সেখ। মাধ্যমিকের

সাফল্যের উচ্ছ্বাস। বাঁ-দিকে উচ্চ-মাধ্যমিকের ছেলে-মেয়েরা। ডাইনে মিশনের সাধারণ সম্পাদককে ঘিরে মাধ্যমিকের ছেলে-মেয়েরা।

সামনে আল-আমীন

মতো জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে তৃতীয়, পঞ্চম, দশম হওয়ার নজির তো আছেই। আর প্রতিবছর প্রথম একশোয় থাকে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী। দু-একজন পড়ুয়া এক বছর বিচ্ছিন্নভাবে এমন ফল করেছে, তা কিন্তু নয়। গতবছর যেমন প্রায় ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী মেডিকেল জয়েন্ট এন্ট্রান্সে প্রথম ২৫০০-এর মধ্যে র‍্যাঙ্ক করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও মাধ্যমিকের মতো উচ্চ-মাধ্যমিকে মেধা-তালিকায় স্থান পাওয়ার মতো ফল এতদিন মিশন করতে পারেনি। সে-আক্ষেপও মিটেছে এ-বছর। মিশনের ছাত্রী তহমিনা পারভিন রাজ্যস্তরে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে এ-বছর। মেধা-তালিকায় প্রথম দশে স্থান করতে পারেনি মানে এই নয়, অনেক পেছনে ছিল মিশনের ছেলে-মেয়েরা। যেমন গতবছর মিশনের ছাত্র সৈয়দ রামিজুল কবীর রাজ্যস্তরে ১৬-তম স্থান পেয়েছিল। প্রথম দশের থেকে প্রায় প্রতিবছরই মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের ৫-৭ নম্বর কম থাকত। এই সামান্য ফারাক ঘুচিয়ে এ-বছর ষষ্ঠ স্থানের পাশাপাশি ১১-তম স্থানও পেয়েছে মিশনের অন্য এক ছাত্রী নাজিফা নাসরিন। আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেবল একজন বা দু-জন এমন রেজাল্ট করেছে, তা কিন্তু নয়। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কতটা ভালো, তা বিচার করার ক্ষেত্রে কেবল সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের নম্বর বিচার্য হতে পারে না। সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ফল কেমন, তা তুলনা করে দেখতে হবে। আল-আমীন মিশন এদিক থেকেও রাজ্যের শুধু সংখ্যালঘু সমাজের মিশন বা স্কুলগুলোর চেয়ে অত্যন্ত ভালো ফল করেছে, এমন নয়, বরং সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু মিলিয়ে রাজ্যের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তুলনীয় ফল করছে ধারাবাহিকভাবে। সেই প্রতিবেদনই আমরা প্রতিবছর পেশ করছি আপনাদের সামনে। এবার আমরা এ-বছরের সার্বিক ফলের ওপর নজর দেব। এ-বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা, দোলাচল তৈরি হওয়ায় জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল পরীক্ষার ফলকে আপাতত বাদ দিয়ে শুধু মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার ফলই আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল।

এ-বছর আল-আমীন মিশনের বারোটি বালক শাখা ও পাঁচটি বালিকা শাখা থেকে মোট ৭৭৮ জন ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। গোটা রাজ্যে এই সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৭ জন। এতজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে আল-আমীন মিশনের ছাত্র। দশম হয়েছে শাহারুক নাওয়াজ। আল-আমীন মিশনের পাথরচাপুড়ি শাখার ছাত্র শাহারুক পেয়েছে ৬৭৪ নম্বর। পঞ্চম শ্রেণিতে মিশনে ভর্তি হয়েছিল সে। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার ছেতিয়ানি গ্রামে বাড়ি শাহারুকদের। তার আব্বা নাজিমুদ্দিন শেখ বিদ্যালয়ের অস্থায়ী কেরানির কাজ করেন। মা শাহনাজ বেগম আশাকর্মী। শাহারুক যেমন দশম স্থান পেয়েছে, তেমনি তার এক ধাপ পরে দ্বাদশ স্থান দখল করেছে আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখার ছাত্রী ইবতেসাম ফারহাদ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৭২। নদিয়ার পলশোণ্ডা

মাধ্যমিকে দশম, ৬৭৪ (৯৬.২%)। শাহারুক নাওয়াজ।

গ্রামে তাদের বাড়ি। আব্বা আবদুর রাকিব মণ্ডল ছোটো ব্যাবসা চালান। গ্রামেই একটি কাপড়ের দোকান আছে তাঁর। মা সাকিনা বিবি গৃহবধূ। পঞ্চম শ্রেণি থেকে আল-আমীন মিশনে পড়াশোনা করছে ইবতেসাম। শুধু শাহারুক, ইবতেসাম নয়, এমন একশো জন ছাত্র-ছাত্রী ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে। ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা সামান্য কমেছে গতবছরের তুলনায়। একটু অনুসন্ধান করে জানা গেল, শুধু আল-আমীন মিশন নয়, সার্বিকভাবে এ-বছর ৯০ শতাংশের বেশি পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। গতবছরের চেয়ে এ-বছর 'O' (৯০ থেকে ১০০ শতাংশ) পাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা ১২ হাজার কমেছে (তথ্যসূত্র: এই সময়, ১১ মে ২০১৬, পৃ. ১)। ৯০ শতাংশের বেশি পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরিসংখ্যান থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। আল-আমীন মিশন থেকে এ-বছর ৯০ শতাংশের বেশি পাওয়া ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম ৮০ জনের তালিকা আছে হাতের কাছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ৮০ জনের মধ্যে ২৭ জন মেয়ে। অর্থাৎ ৩০ শতাংশের বেশি ছাত্রী। যদিও এ-বছর পরীক্ষা দেওয়া মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ৩০ শতাংশের চেয়ে সামান্য কম। সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের মেয়েদের অগ্রসরতার একটা স্পষ্ট চিহ্ন ধরা পড়েছে এখানে। অন্যদিকে এ-বছর ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৪৮৭ জন। ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে ৭৪৮ জন। এবার আমরা যাব কিছু পড়ুয়ার লড়াইয়ের গল্পে। যারা বাধার প্রাচীর টপকে উজ্জ্বল ফল করতে পেরেছে, আল-আমীন মিশন পাশে থাকার ফলে। আল-আমীন মিশন সমাজের মানুষের অনুদানে গড়ে ওঠা সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রাজ্যের নামি স্কুলগুলোর সঙ্গে তুলনীয় ফল করলেও ওইসব প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কয়েক গুণ কম বেতনে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে সংখ্যালঘু সমাজের ছেলে-মেয়েরা, এই কারণেই। শুধু তাই নয়, সমাজের অসংখ্য মানুষ নানাভাবে আল-আমীন মিশনকে সহযোগিতা করে চলেছেন। আল-আমীন কর্তৃপক্ষের দায় থাকে ভালো ফল করার জন্য, দুঃস্থ-মেধাবীদের সহায়তা করার। বর্তমানে আল-আমীন মিশনের ২৫ থেকে ২৬ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিনা বেতনে পড়াশোনা করে। আর ছাড়প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬০ শতাংশের বেশি। বার্ষিক প্রতিবেদনে আমরা মাত্র কয়েক জন ছাত্র-ছাত্রীর কথাই তুলে ধরতে পারি। সবার সঙ্গে কথা বলার বা সবার কথা লেখার সুযোগ এবং পরিসর নেই। এ-বছর যে কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলা গেছে, তাদের দু-একজনের কথা বলা যাক। প্রথমেই বলব মাহিবুরের কথা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার লেদার কমপ্লেক্স থানার ভাটিপোতা গ্রামে বাড়ি মাহিবুর রহমান মোল্লার। ক্লাস সিক্সে আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল সে। সেবার তার আব্বাই তাকে মিশনে দিয়ে গিয়েছিলেন। মিশনে থাকার সময় মাঝে মাঝে বাড়ির জন্য মনখারাপ হলে সে মিশনের ফোন থেকে ফোন করে সবার সঙ্গে কথা বলত। কথা হত না শুধু আব্বার সঙ্গে। মা বলতেন, কাজে গেছেন। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে যখন দেখে আব্বা নেই, তখন মাকে জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারে তার আব্বার ক্যান্সার। কিছুদিন পর মাহিবুরকে এতিম করে দিয়ে আপন দেশে পাড়ি দেন তার আব্বা। আল-আমীন মিশন দায়িত্ব নেয় তার। সেই মাহিবুর এবার মাধ্যমিকে পেয়েছে ৯১.৫ শতাংশ নম্বর। ভবিষ্যতে সে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হতে চায়। কেন হতে চায়, সে কি আর বলার দরকার আছে? অন্যদিকে বীরভূমের নলহাটির চারসোরা গ্রামের রিজওয়ানুজ্জামান মোল্লার কথাই ধরুন। এবার মাধ্যমিকে সে পেয়েছে ৯৪.৮ শতাংশ নম্বর। সামান্য এক বিঘা জমি আর মা দিলারা বিবি বাচ্চাদের পড়িয়ে যে সামান্য রোজগার করেন, তা দিয়েই সংসার চলে তাদের। আল-আমীন রিজওয়ানুজ্জামানের দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি তার ছোটোভাইয়েরও দায়িত্ব নিয়েছে। এবার মাধ্যমিকে ৯৩ শতাংশ নম্বর পাওয়া ইয়াসমিন খাতুন গণিত নিয়ে গবেষণা করতে চায়। তার আব্বা জুতো কারখানার কর্মী, মা আইসিডিএস-এ রান্নার কাজ করেন। সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দিরের এই প্রাক্তন ছাত্রী সপ্তম শ্রেণি থেকে আল-আমীন মিশনে পড়ছে। অঙ্কের মতো বিষয়ে পড়াশোনা

মাধ্যমিকে দ্বাদশ, ৬৭২ (৯৬%)। ইবতেসাম ফারহাদ।

করে আকাশ ছুঁতে চাইছে সে। পায়ে দারিদ্র্যের বেড়ি পড়ানো থাকলেও তাকে এমন স্বপ্ন দেখার সাহস জুগিয়ে চলেছে আল-আমীন মিশন। আর একজনের কথা শুনে আমরা এই বৃত্তান্ত শেষ করব। কারণ, এ-বৃত্তান্ত শেষ হওয়ার নয়, সে-কথা আপনাদের আগেই বলেছি। এ-বছর উচ্চ-মাধ্যমিকে ষষ্ঠ হওয়া তহমিনা পারভিনকে নিয়ে হইচই হল খুব। মিশনের আর-এক তহমিনা, যে তহমিনা খাতুন, এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। লড়াইয়ের নিরিখে এই তহমিনাও কুর্নিশ পাওয়ার দাবিবার। মাধ্যমিকে ৯২.১ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে তহমিনা। ওদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার নবগ্রামে। তার আব্বার পড়াশোনা অষ্টম শ্রেণি, আর মা লেখাপড়া জানেনই না। আব্বা রেজাউল হক তেলেভাজা বিক্রি করে সংসার চালান। তেলেভাজা বিক্রেতা রেজাউল হকের কন্যা তহমিনা খাতুন ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এমন পরিবারে এ এক বড়ো স্বপ্ন! প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের মতো আল-আমীন মিশনও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ছোটো স্বপ্ন দেখা পাপ, অলওয়েজ ড্রিম বিগ। আল-আমীন মিশন এই ভাবনাকে কতটা সঞ্চারিত করতে পেরেছে ছেলে-মেয়েদের মনে, তা তহমিনাদের ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন থেকেই স্পষ্ট।

এবার আসি উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলে। এ-বছর রেকর্ড সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল আল-আমীন থেকে। মোট ১৫৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল এবার। গত কয়েক বছর থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ক্রমাগত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। যেমন ২০১৩ সালে মিশন থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৯২১ জন। ২০১৪ সালে সেটা বেড়ে হয় ১৩৮৯ জন। ২০১৫ সালে দিল ১৩৫৯ জন। আর এ-বছর ১৫৩৫ জন। দেখা যাচ্ছে, মাধ্যমিক দেওয়া ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় অনেক বেশি ছেলে-মেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। এটা কেন, মনে হতেই পারে। এই কেনর উত্তরে জানিয়ে রাখি, এর পেছনে আছে আল-আমীন মিশনের সমাজোন্নয়নমুখী গভীর চিন্তা-ভাবনা। আমরা সকলেই জানি, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ-মাধ্যমিকের ফল একটা বড়ো বিষয়। বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে সম্ভাবনাময় পেশামুখী কোর্সে ও ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন ভালো রেজাল্ট। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে তাই যত বেশি ছেলে-মেয়েদের গড়ে দেওয়া যাবে তত বেশি একটা পরিবার উপকৃত হবে, সমাজ উপকৃত হবে। এই ভাবনা নিয়েই উচ্চ-মাধ্যমিকের ওপর জোর দিচ্ছে মিশন। গত দু-বছর থেকে মিশন আরও একটি বিষয়ে বাড়তি নজর দিচ্ছে। এতদিন উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে মূলত পড়ার সুযোগ পেয়ে আসছিল ছাত্র-ছাত্রীরা। খুব সীমিত স্তরে অল্প কয়েক জন কলা বিভাগে পড়ার সুযোগ পেত। আমরা জানি ভবিষ্যৎ-জীবনে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। তবু এটাও ঠিক যে, কলা বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করেও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব। অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী কলা বিভাগকেই প্রাধান্য দিতে চায়। ওইসব ছাত্র-ছাত্রীদেরও যাতে গড়ে তোলা যায়, সেই লক্ষ্যে আল-আমীন মিশন ছাত্রদের জন্য একটি ক্যাম্পাসে এবং ছাত্রীদের জন্য তিনটি ক্যাম্পাসে কলা বিভাগ শুরু করেছে। এ-বছর ছাত্র-ছাত্রী মিলে ৬৫ জন কলা বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। ১৫৩৫ জনের মধ্যে বাকি ১৪৭০ জন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে ছাত্র ৯৮১ জন এবং ছাত্রী ৪৮৯ জন। উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়া মোট ১৫৩৫ জনের মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করেছে ৫৪ জন। ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৮০৬ জন। ৭০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ১৪৩২ জন। ১৫৩৫ জনের মধ্যে ৬০ শতাংশ পেয়েছে ১৫৩৩ জন। এই ফল এককথায় অবিশ্বাস্য। সার্বিক এই ফল সরিয়ে রেখে এবার আমরা কয়েক জন ছাত্র-ছাত্রীর ফলের দিকে নজর দেব।

উচ্চ-মাধ্যমিকে ষষ্ঠ, ৪৮৭ (৯৭.৪%)। তহমিনা পারভিন।

এ-বছর আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী তহমিনা পারভিন রাজ্যস্তরে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। মহম্মদ আরিফ সেখ মাধ্যমিকে প্রথম হওয়ায় যেমন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনই ২০১৬ সালে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। তহমিনার হাত ধরে ২০১৬ সালটা আল-আমীন মিশনের সাফল্যের ইতিহাসে বিশেষ বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

প্রথমেই বলব তহমিনার কথা। আগেই আপনাদের জানিয়েছি, এতদিন মাধ্যমিক ও জয়েন্ট এন্ট্রান্সে আল-আমীন মিশনের পড়ুয়ারা একাধিক বার প্রথম দশের মেধা-তালিকায় স্থান করে নিতে পারলেও উচ্চ-মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে তা অধরা ছিল। ২০১৬ সালে আল-আমীন মিশন সেই মাইলস্টোনও স্পর্শ করল। এ-বছর আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী তহমিনা পারভিন রাজ্যস্তরে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। মহম্মদ আরিফ সেখ মাধ্যমিকে প্রথম হওয়ায় যেমন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনই ২০১৬ সালে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। তহমিনার হাত ধরে ২০১৬ সালটা আল-আমীন মিশনের সাফল্যের ইতিহাসে বিশেষ বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল। তহমিনার বাড়ি কুচবিহার জেলার দিনহাটা থানার নাটাবাড়ি গ্রামে, যে-গ্রামে না আছে ভালো স্কুল না আছে বিজ্ঞান

উচ্চ-মাধ্যমিকে একাদশ, ৪৮২ (৯৬.৪%)। নাজিফা নাসরিন।

আল-আমীন মিশনকে অনুসরণ করেই এইসব মিশনগুলো গড়ে উঠেছে। তহমিনার বুনিয়াদি শিক্ষার বেশিরভাগটাই মিশন-শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই এগিয়েছে। ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত সে পড়েছে রহমতে আলম মিশনে। আল-আমীন মিশনে তহমিনা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। রহমতে আলম মিশনে একাদশ শ্রেণিতে পড়ার সুযোগ থাকলেও আল-আমীন মিশনে আসা কেন? এ-সম্পর্কে তহমিনা চমৎকার এক উত্তর দিয়েছে। সে-উত্তর আমরা এখানে আপনাদের জানাচ্ছি না। 'আল-আমীন বার্তা'র পরবর্তী সংখ্যার 'শিখরদেশ' বিভাগে সে-কথা বিস্তারিত আপনাদের জানাব। শুধু একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, আল-আমীন মিশন প্রতিবছর যে-ফল দিয়ে চলেছে, শুধু চমৎকৃত করার মতোই নয়, মেধাবীদের আকর্ষণেরও মূল বিষয় এটাই। তহমিনার কথায় ফিরে আসি। তহমিনা আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল ২০১৪ সালে। তার আব্বা আয়ুব আলি মিঞা গ্র্যাজুয়েট, ব্যাবসা করেন। মা উচ্চ-মাধ্যমিক পাস, গৃহবধূ। মোট ৪৮৭ নম্বর পাওয়া তহমিনার পড়ানোর মতো ভালো শিক্ষক। তহমিনার মামা আসাদুজ্জামান এলাকার মেধাবী পড়ুয়া। আল-আমীন মিশনের উজ্জ্বল প্রাক্তনী। বর্তমানে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হওয়ার লক্ষ্যে এমডি করছেন। মামার দেখানো পথেই তহমিনাদের পরিবারের চার জন এখন বিভিন্ন আবাসিক মিশনে পড়াশোনা করছে। শুধু তহমিনাদের পরিবার বা ওর মামাদের পরিবার নয়, এলাকার বহু ছেলে-মেয়ে এখন আবাসিক মিশন-মুখী। আবাসিক মিশন আন্দোলনের এও এক অন্যতম সফলতার দিক। রাজ্যের মেধাবী পড়ুয়াদের সযত্নে লালন করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। আল-আমীন মিশনের কাছে এটাও বড়ো পাওনা। কেননা, বিষয়ভিত্তিক নম্বর— বাংলায় ৯৭, ইংরেজিতে ৮৫, অঙ্কে ১০০, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৭, রসায়নে ৯৯ এবং জীবন বিজ্ঞানে ৯৪। তহমিনার এই চোখ-ধাঁধানো ফলের কারণ কী? সেটা শুনি তহমিনার মুখ থেকেই, 'আল-আমীন মিশনের স্যার-ম্যামদের অসাধারণ পড়ানোর পদ্ধতি আর সব সময় তাঁদের সহযোগিতা। আমি ক্লাসটা খুব মন দিয়ে শুনতাম। আর খুব প্র্যাকটিস করতাম। প্র্যাকটিস মানে একটা থিয়োরি পড়লাম, তারপর ওই থিয়োরির ওপর কতরকম প্রশ্ন আসতে পারে, তা দেখতে, খাতায় বার বার লিখতাম। একটু আটকালেই স্যারদের কাছে চলে যেতাম। এত ভালো ভালো স্যারদের সব সময়ের জন্য পাওয়া, এটা একটা বড়ো ফ্যাক্টর, যা আল-আমীন মিশন জুগিয়েছে সব সময়। বন্ধুদের মধ্যে যেমন আন্তরিকতা আছে, তেমন প্রতিযোগিতাও আছে। আরও ভালো ফল করার ক্ষেত্রে এটা বিরাট কাজে দেয়। আর আছে সেক্রেটারি-স্যারের উৎসাহমূলক বক্তব্য— এসবই আমাকে আরও ভালো করে পড়ার প্রেরণা জুগিয়েছে।' তহমিনার মতো অসংখ্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে আল-আমীন মিশনের যেমন বড়ো ভূমিকা আছে, তেমনি এমন মেধাবীদের ধাত্রীভূমি হয়ে ওঠাটাও আল-আমীন মিশনের কাছে যথেষ্ট গর্বের।

এরপর আসি আর-একজন মেধাবী পড়ুয়ার কথায়। এ-বছর উচ্চ-মাধ্যমিকে রাজ্যস্তরে ষষ্ঠ স্থানের পাশাপাশি ১১-তম স্থানও অর্জন করেছে আল-আমীন মিশনের পড়ুয়া। ৯৬.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যস্তরে ১১-তম স্থান করা পড়ুয়ার নাম নাজিফা নাসরিন। নাজিফার বাড়ি মালদা জেলার রতুয়া থানার বাহিরকাপ গ্রামে। এমন গ্রাম, যেখানে না আছে ভালো স্কুল না ভালো শিক্ষক। নাজিফার আব্বাও একজন শিক্ষক। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তিনি অসুস্থ। প্রতিকূল পরিস্থিতি হওয়ার কথা ছিল না। তিন ভাই-বোন-সহ পাঁচ জনের পরিবারে দুর্বিপাক নেমে এসেছে। এই প্রতিকূলতা ঠেলেই এগিয়ে চলেছে নাজিফা। সে মিশনে ভর্তি হয় পঞ্চম শ্রেণিতে। আল-আমীন মিশনের ধুলিয়ান শাখায় দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর, উচ্চ-মাধ্যমিকটা পড়েছে উলুবেড়িয়া শাখা থেকে। ভবিষ্যতে সে চিকিৎসক হতে চায়। মিশনের সার্বিক ফল আগে জানিয়েছি, মিশনের দুই সেরা পড়ুয়ার কথাও বললাম। এবার আমরা কিছু লড়াকু ছেলে-মেয়ের কথা বলব, যারা লড়াই করে উজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করেছে। এইসব ছেলে-মেয়ের কথা আমাদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের মনে নতুন শক্তি জোগাবে। তালিকা অনেক লম্বা, সবার কথা জানানো যাবে না, মাত্র কয়েক জনের কথাই আপনাদের জানানো যাবে। প্রথম জন মৌমিতা খাতুন। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার স্বরূপনগর থানার ঢোকরা গ্রামে বাড়ি মৌমিতার। মৌমিতার আব্বা আসাদ ঢালি মাধ্যমিক পাস। চাষের কাজ করেন। সম্বল মাত্র এক বিঘা জমি। মৌমিতার মা সামসুন নাহার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। মৌমিতা পঞ্চম শ্রেণিতে আল-আমীন মিশনের পাথরচাপুড়ি শাখায় ভর্তি হয়েছিল। ক্লাস টেন পর্যন্ত সামান্য বেতন দিলেও, উচ্চ-মাধ্যমিকে কোনো বেতনই দিতে হয়নি তাকে। মৌমিতা উলুবেড়িয়া শাখা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে মিশনের সহায়তায় ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে অপর এক ছাত্র মহম্মদ ইবনুল হাসান। বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সন্দেশখালি থানার সরবেড়িয়া গ্রামে। সে সপ্তম শ্রেণিতে মিশনের খলতপুর শাখায় ভর্তি হয়েছিল। তার আব্বা এ কে নুরুজ্জামান স্নায়ুর রোগে আক্রান্ত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরি তিনি খুইয়েছেন অসুস্থতার কারণে। মা হাসনুআরা বিবি বিঘে দুই জমির ফসলকে সম্বল করে তিন ছেলে-মেয়েকে মানুষ করছেন। ইতিমধ্যে ইবনুলের দাদা মহম্মদ ইমতিয়াজ হোসেন তাদের পরিবারের জন্য নতুন আশার আলো বয়ে এনেছেন। আল-আমীন মিশনের এই প্রাক্তনী

৯৬.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যস্তরে ১১-তম স্থান করা পড়ুয়ার নাম নাজিফা নাসরিন। নাজিফার বাড়ি মালদা জেলার রতুয়া থানার বাহিরকাপ গ্রামে। এমন গ্রাম, যেখানে না আছে ভালো স্কুল না ভালো শিক্ষক।

হাসিব মোল্লা। র‍্যাঙ্ক ৩৮৮।
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আল-আমীনের মধ্যে প্রথম।

বর্তমানে ডাক্তারি পড়ছেন। আর ইবনুল এবার ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করল। সেও ডাক্তার হতে চায়। আল-আমীন মিশন তার স্বপ্ন পূরণে সার্বিক সহযোগিতা করে চলেছে। নদিয়া জেলার চাপড়া থানার পদ্মমালা গ্রামের জুলি ফারহানার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখা ছিল আরও কঠিন। তার আব্বা হোসেন মোল্লা বাস কন্ডাক্টরি করেন। পারিবারিক আয় বলার মতো নয়। তবু জুলি ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এই স্বপ্ন দেখার সাহস জুগিয়ে চলেছে আল-আমীন মিশন। সেই পঞ্চম শ্রেণি থেকে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ সে পেয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জুলি তার স্বপ্ন পূরণের পথে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পেরেছে। এবারকার উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পেয়েছে ৯১.৮ শতাংশ নম্বর। লড়াই-কথন শেষ করছি ইশাক আলির কথা বলে। ইশাকের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার খানাবাড়ি গ্রামে। দুই দাদা, আর তিন দিদি-সহ আট জনের বৃহৎ সংসারে একমাত্র রোজগেরে ইশাকের আব্বা। বিড়ি বেঁধে কোনোরকমে সংসার চালান। ইশাক আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল ক্লাস ফাইভে। এবার উচ্চ-মাধ্যমিকে সে পেয়েছে ৪৫৯ নম্বর, শতাংশের হিসেবে ৯১.৮ নম্বর। ইশাক এই নম্বরকে পুঁজি করে ডাক্তার অথবা পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হতে চায়। এমন স্বপ্ন দেখার সাহস সে অর্জন করেছে আল-আমীন মিশনকে পাশে পেয়ে। প্রায় বিনা বেতনেই পড়ার সুযোগ পেয়েছে ইশাক আলি।

এবার আমরা আসব জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফলে। এ-বছর আল-আমীন মিশন থেকে প্রথম ১৫০০০-এর মধ্যে র‍্যাঙ্ক করেছে ১১০ জন পড়ুয়া। এই ১১০ জন, আশা করা যায়, ভালো কলেজে পছন্দমতো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে। ৫০০০-এর মধ্যে র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৪১ জন পড়ুয়ার। ১০০০০-এর মধ্যে র‍্যাঙ্ক করেছে ৮৬ জন। সার্বিক এই ফলের পাশাপাশি এবার আমরা কিছু উজ্জ্বল পড়ুয়ার ফলের দিকে নজর দেব।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এ-বছর আল-আমীন মিশন থেকে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক করেছে হাসিব মোল্লা। তার র‍্যাঙ্ক ৩৮৮। হাসিব মোল্লার বাড়ি বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার সারাংপুর গ্রামে। আব্বা রফিক মোল্লা চাষবাস করে সংসার চালান। মা সাহিদা মোল্লা গৃহবধূ। হাসিবের একমাত্র দাদা কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ায় আপাতত পড়াশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান হাসিব আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল ২০১৩ সালে, একাদশ শ্রেণিতে, আল-আমীন মিশনের বর্ধমান শাখায়। উচ্চ-মাধ্যমিকে দু-বছর এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স কোচিংয়ের এক বছর— মোট তিন বছর হাসিব এক চতুর্থাংশেরও কম বেতন দিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে। হাসিব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়তে চায়। হাসিবের আজকের এই স্বপ্নের জাল বোনার পিছনে আল-আমীন মিশনের তিন বছরের পঠনপাঠন ও আর্থিক সহায়তা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে আল-আমীন মিশনের সূর্যপুর শাখার ছাত্র হাসিবুল ইসলাম জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪৩০ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে। হাসিবুলের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার কালিকাহারা গ্রামে। হাসিবুলের আব্বা উজির সেখ এবং মা সামসুন্নাহার বিবি। দু-জনেই পড়াশোনা জানেন না। চাষবাস করে কোনোরকমে সংসার চালান উজির সাহেব। চার পুত্র ও তিন কন্যার বৃহৎ পরিবারে পড়াশোনা করা আর বিলাসিতা করা সমার্থক। তবু হাসিবুলের পরিবার ওই বিলাসিতা করার সাহস দেখিয়েছে আল-আমীন মিশন পাশে দাঁড়ানোর জন্য। হাসিবুল আল-আমীন মিশনের ধুলিয়ান শাখায় ভর্তি হয়েছিল একাদশ শ্রেণিতে। উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৫.৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করার পর এক বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোচিং নেয় সূর্যপুর শাখা থেকে। সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়ে হাসিবুলের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে সহায়তা করেছে আল-আমীন মিশন। হাসিবুল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায়।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪৩৫ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মধ্যে তৃতীয় হয়েছে সরিফুল মোল্যা। সরিফুলের আব্বা আবুল কালাম মোল্যা পড়াশোনা জানেন না। কৃষি-শ্রমিক হিসেবে যা সামান্য রোজগার করেন, তাই দিয়ে ছ-জনের সংসার নির্বাহ করেন। এই দুঃস্থ ছাত্রটি আল-আমীন মিশন থেকে শুধুমাত্র জয়েন্ট কোচিং নিয়েছে দু-বছর। সম্পূর্ণ ফ্রিতেই সে এই সুযোগ পেয়েছে। জয়েন্টে ভালো ফল করতে গেলে যে মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিকে দুর্দান্ত ফল করতেই হবে, এমন ভাবনা যে ভুল, তার প্রমাণ আমরা অনেক সময়ই পেয়েছি। সরিফুলও এই কথাকে আরও একবার প্রমাণ করল। সরিফুল মাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ এবং উচ্চ-মাধ্যমিকে ৬৮.৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। মনের জোর আর আল-আমীন মিশনের নিবিড় প্রশিক্ষণই তার সাফল্যের কারণ বলে জানিয়েছে সে। সূর্যপুর শাখার আর-এক ছাত্র মাসুম ইকবাল জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উজ্জ্বল ফল করেছে। তার র‍্যাঙ্ক ৫৮৯। কালিয়াচক আবাসিক মিশন থেকে মাধ্যমিক পাস করার পর আরও ভালো ফল করার আশা নিয়ে মাসুম একাদশ শ্রেণিতে আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল। ৮৮.৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করার পর এক বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স কোচিং নিয়েছে সে। মালদা জেলার চাঁচল থানার ধানগড়া গ্রামের এই সন্তান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। নদিয়া জেলার চাপড়া থানার আড়ংসরিষা গ্রামের সঞ্জয় মণ্ডল পঞ্চম শ্রেণি থেকে আল-আমীন মিশনে পড়েছে। আব্বা সাইদুল মণ্ডল ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছেন। চাষবাস করে সংসার নির্বাহ করেন। আল-আমীন মিশন আর্থিক সহায়তা দিয়ে এই ছাত্রের পাশে না দাঁড়ালে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করা সহজ হত না। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে ৭৭ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করেছে সঞ্জয়। বেলপুকুর শাখায় সে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়লেও জয়েন্ট কোচিং নিয়েছে সূর্যপুর শাখা থেকে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এ-বছর তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৮৮৫। সে ভবিষ্যতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। গত তিরিশ বছর ধরে শয়ে শয়ে এমন ছাত্র-ছাত্রী লালন করে চলেছে আল-আমীন মিশন। তহমিনা-নাজিফা-জুলি-ইবনুল-ইশাকদের স্বপ্ন যেমন জীবনে বড়ো হওয়ার, তেমনি আল-আমীন মিশনের আজন্ম স্বপ্ন সমাজের এইসব মেধাবীদের লালনভূমি হয়ে ওঠার। এই স্বপ্নকে বুকে ধরেই এগিয়ে

হাসিবুল ইসলাম। র‍্যাঙ্ক ৪৩০।
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আল-আমীনের মধ্যে দ্বিতীয়।

চলেছে আল-আমীন মিশন। প্রতি বছর যে আল-আমীন মিশন চমকপ্রদ ফল করছে, তার রহস্য কী? অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দেবেন। আমি এ-বছর নিজের চোখে একটি দৃশ্য দেখলাম। ওই দৃশ্য দেখার পর আমার কাছে সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের দিন আল-আমীন মিশনের কলকাতার সেন্ট্রাল অফিসে গিয়েছিলাম। ফল প্রকাশ হওয়ার পর জানা গেছে মিশনের ছাত্র দশম স্থান অধিকার করেছে। ছোটো ছোটো সফল উজ্জ্বল মুখে অফিস ভরে উঠলেও দশম হওয়া শাহারুক নাওয়াজ কোথায়? মুর্শিদাবাদে বাড়ি আর পাথরচাপুড়িতে শাহারুক পড়ত। সেখান থেকে সে আসছে। শাহারুকের আসতে বেলা অনেকটাই গড়িয়ে যায়। সব শাখার ফল নিয়ে সকলে মেতে আছেন সার্বিক ফল তালিকাবদ্ধ করার কাজে। সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম সার্বিক তদারকি করছেন। এই আসছে এই আসছে করতে করতে জানা গেল শাহারুক ঢুকছে। সবাই তাকে দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। হইচই হচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকেই। কিন্তু হঠাৎ সেসব থেমে গেল। কী হল? চোখ ফেরাতেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। দরজা ঠেলে শাহারুক ঢুকতেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন নুরুল ইসলাম। এবং কাঁদছেন। সন্তানকে জড়িয়ে ধরে যেমন কাঁদেন পিতা, ঠিক তেমনভাবে। রোগা-পাতলা শাহারুকের চোখেও জল। দুঃখে অনেককে কাঁদতে দেখেছি, কিন্তু আনন্দে এই প্রথম কাউকে কাঁদতে দেখলাম। তিরিশ বছর আগে যে-আবেগ আর ভালোবাসা নিয়ে নুরুল ইসলাম আল-আমীন মিশন শুরু করেছিলেন, তা আজও একইরকমভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন, মলিন হতে দেননি। বুকের ভিতর জমিয়ে রাখা নিখাদ আবেগ আর অমলিন ভালোবাসাই আল-আমীন মিশনের সম্পদ। তিন দশক পার করে আসার পরেও এই আবেগ আর ভালোবাসা এতটুকু কমেনি। হয়তো এই কারণেই উচ্চতায় আজও অদ্বিতীয় আল-আমীন মিশন। প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসা আর ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসা— সাফল্যের রহস্য লুকিয়ে আছে এখানেই। আর কোনো রহস্য নেই। সত্যিই নেই।

রাজ্যের সব শাখায় প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত

রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে ছড়িয়ে থাকা মিশনের সমস্ত আবাসিক ও অনাবাসিক শাখায় গত ২৬ জানুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় ৬৭-তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। সবচেয়ে বড়ো অনুষ্ঠান হয় মিশনের মূল ক্যাম্পাস হাওড়ার খলতপুরে। এখানে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। তিনি এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হয়, যদিও ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট থেকেই দেশ স্বাধীন। দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় এবং সমৃদ্ধিতে আমাদের সবারই অবদান থাকা জরুরি। মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম বলেন, শুধু আজকের দিন নয়, সারা বছরই আমাদের সবাইকে দেশপ্রেমের চর্চা করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে শিক্ষক মহম্মদ মদত আলির পরিচালনায় সমবেত সংগীত 'আমরা করব জয় নিশ্চয়'-এর মাধ্যমে শেষ হয় অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য, গত ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২০-তম জন্মজয়ন্তী খুবই উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে মিশনের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হয়েছে ।

প্রাক্তন ও বর্তমান পড়ুয়ার মেলবন্ধন

আল-আমীন উৎসব ২০১৫-র দ্বিতীয় দিন গত ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠান-মঞ্চে মিশনের কয়েক জন প্রাক্তনীর ঘোষণা— তাঁরা মিশনের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোনদের জন্য কিছু উপহার প্রদানে আগ্রহী। গত ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের মহান দিনে ২০০৩-এর মাধ্যমিক ও ২০০৫-এর উচ্চ-মাধ্যমিকের প্রাক্তনীদের মধ্যে কয়েক জন মিশনে হঠাৎই হাজির। সঙ্গে তাঁরা নিয়ে এসেছেন তাঁদের উপহার— দুটো এয়ার কুলার ও দুটো অ্যাকোয়াগার্ড। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইন শেখের নেতৃত্বে প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েক জন প্রাক্তনী হলেন সাবির আলি মণ্ডল, মহিউদ্দিন, দীপ খান, আতাউর রহমান, জাহির আব্বাস প্রমুখ। তাঁদের স্যার এম নুরুল ইসলাম, সেখ মারুফ আজম, এম আব্দুল হাসেম প্রমুখের সঙ্গে মিশনের উন্নয়ন ও বিস্তার নিয়ে নানান কথাবার্তা ছাড়াও সারাদিন ধরে চলে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে অনুপ্রেরণামূলক আলাপ-আলোচনা।

তালদিতে আল-আমীনের নতুন শাখা

৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদিতে মিশনের একটি নতুন শাখার শুভ উদ্‌বোধন করেন আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রদের পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকলেও চোদ্দো বিঘার এই ক্যাম্পাসে বালিকা বিভাগ পরে চালু হবে। জন্মলগ্ন থেকেই রাজ্যের দুঃস্থ ও মেধাবী পড়ুয়াদের পাশে থেকেছে মিশন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ মহম্মদ নাসিরউদ্দিন, মিশনের প্রাক্তনী ও স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক নজরুল ইসলাম, এই শাখার তিনজন ভূমিদাতা আলহাজ জিয়াদ আলি সরদার, আলহাজ গিয়াসুদ্দিন সরদার, সোবেদ আলি সরদার প্রমুখ।

হরিহরপাড়ায় নতুন শাখার উদ্‌বোধন

বহরমপুর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে থানা-শহর হরিহরপাড়ায় একটি নতুন শাখার উদ্‌বোধন করেন আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। হরিহরপাড়া ইসলামিক মিশন কর্তৃপক্ষের দানকৃত জমিতে ও তাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনেই আল-আমীন একাডেমি, হরিহরপাড়ার পথ চলা শুরু। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি দিয়ে শুরু হলেও ভবিষ্যতে এই ক্যাম্পাস একটি আদর্শ শাখায় উন্নীত হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এলাকায় মিশনের শাখা হওয়ায় শিক্ষানুরাগী মানুষেরা স্বভাবতই খুশি। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রহমান (বেলডাঙা), জিয়াউর রহমান ও হাজি খোদাবক্স (হরিহরপাড়া)। বর্তমানে এই শাখার তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মনিরুল ইসলাম।

মহম্মদপুরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১২ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা ব্লকের মহম্মদপুর ক্যাম্পাসে বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। এই শাখার সামগ্রিক উন্নতিতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, গত ২০১৪ সালে মাধ্যমিকের ছাত্রপ্রতি গড় নম্বরে এই শাখা

মিশনের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে ছিল, যা কম কৃতিত্বের নয়। তাঁর আশা এই শাখাও মিশনের উৎকর্ষ বজায় রেখে একটি আদর্শ ক্যাম্পাসে পরিণত হবে। মিশনের হিতৈষী আবুল খায়ের এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। পড়ুয়াদের প্রার্থনাঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিন কাঠা জমি দেওয়ার কথা তিনি এই শুভক্ষণে ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক আবু তাহের খান, দুই ইঞ্জিনিয়ার শাহাদত হোসেন খান এবং জাকির হোসেন-সহ বহু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। সমবেত দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ত্রিপুরায় মিশনের প্রথম শাখার উদ্‌বোধন

উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য 'ভারতের সাত কন্যা' নামে পরিচিত। সাত কন্যার অন্যতম অসমে দু-বছর আগে প্রথম শাখা স্থাপনের পর সম্প্রতি ত্রিপুরাতেও পথ চলা শুরু হল মিশনের। দেড় দশক আগে ত্রিপুরার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বাহারুল ইসলাম মজুমদার এক দৈনিক পত্রিকা মারফত আল-আমীন মিশনের কথা জানতে পেরে কৌতূহলবশত খলতপুর ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন এবং মুগ্ধ হন। তাঁরই উদ্যোগে ত্রিপুরার কয়েক জন মেধাবী ছাত্র খলতপুর ক্যাম্পাসে পড়াশোনা করে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের সাফল্যে উৎসাহিত বহু বিশিষ্ট জন মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের রাজ্যে একটি শাখা খোলার অনুরোধ জানান।

রাজধানী আগরতলা থেকে সাতাশ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লক-শহর বক্সানগর। এখানেই গত ৭ ফেব্রুয়ারি মিশনের ৫১-তম শাখা আল-আমীন মিশন একাডেমি, বক্সানগরের শুভ উদ্‌বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী সাহিদ চৌধুরী। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় শিক্ষার হার বাড়লেও সব ক্ষেত্রে গুণগত মান বজায় থাকছে না। আল-আমীনের শিক্ষা-উৎকর্ষ এই অবস্থার পরিবর্তনে সহায়ক হবে বলে তাঁর প্রত্যাশা। বর্তমানে ভাড়াবাড়িতে শুরু হলেও, ভবিষ্যতে মিশনের অন্যান্য শাখার মতো এটিও আদর্শ পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পাসে পরিণত হবে বলে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম জানান। উল্লেখ্য, প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল পঁচিশ জন পড়ুয়া চলতি শিক্ষাবর্ষে নবম ও দশম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। আগামী বছর ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ভর্তি নেওয়া হবে। বিজ্ঞানী বাহারুল ইসলাম মজুমদার, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও বহু শিক্ষানুরাগী মানুষের সমাগম ঘটে এই অনুষ্ঠানে।

বক্সানগর শাখার উদ্‌বোধন করছেন ত্রিপুরার মাননীয় মন্ত্রী সাহিদ চৌধুরী। সঙ্গে বাহারুল ইসলাম মজুমদার ও এম নুরুল ইসলাম।

সূর্যপুর শাখায় বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ

আল-আমীন মিশন পিছিয়ে-পড়া সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে সামনের সারিতে তুলে আনার কাজ করে চলেছে। এই মিশন থেকে অনেক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সমাজ পাচ্ছে, যা খুবই আশাপ্রদ। তবে নিজের গ্রাম ও সমাজকে কোনো অবস্থাতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই অভিমত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জীর। মিশনের সূর্যপুর ক্যাম্পাসে তিন দিন ব্যাপী বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কৃতী ছাত্র সংবর্ধনার শেষ দিন গত ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ওই কথাগুলো বলেন তিনি। উল্লেখ্য, প্রথম দিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও দ্বিতীয় দিন আবৃত্তি, গজল, নাত-এ-রসুল ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন পাঠ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত ভাষণে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, বিগত কয়েক বছরে মিশন পরিবারের কর্মক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে দেশের কয়েকটি রাজ্যে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু মিশনের মূল কাজ অর্থাৎ অভাবী-মেধাবীদের লালনপালনে আমরা বরাবরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি উপস্থিত পড়ুয়াদের শিক্ষান্তে জীবিকার ময়দানে ছড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একজন আদর্শ নাগরিক হওয়ার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মেহেদি কালাম বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন। পড়ুয়াদের সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন দেওয়াল পত্রিকা 'কারুবাকী'র উদ্‌বোধন করেন এম নুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান চলাকালীন মূকাভিনয় এবং শেষে একাঙ্ক নাটক 'চোখে আঙুল দাদা' উপস্থিত সবাইয়ের প্রশংসা লাভ করে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিশন পরিবারের দাদু ননীগোপাল চৌধুরী, সমাজসেবী আলহাজ মহিউদ্দিন সরকার, ইউনুস সরকার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও মিশনের সূর্যপুর শাখার সুপারিনটেন্ডেন্ট সেখ রাজীব হাসান প্রমুখ।

পাথরচাপুড়িতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১ ও ২ মার্চ পাথরচাপুড়ি শাখায় অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বালক ও বালিকা ক্যাম্পাসে দুটি পৃথক আয়োজনে সানন্দে অংশ নিয়ে মেতে ওঠে ছাত্র ও ছাত্রীরা। সমবেতভাবে পড়ুয়াদের মার্চ পরিক্রমা, বিদ্যালয়-প্রার্থনা ও জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং শপথ-বাক্য পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। প্রথম দিন বিভিন্ন বিভাগের বাছাইপর্ব এবং দ্বিতীয় দিন প্রতিটি বিভাগের ফাইনালে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীরা জয়ের আনন্দ উপভোগ করে। ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ছিল আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা। শেষে 'যেমন খুশি তেমন সাজো'য় ছাত্র-ছাত্রীদের বৈচিত্র্যময় উদ্ভাবনে চমৎকৃত হয় উপস্থিত সবাই। দু-দিনের ক্রীড়া উৎসবের পরের দিনই আয়োজিত হয় ভোজন উৎসব। তিন দিনের এই আনন্দোৎসবের অনুপ্রেরণায় ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন উদ্যমে পঠনপাঠনের মধ্যে ফিরে যায়।

পাটনায় ও রাঁচিতে নতুন শাখা

ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমের আল-আমীন মিশনের প্রথম ক্যাম্পাস আল-আমীন মিশন একাডেমি, পাটনা শাখার শুভ উদ্‌বোধন করেন পাটনা শহরের প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সমাজসেবী ডা. আহমেদ আব্দুল হাই। পাটনার আনিসাবাদের আলিনগরে এই শাখাটি বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ৪০ জন ছাত্রী

নিয়ে যাত্রা শুরু করে ১২ জুন। জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল কোচিংয়ের জন্য আরও ৩০ জন ছাত্রীকে ভর্তি নেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, মিশনের ইতিহাসে আজ একটি স্মরণীয় দিন। কারণ, সিবিএসসি-র পাঠক্রম অনুযায়ী মিশনের এটিই ছাত্রীদের প্রথম শাখা। তিনি জানান এখানকার ছাত্রীরা একাদশ শ্রেণি থেকেই জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলের জন্য প্রস্তুত হবে। রাঁচির প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডা. মাজিদ আলম ও পাটনার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. এ কে সিদ্দিকির উদ্যোগে এই শাখাটি গড়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. কামরান হাসমি, অধ্যাপক ইয়াকুব আশরাফি,বিশিষ্ট সমাজসেবী আফজল হোসেন প্রমুখ।

১১ জুন ঝাড়খণ্ডের রাঁচি শহরের পুণ্ডাগে আল-আমীন মিশন একাডেমি, রাঁচি শাখার উদ্‌বোধন করেন ডা. মাজিদ আলম। ছাত্রদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমের এই শাখাটি বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ২৫ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হয়েছে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল কোচিংয়ের জন্য আরও ২৫ জন ছাত্রকে এখানে ভর্তি করা হবে।

পাঁচুড় শাখায় ইংরেজি মাধ্যমের সূচনা

১৬ জুন আল-আমীনের পাঁচুড় শাখায় একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ইংরেজি মাধ্যমের সূচনা করেন সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, এটি পশ্চিমবঙ্গে মিশনের উচ্চ-মাধ্যমিকের ইংরেজি মাধ্যমের প্রথম শাখা।

তিন দশক আগে মাত্র ১১ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হওয়া মিশনের ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে প্রায় ১১০০০ জন। সাধারণ সম্পাদক আশা প্রকাশ করেন, এখন ১০ জন পড়ুয়া এই ইংরেজি শাখায় পড়াশোনা করলেও আগামীতে ভারত জুড়ে তা কয়েক হাজারে পৌঁছোবে। তিনি আরও বলেন, মিশনের পঞ্চাশের বেশি বাংলা মাধ্যম শাখায় যেভাবে পড়াশোনার মান ও উৎকর্ষ বজায় আছে, তেমনই থাকবে ইংরেজি মাধ্যমেও। ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড (বিশেষভাবে সক্ষম) পড়ুয়াদের জন্যও এখানে একটি বিভাগ চালু আছে বলে তিনি জানান। তাতে এখন অল্প সংখ্যক ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করলেও, আফিয়া জাহিন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিভাগটির প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট সমাজসেবী শাহাজান মোল্লার উদ্যোগ সর্বাধিক। পাঁচুড় শাখার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই জড়িত এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী আলমগীর ফকির উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা সবসময় চাইব তোমাদের অসাধারণ ফল, কিন্তু তোমরা আমাদের কাছে আরও কী চাও, তা জানতেও আমরা আগ্রহী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী শাহাজান মোল্লা, সেখ আবদুল আজিজ প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন এই শাখার অধ্যক্ষ দিলদার হোসেন।

মিশন-বন্ধু অনিল ভট্টাচার্য

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে নিয়ে তাঁর গবেষণা ও কাজকর্ম বিজ্ঞানের প্রসার ও সমাজ চেতনায় এক অমূল্য সম্পদ। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই মানুষটি অনিল ভট্টাচার্য। জন্ম ১৯৪৪ সালের ২০ এপ্রিল, মুর্শিদাবাদের নওদা থানার জগাইপুর গ্রামে। বাবা ফণীভূষণ ভট্টাচার্য, মা সরলা দেবী। বহরমপুরের কে এন কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় সম্মানিক স্নাতক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। পড়া-শেষে জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান ১৯৬৭ সালে। ১৯৭১ সালে যোগ দেন বারাকপুরের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজে এবং সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন ২০০৪ সালে। এই কলেজে যোগদানের সময় থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ। ১৯২৬ সালে প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (WBCUTA)-এর দশ বছর যুগ্ম-সম্পাদক ও আরও দশ বছর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটিঅ্যান্ড কলেজ টিচার্স অর্গানাইজেশন (AIFUCTO)-এরও নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। তাঁরই সম্পাদনায় ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন'— প্রথমে তাঁর কর্মস্থল প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজ থেকে, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, বাংলা ও ইংরেজিতে। ইউজিসি-র অনুদানে সম্পাদনা করেন 'রিসার্চ পেপারস অব আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়— এ কমপ্লিট কালেকশন'। তাঁর সাম্প্রতিক সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ 'পি সি রে— এ রেভলিউশনারি ন্যাশালিস্ট ইন পুলিশ রেকর্ডস অ্যান্ড আদার ডকুমেন্টস'। প্রকাশক কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা। বইটির অর্থমূল্য ১২৯৫ টাকা। এই বইটির লেখক হিসেবে গ্রন্থস্বত্ব-বাবদ প্রাপ্ত পুরো অর্থটাই তিনি দান করেছেন আল-আমীন মিশনকে। বইটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে এককালীন দশ হাজার টাকা তিনি তুলে দেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের হাতে গত ৯ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে।

পাঁচুড় শাখায় জেলাশাসক পি বি সেলিম

২২ জুন ২০১৬-য় আল-আমীনের পাঁচুড় শাখায় 'জাতি গঠনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলাশাসক পি বি সেলিম। সেমিনারের শুরুতে অধ্যক্ষ দিলদার হোসেন পি বি সেলিমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। পুষ্পস্তবক ও মেমেন্টো দিয়ে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম প্রসঙ্গক্রমে

বলেন, দিনটি মিশনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ, পি বি সেলিম শুধুমাত্র একজন দক্ষ প্রশাসক নন, ছাত্র-ছাত্রী-সহ সবার জন্যই এক অনন্য অনুপ্রেরণা। সেলিম তাঁর ছাত্রজীবনের নানান ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, পড়ুয়াদের এখন থেকেই ঠিক করে নিতে হবে, তারা ভবিষ্যতে কী হতে চায়। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে তাদের কঠোর পরিশ্রমে অবিচল থাকতে হবে। তবেই আসবে সফলতা। দেশ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকা চাই। সংখ্যালঘু সমাজে শিক্ষার প্রসারে আল-আমীনের প্রশংসা করে বলেন, পিছিয়ে-পড়া সমাজের উন্নয়নে মিশনকে আরও বহুমুখী কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এই শাখার সভাপতি আলমগীর ফকির, সমাজসেবী শাজাহান মোল্লা, আনসার আলি মোল্লা, মহম্মদ কালাম মালি প্রমুখ। সেমিনার শেষে মিশন ক্যাম্পাসে ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হয়।

প্রয়াত নাসিমা খাতুন

(২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮—৬ এপ্রিল ২০১৬)

মানুষ মাত্রেই মরণশীল, সবাই জানি। তবু কোনো কোনো মৃত্যু আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে, আমরা বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যাই। মরণের অতিকায় ভারে চৈতন্য নিষ্পিষ্ট হতে হতে পরাজয় মেনে নেয়। তেমনই একটি আচমকা মৃত্যু গোটা আল-আমীন পরিবারকে স্তব্ধ করে দিয়ে গেল ৬ এপ্রিল।

সে-দিন আল-আমীন মিশনের সবার প্রিয় শিক্ষিকা নাসিমা খাতুন প্রয়াত হন (আমরা আল্লাহ্‌র কাছে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাব।)।

প্রতিটি মৃত্যুই শোকের। তবু আবাল্য মিশনের ছাত্রী না হয়েও, গোটা মিশন কেন ভেঙে পড়ল তাঁর মৃত্যুতে? মাত্র কয়েক বছরেই সবার এতটা আপনজন হয়ে উঠলেন কোন গুণে?

২০০২ সালের ২ অগাস্ট যোগ দেন মিশনে। অনাথ পরিবারে তিন মেয়েসন্তানের জ্যেষ্ঠা তিনি। এসেছিলেন মেজোবোন তনুজা খাতুনকে মিশনে ভর্তি করতে। মিশন পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র সেটিই। যাকে ভর্তি করতে এসেছিলেন, সেই তনুজা খাতুন আজ সফল চিকিৎসক।

নিজে বেহালা বিবেকানন্দ উইমেন কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় মাস্টার্স করেছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যেও তা-ই। অথচ মাত্র দশ বছর বয়সে পিতৃহারা। বাবা সেখ নাসিরুদ্দিন ছিলেন পেশায় আইনজীবী। অকালপ্রয়াত বাবার অবর্তমানে সংসারের হাল ধরেন মা বেগম তাজিয়া খাতুন, শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা। ফলে নাসিমার জীবনে সংগ্রামের অধ্যায়টি কম দীর্ঘ নয়।

সেই সংগ্রাম থেকে কিছুটা নিস্তার পান মিশনে শিক্ষকতায় যোগ দিয়ে।

২০০৫ সালে মিশন পরিবারের উদ্যোগে সাতটি বিবাহ সম্পন্ন হয় খলতপুর ক্যাম্পাসে। সেই উৎসবঘন পরিবেশে নাসিমা খাতুনও ছিলেন সাত কন্যার একজন। যেন মিশনেরই মেয়ে— তাঁদের নিয়ে এমন বিরাট, পবিত্র এবং আনন্দপূর্ণ বিবাহ-অনুষ্ঠান বাংলার কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোনোদিন দেখেনি। সেদিন তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন মিশনেরই শিক্ষক খন্দকার মেহবুব রসুলের সঙ্গে।

স্বামী, পাঁচ বছরের শিশুপুত্র, পরিবার আর অগণিত ছাত্র-ছাত্রী রেখে মাত্র কয়েক দিনের অসুস্থতায় চলে গেলেন নাসিমা খাতুন। সবাইকে শোকে ডুবিয়ে দিয়ে। সেই শোকের, বেদনার আর সহমর্মিতার পরিচয় পাওয়া গেল মৃত্যুর পরদিন, জানাজায়। খলতপুর ক্যাম্পাসে কয়েক হাজার অনুরাগীর যোগদানে। মিশন ক্যাম্পাসেই সমাহিত করা হয় তাঁকে। কত সংক্ষিপ্ত জীবন! জন্ম ১৯৭৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। মাত্র ৩৮ বছরও পূর্ণ হল না। তবু নাসিমা শুধুমাত্র একজন শিক্ষক হয়ে এত মানুষের কাছের জন হয়ে উঠলেন কী করে, এ-ও এক বিস্ময়!

আমরা শুধু বেঁচে থাকি। পৃথিবীর ভার বাড়াই। কেউ কেউ সাধ্যমতো চেষ্টা করেন কিছু ভালো কাজ করে যাওয়ার। আর শুধু এই কারণেই দুনিয়ার বহু ক্ষণজীবী মানুষ অমর হয়ে আছেন। নাসিমা খাতুন অবশ্যই তেমন কেউ ছিলেন না। শুধু নীরবে নিজের কাজটুকু করে গিয়েছেন। তবু তাঁর মৃত্যু বুঝিয়ে দিয়ে গেল, একটা শূন্যস্থান পড়ে রয়েছে আমাদের সামনে। ওই খাঁ-খাঁ শূন্যস্থানটি আজ বলতে চাইছে— আমি এইখানে ছিলাম, এটুকু আমার। আমরা সেই শূন্যতায় দেখি তাঁকে এবং তাঁর কর্মকে।

কিন্তু, শুধুই কি স্মৃতিচারণ করলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে?

না। তাঁর মতো উদার, সুভদ্র ব্যবহার, কর্মে একনিষ্ঠ, একইসঙ্গে ছোটো অর্থাৎ নিজের এবং বৃহৎ অর্থাৎ বহির্পরিবারের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার চেষ্টা আমাদেরই করতে হবে। তবেই ওই শূন্যস্থানটি স্বস্তি পাবে।

তখন আমরা বড়োমুখ করে বলতে পারব, নাসিমা খাতুন আমাদেরই পরিবারের একজন ছিলেন। বলতে পারব— নাসিমা খাতুন নেই। নাসিমা খাতুনরা আমাদেরই মাঝে থেকে যাবেন। ■

শ্রেণিকক্ষ কেমন হওয়া উচিত? শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা কী? পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশ কীভাবে হওয়া সম্ভব? শিক্ষক-পড়ুয়ার সম্পর্কটি কেমন হবে? এরকম বেশ কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি পড়তে হয়েছিল বীরভূমের চারটি সরকারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পিছিয়ে-পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মানোন্নয়নে কাজ করবার সময়। আল-আমীন মিশন এবং দিল্লির নেটওয়ার্ক অব এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজিং ভেনচার্সের যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল। কর্ণধার ছিলেন আল-আমীন মিশনের শিক্ষা-উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল খায়ের জালালউদ্দিন। পরিচালক ছিলেন বর্তমান লেখক। তাঁর ওপর ভার পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার। তখনই, অর্থাৎ ২০১১ সালে, তিনি লেখেন গবেষণাভিত্তিক একটি রচনা। সেই শিক্ষাচিন্তার প্রকাশ ঘটবে কয়েকটি সংখ্যায়। এবার প্রথম কিস্তি।

যত্নে মোড়া ক্লাসঘর

একরাম আলি

একটা পরিপূর্ণ ক্লাসঘরের চেহারা সচরাচর আমরা কেমন দেখি?

একদিকে ছাত্র-ছাত্রী, অন্যদিকে তাদের সামনে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা। শিক্ষকের হাতের নাগালে ব্ল্যাকবোর্ড, চক-ডাস্টার। স্কুলের সব শ্রেণিরই ব্যবস্থা এমন। অর্থাৎ ক্লাসের সর্বময় কর্তৃত্ব শিক্ষকের হাতের মুঠোয়। পড়ুয়ারা আসে শিখতে, অজ্ঞতা দূর করতে। মনে রাখতে হবে, যেহেতু তারা ছোটো এবং দুর্বল, তাই তাদের অজ্ঞতাও দুর্বল। শিক্ষকও পৃথিবীর সবকিছু জানেন না। তবু নানা সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যেই তাঁর অজ্ঞতা কিছুটা সবল এবং ভয়ংকর আর ক্ষতিকারক। সবলের সঙ্গে দুর্বল কোনোদিনই পেরে ওঠে না। সবল অজ্ঞতার মুখোমুখি দুর্বল অজ্ঞতার অবস্থাও তেমনই। আর তাই শিক্ষকের প্রাধান্য থেকেই যায়। ক্ষমতার এই কেন্দ্রটিকে ভেঙে ফেলাই যত্নে মোড়া ক্লাসঘরের প্রাথমিক শর্ত।

প্রথমে আমাদের বুঝে নিতে হবে ক্লাসঘরটিকে

মোটের ওপর তিন রকমের মিশ্রণে গড়ে ওঠে ক্লাসঘরের চরিত্র।

১. ছাত্র-ছাত্রী। তাদের মেধার স্তরভেদ থাকলেও তারা একই শ্রেণিতে পড়তে এসেছে। ২. শিক্ষক। ক্লাস চলাকালীন গোটা স্কুলের প্রতিনিধি তিনিই, যাঁর আবার নিজস্ব মতামতও আছে। ৩. ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবার, তাদের বাবা-মা আর ভাইবোন। সমাজে পরিবারগুলোর সামাজিক আর আর্থিক অবস্থান, ছাত্রদের বাবা-মায়ের শিক্ষা— সবই ভিন্ন স্তরের হওয়াই সম্ভব।

এইরকম নানা জটিলতাপূর্ণ সম্পর্কের ওপর টিকে আছে ক্লাসঘরটির নিজস্ব চরিত্র। এটির যত্ন নিতে হলে তাই সমস্তরকম জটিলতা মাথায় রাখতে হবে।

যত্নের প্রতি কেন যত্ন?

আসুন, প্রথম শ্রেণির যত্নে মোড়া একটা ক্লাসঘরে ঢুকে দেখি, সেটা কেমন।

চেয়ার টেবিল সব ফাঁকা। শিক্ষিকা অনীতা ম্যাডাম ঘরের এক কোণে পড়ুয়াদের নিয়ে মেঝেয় গোল হয়ে বসে আছেন। ঘরের কোণটা কোনো বিষয়ে ঘরোয়া আলোচনার জন্য শিক্ষিকা ব্যবহার করেন। কেউ কোনো সমস্যায় পড়েছে কি না আর তাতে কারো সাহায্য লাগবে কি না, অনীতা ম্যাডাম জানতে চাইলেন।

ছ বছরের শামিনা বলল, 'স্কুলে যখন বেরোচ্ছি, পেছন থেকে ক্লাস থ্রির রিজিয়া আমার ওড়না টেনে ধরায় উলটে পড়ে গেছিলাম। ও আগে কোনোদিন এরকম করেনি। কী করা যায়?'

খুদে শওকতের হাত উঠল— 'তুমি রিজিয়াকে বলো, ওড়না টেনে ধরলে কিন্তু সেও উলটে পড়ে যাবে। তখন?'

'বলেছি। ঠোঁট বেঁকিয়ে ও বলেছে, পারলে ধরিস।'

'তাহলে আপাকে বলে দেওয়া উচিত।'— বলল নিশি।

পরের জন আকাশ। 'আমাদের পাশের বাড়ির ছেলে মিষ্টু আর আমি বিকেলে যখন খেলতে বেরোই, পাড়ার অতুলকাকু ঠিক সেই সময়েই ওঁদের ইয়াব্বড়ো অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা নিয়ে বেরোন। বাঘ সেটা। আমাদের দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে। চেন টেনে ধরে কাকু সামলান ঠিকই, তবু ভয় তো করে। নিজেরা খেলতে পারি না। প্রত্যেক দিন এটা হয়। কী করা যায়?'

অগ্নিভ হাত তোলে— 'তোমাদের হয় পাড়ার কাকুকে কুকুরটা নিয়ে অন্য দিকে যেতে বলা উচিত, নয়তো তোমাদেরই উচিত খেলার জায়গা পালটানো।'

রিনা প্রতিবাদ করে, 'কেন ওরা খেলার জায়গা পালটাবে? মাঠটা নিশ্চয়ই পাড়ার সবার জন্যে। সবার জন্যে যেটা, সেখানে দেখা উচিত কেউ যেন কারো সমস্যা না করে। তুমি বরং বাড়িতে কথা বলো। তোমার বাবা হয়তো পাড়ার সবার সঙ্গে কথা বললে মাঠে কুকুর নিয়ে ঘোরা বন্ধ হতে পারে।'

'দেখি, সেটাই করতে হবে।'— বলে আকাশ।

যতক্ষণ আলোচনা চলল, অনীতা ম্যাডাম মন দিয়ে শুনছিলেন। একটাও কথা বলেননি এবং বাচ্চারাও পরামর্শ চেয়ে তাঁকে বিরক্ত করেনি। তিনি তখনই কথা বললেন, যখন আলোচনার সময় শেষ হয়ে এল। 'পরের দিন কি আমরা আজকের আলোচনার ফল নিয়ে কথা বলব?' ক্লাস ওয়ানের বাচ্চারা 'অবশ্যই' বলে যে-যার চেয়ারে গিয়ে বসল।

অনীতা ম্যাডামের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখে চমকে উঠতে হয়। কত সহজে তারা নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারছে! তারা শিখেছে অন্যের কথা মন দিয়ে শুনতে আর চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে পরস্পরের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে। এটা পড়ুয়াদের প্রতি শিক্ষিকার যত্ন আর তাদের সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা এবং সম্পূর্ণ মনোনিবেশ ছাড়া সম্ভব হত না।

যত্ন বলতে কী বোঝায়?

এতে সংশয় নেই যে, অনীতা ম্যাডামের প্রথম শ্রেণির পড়ুয়ারা নিজেদের সমস্যা বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় বিশেষ যত্নবান। এটাও আমরা দেখেছি, ওই আলোচনায় অনীতা ম্যাডামও নীরব অংশগ্রহণকারী। জটিল সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে তিনি পড়ুয়াদের যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। পরিস্থিতি বুঝিয়েছেন কিছু উপকরণের সাহায্যে— নিজের শব্দ ব্যবহারে, কাজে আর আচরণে হয়েছেন সহমর্মী।

কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে পড়ুয়ারা একে অপরকে পরামর্শ দিয়েছে এবং শিক্ষিকা সম্ভাব্য সেরা পরামর্শগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে, এই পড়ুয়ারা তাদের উৎকর্ষ সানন্দে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারছে।

ক্লাসঘরটিতে আমরা দেখলাম

১. শিক্ষকের সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রের এবং প্রত্যেক ছাত্রের নিজেদের মধ্যেও এমন একটা সম্পর্ক রয়েছে, যে-সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি আস্থা আর বিশ্বাস। ২. সদর্থক সম্পর্ক। ৩. প্রতিটি ছাত্রের রয়েছে আত্মসংযমের জ্ঞান, একইসঙ্গে যৌথ জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধ।

আবুল খায়ের জালালউদ্দিনের সঙ্গে খুদে পড়ুয়ারা।

> ক্লাসঘরে থাকবে এমন পরিবেশ, যেখানে প্রতিটি পড়ুয়া নিজেকে একইসঙ্গে অভিন্ন ভাবার এবং আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পায়। কোনো ছাত্র যেন নিজেকে লুকিয়ে না-রাখতে পারে— সেটা তার উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্যেই হোক অথবা অক্ষমতার জন্যে।

যত্নে মোড়া ক্লাসঘরের পড়ুয়ারা

ক্লাসঘরে থাকবে এমন পরিবেশ, যেখানে প্রতিটি পড়ুয়া নিজেকে একইসঙ্গে অভিন্ন ভাবার এবং আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পায়। কোনো ছাত্র যেন নিজেকে লুকিয়ে না-রাখতে পারে— সেটা তার উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্যেই হোক অথবা অক্ষমতার জন্যে। সব সময় সবার সঙ্গে বা নজরে থাকার ফলে ছাত্রদের পরস্পরের সম্পর্ক মজবুত হবে এবং পঠনের আরও গভীরে পৌঁছোতে পারবে। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা আর মনোযোগ থেকে আন্তরিকভাবে গড়ে উঠবে আস্থা। ছাত্রদলের দরকারি সদস্য হিসেবে নিজেকে ভাববে এবং সেই দলের মানোন্নয়নের জন্যে কাজ করবার প্রবণতা বাড়াবে। গোটা ক্লাসের প্রতি বড়ো দায়িত্ববোধ থেকে সহপাঠীদের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে শিষ্টাচার বজায় রাখবে।

যত্নের এই ছাত্রদলের সদস্যের কয়েকটা আত্মপ্রশ্ন

১. আমি কেমন মানুষ হতে চাই? ২. আমার সম্পর্কে অন্যেরা কী ধারণা করুক, আমি চাই? ৩. কেমন ক্লাসঘর, স্কুল এবং সহপাঠী আমি চাই?

যত্নে মোড়া ক্লাসঘরের শিক্ষকেরা

এক অর্থে আমরা প্রত্যেকে শিক্ষক। কেননা, আমরা সবাই চাই আমাদের বাড়ির বাচ্চাদের সত্যি-সত্যিই যত্ন নিতে। কিন্তু আমাদের একান্ত যত্নের নীতি-পদ্ধতি হেরে ভূত হয়ে যায় প্রচলিত শিখনপদ্ধতির পাঠক্রমের শক্তির কাছে। পারস্পরিক সম্পর্ক— যত্নে মোড়া ক্লাসঘরের যেটি হৃৎপিণ্ড— উদ্‌বুদ্ধ করে শিক্ষককে আর ছাত্রদের। গতানুগতিক শিখনপদ্ধতির প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা যদি ছাত্রদের কাছেই আমরা না পাই, তাহলে আর কোথায় পাব!

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার গতি একমুখো, সেই অভিমুখটি হচ্ছে— শিক্ষকের থেকে পড়ুয়ার দিকে। যখন আমরা কোনো বিষয় নিয়ে কিছু লিখি অথবা পড়ুয়াদের কোনো লেখার মূল্যায়ন করি, আমাদের আগ্রহ থাকে পড়ুয়াদের উন্নতির দিকে আর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির দিকে।

অন্য দিকে যত্নে মোড়া ক্লাসঘরের এই আবহ প্রশ্রয় দেয় শিক্ষার গতিকে বহুমুখী করতে। শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা পরস্পরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে

আহা কী আনন্দ লেখায়-পড়ায়!

জানবে, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করবে। ক্লাসের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে ক্রম-উচ্চতায় নিয়ে যেতে এই সম্পর্ক খুবই জরুরি।

আমাদের শিক্ষক বন্ধু

গোটা ক্লাসকে একটা মাত্র সুরে বেঁধে ফেলার কাজটি সহজ নয়, যে-সুরে আবার বৈচিত্র্যও থাকবে। ছাত্রদের বৈচিত্র্য থাকবে পৃথিবীকে দেখার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাড়া এটা সম্ভব নয়। খেয়াল রাখতে হবে, ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতা বা মৌলিকতা যেন না নষ্ট হয়। আর এই কাজে প্রথমেই শিক্ষকসুলভ যাবতীয় অহমিকা দূর করতে হবে শিক্ষককে। তিনি হবেন ছাত্রদের বন্ধু, সুখ-দুঃখের সঙ্গী। হয়ে উঠবেন শিক্ষক বন্ধু।

শিক্ষক কী করে বন্ধু হবেন পড়ুয়ার?

১. ধরা যাক, ক্লাস শুরু হল। বছরের প্রথম দিকের কথা বলছি। চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো ক্লাসঘরের আনুষ্ঠানিকতা শিক্ষককে ভেঙে দিতে হবে।

সহজ হওয়ার জন্যে একটা জায়গায় গোল হয়ে পড়ুয়াদের নিয়ে শিক্ষক বসতে পারেন। বসে, দৈনন্দিন কোনো একটা বিষয়ে, বিষয়টা পাঠ্যসূচির বাইরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, পড়ুয়াদের উৎসাহ দেবেন এক-এক করে কিছু বলতে। সবাই সেই বিষয়ে আলোচনা করবে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে। এবং শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যাতে সব পড়ুয়া সমান গুরুত্ব পায়। শেষে তারা আলোচ্য বিষয় নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে। শিক্ষক সেগুলো দেখে আবার একপ্রস্থ ছোট্ট আলোচনা করে নেবেন। বিষয়টা যদি হয় তাদের পাড়া নিয়ে, তাহলে তাদের কথায় প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা কী, তা বোঝা যাবে, এবং আলোচনার শেষে প্রতিবেশীদের প্রতি তারা দায়িত্বশীলও হতে শিখবে।

২. বাবা-মা। পরিবার। অনেকেই হস্টেলে থাকে। ডে-স্কুলও রয়েছে। পড়ুয়া যেখানেই থাকুক, তার পরিবারের সঙ্গে শিক্ষকের মুখোমুখি কথা হওয়া মাঝে-মাঝেই দরকার। দেখা গেছে, এতে স্কুলের সংস্কৃতি সম্বন্ধে যেমন পড়ুয়ার বাবা-মা জানতে পারেন, তেমনি পড়ুয়ার পরিবার সম্বন্ধেও শিক্ষক জানতে পারেন অনেক তথ্য। স্কুল আর পরিবারের এই আদানপ্রদানে পড়ুয়ার জড়তা অনেকটা কেটে যায়। অন্য অভিভাবকরা তো বটেই, বিশেষ করে যেসব ছেলে পরিবারের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া, তাদের বাবা-মা নিজের-নিজের ছেলেমেয়ের শিক্ষা বিষয়ে সচেতন হবেন এবং এটাও জানবেন যে, এখানে তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়।

পরিবার সম্বন্ধে, নিজের ভাইবোন সম্বন্ধে মাঝে মাঝে পড়ুয়াদের ছোটো প্যারাগ্রাফ লিখতে বললে কাজটা সহজ হয়।

৩. পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ক্লাসঘর থাকতে পারে না। চারপাশের সমাজ সম্বন্ধে সচেতনতা প্রত্যেক ছাত্রের দরকার। খবরের কাগজ বা সাময়িক পত্রিকা পড়াটা এই কাজে লাগতে পারে। সংবাদপত্রের কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে ক্লাসে।

যত্নে মোড়া ক্লাসঘর এবং স্কুলের প্রশাসকগণ

যাঁরা স্কুল-প্রশাসনের দিকটি দেখবেন, তাঁরা স্কুলের আচার-আচরণের সূত্রে গড়ে-ওঠা মূল্যবোধগুলি বৃহত্তর সমাজে যাতে ছাত্রদের দ্বারা সদর্থকভাবে প্রতিফলিত হয়, সেদিকে লক্ষ রাখবেন। মনে রাখতে হবে, স্কুলের আচার-আচরণ শুধু স্কুলেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। স্কুলে এমন নিয়ম থাকবে, যেগুলো বৃহত্তর জীবনেও কাজে লাগবে।

বহু স্কুল আছে, সেইসব স্কুলের সংখ্যা কম নয়, যেখানে শুধু জয় আর পরাজয় আছে। পরীক্ষায় পাস ফেল, স্পোর্টসে ফার্স্ট সেকেন্ড, অভিনয়-আবৃত্তি-গানে প্রথম দ্বিতীয় হয়। তারপর হয় পুরস্কার বিতরণ। একদল পুরস্কার পায়, একদল পায় না। এর ফলে বিরাট পার্থক্য তৈরি হয়ে যায় ছাত্রসমাজে।

অত্যন্ত সতর্ক মন নিয়ে আমরা এই সমস্যার সমাধানে এমন একটা পরিকল্পনা তৈরি করতে পারি, যাতে জয় আর পরাজয়কে তুচ্ছ করে পড়ুয়ারা পরস্পরের সম্পর্কের গুরুত্ব এবং যৌথ জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পারে আর বৃহত্তর জীবনে সেসব কাজে লাগাতে পারে।

ক্লাসঘরে কলহ?

অতনু স্যারের ক্লাস। অসুস্থতার জন্যে আজ তিনি অনুপস্থিত। পঞ্চম শ্রেণির যত্নে মোড়া ক্লাসঘরের পড়ুয়ারা সে-খবরটা জানে।

পরিবর্ত শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন স্যার ক্লাসে ঢুকে দেখলেন, শ্রেণিকক্ষের পেছনে, ডানদিকে, একটা ছোটো জটলা। কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, কী হয়েছে। তাঁর এই যাওয়াটা ছিল প্রতিবেশীর কোনো বিপদ হলে খোঁজ নিতে যাওয়ার মতো। সহৃদয়।

— কী হয়েছে?

রুকসানার পেনসিল-কাটার নিয়ে বিদিশা তার পেনসিল কাটছিল। হাত থেকে পড়ে গিয়ে পেনসিল-কাটারের কোণটা একটু ভেঙে গিয়েছে। রুকসানার মুখ কাঁদো-কাঁদো। সেই নিয়ে দুটো দল তৈরি হয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে।

গিয়াসউদ্দিন স্যার দলদুটোকে নিয়ে ক্লাসঘরের এক কোণে বসলেন। তাঁর হাতে সেই পেনসিল-কাটার।

জানতে চাইলেন, বিদিশা কেন বাড়ি থেকে পেনসিল কেটে আনেনি বা পেনসিল-কাটার সঙ্গে আনেনি। ভুলে গিয়েছে? আচ্ছা, ভুল হতেই পারে। তাহলে অন্যের জিনিস নিয়ে কাজ করবার সময় আরও বেশি যত্ন নিয়ে সেটা করা উচিত নয় কি? ধরো, তোমার বিছানায় তোমার ভাই শুয়ে-শুয়ে টুনটুনির বই পড়ছে। পড়তেই পারে। কিন্তু যদি বিছানাটা নোংরা করে, কী করবে তখন?

সৃজা হাত তুলল। সে জানাল, বিছানাটা সে নিজেই ঠিকঠাক করে নেবে। কেননা, গল্পের বই পড়বার সময়, সৃজা নিজেও দেখেছে, গল্পের জগতে মনটা চলে যায়। অন্য কিছুর দিকে খেয়াল থাকে না। বেচারা ভাই যদি নোংরা করেই ফেলে, তার দোষ নেই।

— তাহলে তোমরা এতক্ষণ বিষয়টা নিয়ে এত কথা বলছিলে কেন?

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। রুকসানা বুঝতে পারে আর বিদিশাও বুঝতে পারে যে, ভুলটা দুজনেরই।

এমন কোনো সমস্যা নেই, যার সমাধান নেই। এই কথাটা যত্নে মোড়া ক্লাসঘরের সার কথা। পরস্পরের সম্পর্কে থাকবে পারিবারিক আবহ। বন্ধন। আর এই বন্ধনের রজ্জু হবেন শিক্ষক নিজেই। ■

(পরের সংখ্যায়)

যুক্তির চেয়ে আবেগ প্রাধান্য পেত। আর তাই তিনি সবসময় মানুষের কাছের জন হতে পেরেছিলেন। সারা রাজনৈতিক জীবনে কখনও ভিড়ে মিশে যাননি। বরং ভিড়ই তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এই পাতায় সেই অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী শের-এ-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক।

বাংলার মুসলমানের জাগরণকালের এক নেতা

জাহিরুল হাসান

বাংলার মাটি বড়ো মায়াময়। দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন, বড়োছেলে যুদ্ধে মারা যাওয়ার পর চেয়েছিলেন, তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র বুগরা খান বাংলা ছেড়ে, দিল্লিতে এসে বাস করুন, যাতে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসতে পারেন। কিন্তু বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে প্রায় তিন বছর কাটিয়ে বুগরার আর দিল্লিতে থাকতে মন চাইছিল না। ফলে, তাঁর ছেলে সতেরো-আঠারো বছরের তরুণ কায়কোবাদ বসলেন পিতামহের ছেড়ে যাওয়া সিংহাসনে, আর পুত্রের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়েই খুশিমনে দিন কাটিয়ে দিলেন বুগরা।

১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করার আগে এখানে মুসলমান ছিল এমন কোনো প্রমাণ ইতিহাসে নেই। বখতিয়ারের পিছু-পিছু শুধু যে যোদ্ধারাই এলেন, তা নয়, মোঙ্গলদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মধ্য এশিয়া থেকে তুর্কি, ইরানি, আফগান ইত্যাদি জাতির সাধারণ মানুষও অনেকেই বাংলায় আশ্রয় নিলেন। পাশাপাশি এলেন কিছু সুফি সাধকও। তা হলেও, বহিরাগত ক-জন! মুসলমানের সংখ্যা বাড়ল স্থানীয় মানুষেরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায়। এ-পরিবর্তন রাজার হুকুমে হয়নি, হয়েছে বহু শতাব্দী ধরে বহিরাগতদের সঙ্গে স্থানীয়দের সামাজিক মেলামেশার ফলে, জীবন-জীবিকার সূত্রে।

বাংলার মুসলমানের সুবৃহৎ অংশই গ্রামের খেটে-খাওয়া গরিব মানুষ। যাঁদের এলিট বলা হয়, উচ্চবর্গ, তাঁদের সংখ্যা ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় কম ছিল। দিল্লিতে কত কত ইতিহাসগ্রন্থ লেখা হয়েছে বাদশাহি আমলে, বাংলায় একটাও নয়। বোঝা যায়, বাংলার মুসলমান শিক্ষা-সংস্কৃতিতে শুরু থেকেই পিছিয়ে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের প্রথম সৃষ্টি শাহ মুহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। চোদ্দো শতকের শেষ বা পনেরো শতকের শুরুতে লেখা। এরপর এক এক করে এসেছেন সেখ ফয়জুল্লা, দৌলত উজির, শেখ কবীর, চাঁদ কাজী, শাহ বারিদ খান, মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ সুলতান, দোনা গাজি, হাজি মোহাম্মদ, ফতেহ খান, শেখ চান্দ, আফজাল আলী প্রমুখ ষোলো শতকের উল্লেখযোগ্য কিছু কবি। তবে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে দুটি নাম সবার ওপরে— দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল, সতেরো শতকে যাঁদের আবির্ভাব। এই কবিরা প্রায় সকলেই ছিলেন বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর।

সতেরো শতক পর্যন্ত বাংলার মুসলমানের শিক্ষা, সাহিত্য ও মেধাচর্চার মোটামুটি এই ছিল চিত্র। এরপর আঠারো ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ব্যাপী এক গ্রহণ-লাগা সময় বাংলার মুসলমানের জন্যে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বলার মতো কোনো অবদান তাঁরা রাখতে পারেননি। তবে, এরই মধ্যে চারজন ব্যতিক্রম— দানবীর ও সমাজসেবী হাজি মোহাম্মদ মহসিন (১৭৩২—১৮১২), ফরায়েজি আন্দোলনের জন্মদাতা হাজি শরিয়তুল্লাহ্ (১৭৮১—১৮৪০), তাঁর পুত্র মোহাম্মদ মহসীন ওরফে দুদু মিঞা (১৮১৯—১৮৬০), যিনি ফরায়েজি আন্দোলনকে বৃহত্তর রূপ দেন এবং সৈয়দ মির নিসার আলি ওরফে তিতুমির (১৭৮২—১৮৩১)। স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বংশধর, যাঁরা বাংলার মুসলমান সমাজের সর্ববৃহৎ অংশ, তাঁরা তখনও নিজস্ব শক্তি অর্জন করতে পারেননি।

এই অতীত কথাগুলো স্মরণ না করলে আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৮৭৩—১৯৬২)-এর কৃতিত্ব ও অবদানের পটভূমি স্পষ্ট হবে না। ১৮৫৭ সালে সিপাহিদের ব্যর্থ অভ্যুত্থান একটা জল-বিভাজিকা, ভারত ও বাংলার মুসলমানদের পক্ষে জেগে ওঠার জন্যে। এরপর, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাঁরা বাংলার মুসলমানের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

সারির কয়েক জন— সমাজসেবী নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮—১৮৯৩), লেখক ও সমাজসেবী নবাব ফয়জুননেসা চৌধুরানি (১৮৩৪—১৯০৩), সৈয়দ আমীর হোসেন (জন্ম ১৮৪৩), লেখক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭—১৯১১) এবং বিচারপতি ও সমাজসেবী সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯—১৯২৮)। এই সময়ে মুসলমান সমাজের অগ্রগতিতে এঁরাই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং এঁরাই এ-ব্যাপারে ফজলুল হকের পূর্বসূরি।

বাংলায় বিশ শতকের প্রথমার্ধের মুসলমান সামাজিক ও রাজনৈতিক মঞ্চের প্রায় গোটাটাই জুড়ে ফজলুল হক। ওইসঙ্গে সমান্তরাল অবদান রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ওরফে বেগম রোকেয়া (১৮৮০—১৯৩২) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬)-এর। এঁদের মতো সুপরিচত না হলেও, আর-একজনেরও অশেষ কৃতিত্ব— 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মাদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮—১৮৯৪)।

ঝালকাঠি এখন বাংলাদেশের একটি জেলা। বাংলাদেশের মানচিত্রের তলার অংশে মধ্যবিন্দু থেকে কিছুটা বাঁয়ে এর অবস্থান। এর ঠিক মাথার ওপর আর-এক জেলা বরিশাল। যার সম্পর্কে বলা হয়, 'ধান-নদী-খাল, এই তিনে বরিশাল'। ঝালকাঠিও তা-ই, নদীবিধৌত দেশ, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর যেখান থেকে খুব দূরে নয়। ঝালকাঠি এবং বরিশাল যখন আলাদা জেলা হয়নি, দেশভাগের আগে তো বটেই, তার পরেও বহুকাল পর্যন্ত এগুলি বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যে ছিল। ঝালকাঠি-সহ আরও ক-টি থানা নিয়ে তারই মধ্যে বরিশাল উপজেলা।

ফজলুল হকের পৈতৃক বাড়ি যেখানে, সে-জায়গাটার নাম চাখার এবং নানাবাড়ি সাতুরিয়ায়। দুটিই কাছাকাছি গ্রাম সাবেক বরিশাল উপজেলার। নিকটবর্তী শহর ঝালকাঠি ও বরিশাল। সাতুরিয়া এখন উপজেলা হয়েছে। ফজলুল হকের জন্ম ওই সাতুরিয়ায় নানাবাড়িতে (মতান্তরে পৈতৃক বাড়িতেই), ২৬ অক্টোবর ১৮৭৩। বাবার নাম কাজি মুহম্মদ ওয়াজেদ এবং মায়ের নাম সাইদুন্নিসা খাতুন। বাবাও সে-আমলের শিক্ষিত মানুষ। বরিশাল আদালতে ওকালতি করতেন। সরকারি উকিল ছিলেন। একসময় বরিশাল জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাতেই বোঝা যায় সামাজিক কাজকর্মের ধারা ফজলুল হকের রক্তে। শুধু তা-ই নয়, আইনের পেশাও তাঁদের তিন-পুরুষের। দাদা (পিতামহ) কাজি আকরাম আলি আরবি-ফারসি ভাষায় পণ্ডিত এবং সেকালে বরিশালের নামি মোক্তার। আসলে, ব্রিটিশ আমলেও ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ফারসিই ছিল আদালতের ভাষা।

ফজলুল হকের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের মাদ্রাসায়। পরে ভর্তি হন বরিশাল জেলা স্কুলে এবং সেখান থেকেই ১৮৯০ সালে এখনকার মাধ্যমিকের সমতুল এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। এর পরের পড়াশোনা কলকাতার ঐতিহ্যশালী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং এক-এক করে এফএ ও বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বিএ-তে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-ম্যাথমেটিক্স — তিনটি বিষয়ে তাঁর অনার্স ছিল। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে অনার্স পড়া যেত এবং বিজ্ঞানেও স্নাতক-স্নাতকোত্তরদের বিএ-এমএ ডিগ্রিই দেওয়া হত।

দেশে যখন শিক্ষার হার ছিল খুবই কম এবং তার মধ্যেই মুসলমান সমাজ ছিল আরও পিছিয়ে, সেই পরিস্থিতিতে একটা পরিবারে তিন-পুরুষ ধরে শিক্ষার চর্চা এবং পেশাগত সাফল্য বিস্ময়কর। আর, ফজলুল হকের নিজের কীর্তি তো চোখ-ধাঁধানো! স্নাতক হওয়ার পর অঙ্কে এমএ। এই অঙ্ক পড়া নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে। সেটা যদি সত্য হয়, তা হলেও গল্পের মতোই। প্রথমে তিনি নাকি ইংরেজিতে এমএ পড়তে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র ইংরেজি পড়ছেন দেখে এক বন্ধু বা পরিচিত কেউ ব্যঙ্গ করে বলেন, মুসলমানরা অঙ্কে কাঁচা, তাই তিনি বিজ্ঞান পড়তে সাহস করেননি। তখন এমএ ফাইনাল পরীক্ষার আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। আত্মসম্মানে ঘা লাগায়, ফজলুল ঠিক করলেন, তিনি অঙ্কতেই পরীক্ষা দেবেন। ওই সময়ের উদার শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা সম্ভব হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনি সসম্মানে অঙ্কেই এমএ পাস করেন। তারপরেও পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং ১৮৯৭ সালে ব্যাচেলর অব ল ডিগ্রি লাভ করেন। দক্ষিণ এশিয়ায় তিনি দ্বিতীয় মুসলমান, যিনি এই কৃতিত্বের অধিকারী।

অগ্রপথিকদের প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা বলব, যিনি ফজলুল হকের প্রায় সমসাময়িক এবং তিনিও অত্যন্ত মেধাবী, যদিও সেভাবে আলোচিত নন। ইনি উত্তরপ্রদেশের মীরাটের মানুষ, নাম স্যার জিয়াউদ্দিন আহমদ (১৮৭৮—১৯৪৭)। ইনিও অঙ্কে এমএ, প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৮৯৭) এবং পরের বছর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও। দু-বারই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। থামেননি সেখানে, ১৯০১ সালে প্রথম ভারতীয় মুসলমান হিসেবে অঙ্কে ডিএসসি করলেন, ডক্টরেটের চেয়েও যার বেশি গুরুত্ব। কী বিরাট জ্ঞানতাপস! এরপর গেলেন ইংলন্ডে। সেখানেও নানা ধারাবাহিক সাফল্য শিক্ষা ও গবেষণায়।

শের-এ-বঙ্গাল নামকরণ নিয়েও মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি এই উপাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক সূত্রে জানা যায় যে, তা নয়, এর তিন বছর আগেই মুসলিম লিগ দলের একটি সভায় জোরালো ভাষণ দিয়ে তিনি এই উপনাম অর্জন করেন।

তিনি শুধু প্রথম মুসলমানই ছিলেন না, প্রথম ভারতীয়ও, যিনি স্যার আইজ্যাক নিউটন বৃত্তি প্রাপক। বিদেশ থেকে ফিরে তাঁর বাকি জীবন কেটেছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে। ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির পিছনেও তাঁর যথেষ্ট অবদান।

এখন যেমন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে নবচেতনা জেগেছে, শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষা অর্জনে, ওই সময়টাও ছিল সেরকমই এক উত্তরণের কাল বাংলা ও ভারতের মুসলমানদের পক্ষে। আর আকাঙ্ক্ষা যেখানে, সেখানে সাফল্য আসতেও দেরি হয় না। তবে প্রথম পদক্ষেপটাই কঠিন, তাই এই আলোর পথযাত্রীদের যাঁরা ছিলেন সামনের সারিতে, যাঁদের দেখে 'কাফেলা'য় ক্রমে লোক জমেছে, তাঁদের জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। যেমন, আল-আমীনের নুরুল ইসলাম প্রথম পতাকাধারী এ-যুগের। আর ওই যুগে নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর হোসেন, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এঁরা বাগবান, উদ্যানপালক আর ফজলুল হক, জিয়াউদ্দিন আহমেদরা সেই উদ্যানের উজ্জ্বল ফল-ফুল-শস্য। আজকের পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজও সেইরকম ফসলের আশায় পথ চেয়ে আছে।

জিন্নাহ্‌র সঙ্গে।

আইন পাস করার পর ফজলুল হক প্রথমে কিছুদিন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহকারী হিসেবে কাজ করেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও অঙ্কে এমএ এবং ব্যাচেলর অব ল ডিগ্রিধারী। উত্তরজীবনে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে ছিলেন, একাদিক্রমে আট বছর এবং পরে আরও দু-বছর। মজার কথা, গুরু ও চেলা, আশুতোষ ও ফজলুল— দুজনেই খ্যাত হয়েছেন বাংলার বাঘ পরিচয়ে। শের-এ-বঙ্গাল মানেও তো তা-ই। তবে একটু তফাত আছে। আশুতোষের ছিল বিখ্যাত গোঁফ, আর ফজলুল হক গুম্ফহীন বাঘ।

এই শের-এ-বঙ্গাল নামকরণ নিয়েও মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি এই উপাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক সূত্রে জানা যায় যে, তা নয়, এর তিন বছর আগেই মুসলিম লিগ দলের একটি সভায় জোরালো ভাষণ দিয়ে তিনি এই উপনাম অর্জন করেন। তবে ১৯৪০ সালে লাহোরের সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব পাঠ করার পর ওই বাঘ নিয়েই জিন্নাহ্‌র সরস মন্তব্য ইতিহাসপাঠকের কাছে কৌতুকের খোরাক।

পিতার মৃত্যুর পর ফজলুল হক কলকাতা ছেড়ে গ্রামে ফিরে যান এবং বরিশালে স্বাধীন আইনব্যাবসা শুরু করেন। সফল মানুষদের জীবন পর্যালোচনা করলে কখনও-কখনও মনে হয়, তাঁরা যেন নিয়তি-নির্ধারিত। বরিশালের আদালত ও মফস্সল সমাজের ক্ষুদ্র পরিসরেই হয়তো ফজলুল হক আটকে থেকে যেতেন, যদি না সেখানে অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হত। শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও কংগ্রেস নেতা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার বরিশালেরই এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, স্নাতকোত্তর এবং আইনের ডিগ্রিধারী। ওকালতি ছেড়ে শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষাদানে তিনি নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন, সঙ্গে দেশসেবা এবং রাজনীতিও। আজ আমাদের দেশে অনেকেই অশ্বিনীকুমারের নাম ভুলে গেছেন। কিন্তু জাপানের একজন ভারতে এসে বাংলা শিখে এই মানুষটিকে নিয়েই গবেষণা করেন গত শতাব্দীর নয়ের দশকে।

এই মহাত্মারই প্রেরণায় রাজনীতিতে হাতেখড়ি ফজলুল হকের। বাবার পথ ধরে বরিশাল পুরসভা ও পরে বাখরগঞ্জ জেলা বোর্ডের নির্বাচনে জয়ী হন। সেই শুরু রাজনীতিতে তাঁর অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা।

১৯০৫ সালে যখন প্রথম বাংলা ভাগ হয়, যা বঙ্গভঙ্গ নামেই বেশি পরিচিত, ফজলুল হক তখন বত্রিশ বছরের যুবক। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে-আবেগ নিয়ে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার তুলনা বাংলার ইতিহাসে বিরল। আবার, ওই আন্দোলনই বিভেদ বুনেছে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। ইংরেজ চেয়েছিল বঙ্গভঙ্গকে মুসলমানদের কাছে উপহার হিসেবে তুলে ধরতে। কিন্তু প্রথমদিকে মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ এই সাম্প্রদায়িক ফাঁদে পা না দিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতাই করেছে। তবু ইংরেজ জমানাতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, রাতারাতি জোড়া লাগানোর চেষ্টা করলেও, তা কমেনি। ক্রমে মুসলমানরা এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান এবং পৃথক প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে পূর্ববঙ্গের সৃষ্টি সেখানকার মুসলমানদের জন্যে একটা নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়, কারণ, তাঁরাই ছিলেন সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালেই ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ গঠিত হয়, যদিও তার সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এই দল গঠনের পেছনে ইংরেজদের উসকানি ছিল। শুরু থেকেই লিগের সঙ্গে থাকলেও, স্বদেশি আন্দোলনের নেতা অশ্বিনীকুমারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সাত-আট বছর পরে নির্বাচনে হিন্দু ভোটারদের সমর্থনে জয়লাভ, ফজলুল হকের তথাকথিত সাম্প্রদায়িক

ঢাকা
১/৩/৬২

আমি সকলের নিবিড় সাহচর্যের মধ্যে সম্প্রতি উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ও আশা লইয়া আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বে আমি এই ডিগ্রি কলেজটি স্থাপন করি - আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে দেখিয়া আমি এই বয়সেও গভীর আনন্দ বোধ করিতেছি, সকলের চেষ্টা এবং ত্যাগে কলেজটি আরও উন্নতি লাভ করিবে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো ছড়াইয়া পড়ুক, গ্রামের অচেনা অজানা মানুষেরা ও নিজেদের সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে শিখুক, আল্লার কাছে এই আমার প্রার্থনা। চাখার কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ছাত্র ছাত্রী এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের আমি শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

এ. কে. ফজলুল হক

হয়ে ওঠার পক্ষে সায় দেয় না।

রাজনীতির আঞ্চলিক ক্ষেত্র থেকে প্রাদেশিক ক্ষেত্রে উঠে আসেন তিনি, যখন ১৯১৩ সালে নির্বাচনে জিতে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হলেন। ঢাকার শহরাঞ্চলের মতো নির্বাচনী কেন্দ্রে তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী প্রবীণ নেতা রায়বাহাদুর কুমার মহেন্দ্রনাথ মিত্র। বেশিরভাগ ভোটারও হিন্দু। কিন্তু ফজলুল হক নিজেকে মুসলমান হিসেবে নয়, বরং বাঙালি প্রার্থী হিসেবে, বাঙালির দাবিদাওয়ার পক্ষে তুলে ধরেন। তবে মুসলিম লিগের সঙ্গ তিনি ছাড়েননি। ওই ১৯১৩ সালেই বাংলায় মুসলিম লিগের সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। কিছুদিন পরে দু-দিক সমান রাখতেই বুঝি, কংগ্রেস দলেও যোগ দেন। সেই আমলে একই সঙ্গে একাধিক দলের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো কড়াকড়ি ছিল না। জিন্নাহ্‌ও কংগ্রেস-মুসলিম লিগ দু-দলেই দীর্ঘকাল ছিলেন। ফজলুল হক হিন্দুকে মুসলমানের শত্রু বলে মনে করতেন না। তিনি চাইতেন যাতে দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি থাকে।

ইতিমধ্যে অল্প সময়ের জন্যে সরকারি চাকরি করে, ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় এসে আইনব্যাবসা শুরু করেছেন ফজলুল হক বেশ কয়েক বছর আগেই। কলকাতায় প্রথম দিকে থাকতেন ৮৮/২ ঝাউতলা রোডের নিজের বাড়িতে, পরে উঠে যান ১৪৪এ নিউ পার্ক স্ট্রিটে। ফজলুল হকের সঙ্গে কংগ্রেসের ছাড়াছাড়ি হয় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় মতভেদের দরুন। অসহযোগে তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, মুসলমান সমাজ এমনিতেই পিছিয়ে, তার উপর আন্দোলনের দাবি অনুসারে স্কুল-কলেজ বয়কট করলে আরও ক্ষতি হবে।

ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা। বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবুর রহমান তখনই ঠাঁই পেয়েছিলেন তাঁর ঠিক পাশটিতে।

তবে এর আগে আরও একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন তিনি। বাংলায় একটা দৈনিক বের করার ভাবনা ছিল তাঁর। ওদিকে ফৌজ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কলকাতায় এসে কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর বন্ধু পরবর্তী কালের কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, দু-জনেরও একই উদ্দেশ্য ছিল। দু-পক্ষ এক হতেই ১২ জুলাই ১৯২০ তারিখে জন্ম নিল সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর নজরুল বিষয়ক স্মৃতিকথায় কিছু তথ্য দিয়েছেন ফজলুল হক সম্পর্কে। এতে জানা যায়, ফজলুল হক নিজের মাকে মাসে একটা-দুটো চিঠি বাংলায় লিখতেন। এ ছাড়া বাকি সব কাজই করতেন ইংরেজিতে। তবে উঠে দাঁড়ালেই ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু— তিন ভাষাতেই অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন।

যাই হোক, শুরু থেকেই 'নবযুগ' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এর জন্যে অবশ্য অনেকটাই কৃতিত্ব নজরুলের তেজি কলমের। যদিও কাগজে পদাধিকারী হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হত না। প্রধান পরিচালক হিসেবে নাম থাকত ফজলুল হকের। তাঁর বাড়িতেই কাগজের অফিস ছিল। কিন্তু তিনি কাগজের ব্যাপারে বেশি হস্তক্ষেপ করতেন না। নজরুল ও মুজফ্‌ফরের প্রতি তাঁর একটাই নির্দেশ ছিল, কৃষক ও শ্রমিকের কথাও যেন কাগজে লেখা হয়। অর্থাৎ গরিব মানুষের কথা। কাগজে সরকারের বিরুদ্ধে অনেক গরম গরম লেখা থাকত, ফলে সরকারের বিষনজরে ছিল এই পত্রিকা।

ফজলুল হক তাঁর কাগজের দুই তরুণ কর্ণধার নজরুল ও মুজফ্‌ফরকে স্নেহ করতেন। পুজোর ছুটিতে যখন বরিশালে দেশের বাড়িতে গেলেন, ওঁদের দু-জনকেও যেতে বললেন এবং গিয়েওছিলেন ওঁরা। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বিচারে ফজলুল হকের চরিত্রে একটা বড়ো ত্রুটি ছিল, তিনি সহজে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেতেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ভাষায়, অব্যবস্থিত চিত্ত ও দোদুল্যমান স্বভাবের। মনে হয় এটা ছিল তাঁর সরলতা। তবে কান-ভাঙানি সত্ত্বেও ফজলুল হক নজরুলকে তাড়াননি। তিনি নিজেই একসময় ফজলুল হককে কিছু না বলে, সাহিত্যের টানে 'নবযুগ' ত্যাগ করেন। এর কিছুদিন পরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও আর থাকলেন না। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে 'নবযুগ' বন্ধ হয়ে যায়। দু-দশক পরে নজরুলকে সম্পাদক করে ১৯৪২ সালে আবার 'নবযুগ' চালু করেন ফজলুল হক, তিনি যখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তবে এর কিছুদিনের মধ্যেই নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। তা হলেও দ্বিতীয় পর্বে কাগজ চলেছিল বেশ কয়েক বছর, তখন বাংলার আর-এক যশস্বী লেখক রেজাউল করীমও যুক্ত হয়েছিলেন এই কাগজের সঙ্গে।

মুসলমান ছাত্রদের স্বার্থের কথা ভেবেই শুধু ফজলুল হক গত শতকের দ্বিতীয় দশকে অসহযোগ আন্দোলন চলা কালে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। পরেও মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রসারই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় সুযোগ আসে এই বিষয়ে কিছু কাজ করার। ওই সময় তিনি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— মুসলমান শিক্ষা তহবিল গঠন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য খানবাহাদুর আহসানুল্লাহ্‌কে অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন পদে নিয়োগ, ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ স্থাপন (এখন যার নাম হয়েছে মৌলানা আজাদ কলেজ) এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল হস্টেল তৈরি। ওই সময়ে, তাঁর দ্বারাই প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ নিয়োগ।

শুধু শিক্ষা নয়, বাংলার কৃষক, যাঁদের বেশিরভাগ মুসলমান, তাঁদের স্বার্থে ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নেও ফজলুল হকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আগে থেকেই তিনি প্রজা বা কৃষক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই আন্দোলন ছিল মহাজন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে। ১৯২৯ সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয়। কিন্তু পরে কিছু সহকর্মীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় ১৯৩৫ সালে তিনি এই সংগঠন ছেড়ে কৃষক-প্রজা পার্টি গঠন করেন এবং ক্রমে এই নতুন দলই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার। আর, সে-বছরই তিনি কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে কলকাতার প্রথম মুসলমান মেয়র নির্বাচিত হলেন। ১৯৩৬

সালে চট্টগ্রামের কৃষক সম্মেলনে তাঁরই সভাপতিত্বে কতকগুলো প্রস্তাব গৃহীত হয়, যার মধ্যে বিশেষভাবে ছিল— ১. জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, ২. প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কার, ৩. স্কুলের মাইনে কমানো এবং ৪. বিনা মাইনেতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

১৯৩৭ সালে বিধানসভার নির্বাচনে জয়ী আসনের হিসেবে যদিও কৃষক-প্রজা পার্টির স্থান ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের পরে, তা হলেও সরকার গঠনের ব্যাপারে ফজলুল হকই হয়ে ওঠেন নির্ধারক শক্তি। প্রথমে মুসলিম লিগের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তাঁর। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে অসাম্প্রদায়িক সরকার গঠন করতে। কিন্তু কংগ্রেস তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ায় বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর পুরোনো দল লিগেই ফিরে যান। সরকার গঠনে আর-কোনো বাধা থাকল না, ফলে ফজলুল হকই প্রধানমন্ত্রী হলেন।

প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে জিন্নাহ্ তাঁকে দিয়ে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করান, যদিও ওই প্রস্তাব রচনায় তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না। আর ওই প্রস্তাবের পর থেকেই একদিকে যেমন মুসলিম লিগ ও জিন্নাহ্র জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, অন্যদিকে ফজলুল হক এবং জিন্নাহ্র মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। জিন্নাহ্র নিষেধ সত্ত্বেও হক কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যে দিল্লি গেলেন। দু-জনের মধ্যে বিরোধ আরও ঘনীভূত হয় ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিলে যোগদানের প্রশ্নে। জিন্নাহ্ এতে যোগ দিতে চাননি, কিন্তু ফজলুল হকের আপত্তি ছিল না।

লিগ ফজলুল হকের ওপর চাপ সৃষ্টি করে কাউন্সিল ছাড়তে, শাস্তির ভয়ও দেখাতে থাকে। অপমানিত ক্ষুব্ধ ফজলুল হক শুধু ডিফেন্স কাউন্সিল নয়, মুসলিম লিগ থেকেও পদত্যাগ করলেন। প্রতিবাদের সুরে জানিয়ে দিলেন, সাড়ে তিন কোটি বাঙালির নেতা তিনি। মুসলমান সংখ্যালঘু প্রদেশের কোনো নেতার, অর্থাৎ জিন্নাহ্র জবরদস্তি সইবেন না। এরপর একটা মিটমাট হল, কিন্তু দু-মাসের বেশি সেটা টেকেনি।

২৭ নভেম্বর ১৯৪১-এ ফজলুল হক, তাঁর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন কৃষক-প্রজা পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা এবং নির্দলীয় নিম্নবর্ণের হিন্দু সদস্যদের নিয়ে, যা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত। জোটসঙ্গী হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্যই এই নাম। প্রায় দেড় বছর এই সরকার ক্ষমতায় ছিল। শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে হকের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার, শ্যামাপ্রসাদের পিতা একদা আইনব্যবসায়ে হকের গুরু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুবাদে। কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যে নয়, আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ২৮ মার্চ ১৯৪৩-এ, মোট ছ-বছর বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকার পর, ব্রিটিশ গভর্নরের চাপে ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে হয়।

ক্ষমতায় থাকা কালে ফজলুল হক যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার ফলে বাংলার কৃষক ও খেতমজুরদের অনেক উপকার হয়। গ্রামের এই দরিদ্র মানুষদের মধ্যে সংখ্যায় যেহেতু মুসলমানরাই বেশি, প্রজাস্বত্ব ও কৃষিঋণ সংক্রান্ত আইন পরিবর্তনে তাঁরা লাভবান হলেন। দোকান-কর্মচারীদের স্বার্থেও তিনি আইন প্রণয়ন করেন। মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজেরও শক্তি বৃদ্ধি হল চাকরির ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ পেয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করে দেওয়ায় সব সম্প্রদায়েরই পিছিয়ে-থাকা মানুষদের কল্যাণ হল। কলকাতার লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের প্রতিষ্ঠার মূলেও তাঁর সমাজ-হিতৈষা। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ছড়ানো আরও বহু শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান তাঁর অবদান বহন করে।

তবে প্রথম মন্ত্রিসভা চলা কালে তিনি যতটা কাজ করতে পেরেছিলেন, দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় তার সামান্য অংশও করতে পারেননি, নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যে-উত্থান ঘটেছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে তার ক্রম-অবনমন শুরু হয়। পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪২ সাল থেকে তিনি জিন্নাহ্র দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে ভারতের মুসলমানদের যে-স্বপ্ন দেখিয়েছিল মুসলিম লিগ, তার মোহে মুসলমান সমাজের এক বৃহৎ অংশ আর-অন্য কোনো কথা শুনতে রাজি ছিল না, ফলে ফজলুল হক ক্রমে বাংলার রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি নিজে দুটি কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেও, তাঁর দল কৃষক-প্রজা পার্টি সব মিলিয়ে মাত্র চারটি আসন পেয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যে সংরক্ষিত একশো এগারোটি আসনের মধ্যে লিগ একাই অধিকার করে নেয় একশো তিনটি আসন এবং সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে তারাই সরকার গঠন করে।

দেশভাগের পরেও রাজনীতিতে ফজলুল হক ব্রাত্য হয়ে রইলেন অনেক কাল। কিন্তু বাহান্নর ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নতুন দল এবং নতুন জোট গঠন করে ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন।

দেশভাগের পরেও রাজনীতিতে ফজলুল হক ব্রাত্য হয়ে রইলেন অনেক কাল। কিন্তু বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নতুন দল এবং নতুন জোট গঠন করে ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। যদিও সেই সরকার বেশি দিন টেকেনি। তবে পাকিস্তানে গিয়েও যে তিনি কলকাতাকে ভোলেননি, তার প্রমাণ, প্রধানমন্ত্রী হয়ে যৌবনের কর্মক্ষেত্র কলকাতায় আসা। সেই সফর সম্পর্কে সাংবাদিক কালিপদ বিশ্বাস লিখেছেন, 'কী অভ্যর্থনাই না তাঁকে দিয়েছিল কলকাতার বাঙালি হিন্দু! সে অভ্যর্থনায় ঘটা তত ছিল না যত ছিল আন্তরিকতা।' প্রত্যুত্তরে ফজলুল হক বলেছিলেন, 'দেশভাগের দ্বারা বাঙালিকে, বাঙালি মনের কামনাকে দু-টুকরো করা যায় না, যাবে না।' পাকিস্তানে এর বিকৃত অর্থ করা হয় এবং তাঁর পদ খোয়ানোর পিছনে এটাই বড়ো কারণ।

এরপর ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজ্যপাল পদে ছিলেন। সেই পদ থেকেও যখন সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন বিরক্ত হয়ে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। এরপর আর বছর চারেক জীবিত ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষ যে তাঁকে ভোলেনি, তা বোঝা যায় জানাজায় প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের সমাবেশ থেকে।

তাঁর জনপ্রিয়তার আরও একটা উদাহরণ দিই। ফজলুল হক তখন অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী নন, বিরোধী দলে। একটা মামলায় সওয়াল করতে পিরোজপুরের দেওয়ানি আদালতে আসবেন খবর পেতেই, কি হিন্দু কি মুসলমান, এলাকার সবাই ছুটল আদালতের দিকে হক সাহেবকে দেখার জন্যে। ভাবখানা, 'অক শাইবরে না দ্যাখলে প্রাণডাই বিথা'। মৈনুদ্দিন

অন্তিম শয়ানে এ কে ফজলুল হক।

ছদ্মনামে ক্ষেত্র গুপ্তের স্মৃতিকথা '১৯৪৭' থেকে ঘটনাটার কথা জানতে পারি। বাঙালি মুসলমান নেতা হিসেবে জনপ্রিয়তায় ফজলুল হকের সঙ্গে একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের তুলনা চলে।

যে অব্যবস্থিত চিত্ত ও দোদুল্যমানতা মুজফফর আহ্‌মদ লক্ষ করেছিলেন তাঁর মধ্যে অনেক কাল আগেই, তা আরও প্রকট হয় পরবর্তীকালে তাঁর ত্রিবিধ দায়বদ্ধতার দরুন। নিজের সম্প্রদায়, নিজের ভাষা-জাতীয়তা এবং ভারতীয় সত্তা, এই তিনের মধ্যে তিনি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, যখন যেদিকে বৃষ্টির ছাঁট সেদিকেই ছাতা ধরেছেন। ফলে তাঁর নীতিতে স্থিরতা ছিল না।

ফজলুল হকের মহানুভবতার কিছু ছোটোখাটো দৃষ্টান্ত দিই। যেমন, কবি জসীম উদ্‌দীন এমএ পাস করে প্রায় সাত বছর বেকার বসে ছিলেন। তিনি জানতে পারেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার উপ-অধ্যাপকের পদ খালি রয়েছে। ফজলুল হক তখন শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন, শিক্ষামন্ত্রকও তাঁর হাতে। তিনি উপাচার্যকে বললেই চাকরি হয়ে যাওয়ার কথা জসীম উদ্‌দীনের। সামনেই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন। ফজলুল হক নিজের সেলুন কারে জসীম উদ্‌দীনকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় গেলেন এবং চাকরিরও ব্যবস্থা হল।

তবে নজরুলের সঙ্গে নাকি ফজলুল হক অনুদার ব্যবহার করেছিলেন, যখন ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে নজরুল 'নবযুগে'র সম্পাদক হন। তাঁর প্রাপ্য টাকা পাননি, এই মর্মে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে একটি চিঠিতে নালিশ ও আর্জি জানিয়েছিলেন নজরুল। চিঠি থেকে যেটুকু মনে হয়, 'নবযুগে' কাজ করার জন্যে তিনি তাঁর সিনেমার কনট্রাক্ট বাতিল করে দিয়েছিলেন। সিনেমাওয়ালাদের কাছ থেকে তিনি যে সাত হাজার টাকা নিয়েছিলেন, তা ফেরত দেওয়ার কথা। হক সাহেব সেই টাকা মিটিয়ে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু পরে প্রতিশ্রুতি রাখেননি। অন্য পক্ষের মত জানার উপায় যখন নেই, তখন এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে অভিমত দেওয়া কঠিন। চিঠিটির তারিখ ১৭ জুলাই ১৯৪২, আর ওই মাসেই নজরুল ব্যাধিগ্রস্ত হন এবং নির্বাক হন অগাস্ট মাসে। অসুস্থ অবস্থায় লেখা এই চিঠির ওপর নির্ভর করা কতদূর সংগত হবে, সেটাও একটা কথা।

এমনিতে ফজলুল হকের খ্যাতি ছিল দানশীলতা ও দয়ার জন্যে। এই দানের অভ্যাসের ফলে তাঁর নিজেরও সঞ্চয় বিশেষ ছিল না। অনেক সময় ধার নিয়ে অন্যকে সাহায্য করতেন। একবার একটা সামাজিক নিমন্ত্রণে যাওয়ার সময় দেখলেন মিষ্টি কেনার পয়সাও পকেটে নেই। বাধ্য হয়ে ড্রাইভারের থেকে ধার নিতে হল। আর-একটি ঘটনার কথা তাঁর পৌত্র এ কে ফজলুল হক জুনিয়রের লেখা থেকে জেনেছি। ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের জন্যে জায়গা দেখা হচ্ছে। ওইখানেই আবার তাঁর একান্ত সচিব আলতাফ গওহরের বাসা। গাড়ি থেকে নেমে দেখলেন, গওহরের বাচ্চারা একটা গাছের নীচে খেলছে। তাঁর মনে হল এখানে বাড়ি হলে শিশুরা খেলতে পারবে না। তিনি মত পরিবর্তন করে ঠিক করলেন, টিকাটুলির পুরোনো বাড়িতেই থাকবেন। দেড়-দুশো বছরের পুরোনো ওই তিন-তলা বাড়িতেই নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাটিয়েছেন ফজলুল হকের পরিবার।

ফজলুল হক নেই, কিন্তু তাঁর নাম দুই বাংলার অজস্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জুড়ে আছে আক্ষরিকভাবেই। বিশিষ্টদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই নামকরণে ফজলুল হক বোধ হয় সবচেয়ে এগিয়ে। তবে সেটা বাংলাদেশেই বেশি। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, কলকাতার লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ, যা তাঁর হাতেই তৈরি, বিদেশিনীর নাম ত্যাগ করে ফজলুল হক নামধারী হয়ে উঠুক! গত ২৬ অক্টোবর মুসলিম ইনসটিটিউটে ফজলুল হকের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে হলভর্তি মানুষের সহর্ষ সমর্থনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। এখন দেখার, তা নিয়ে আর নড়াচড়া হয় কি না! ■

গত তিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় চিকিৎসক

মহাম্মদ আলি

লড়াই করতে করতে এগিয়ে চলেছে জীবন

আসাদুল ইসলাম

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর এ পি জে আবদুল কালামের লেখা 'উইংস অব ফায়ারে'র মতো কিছু কিছু বই আছে, যা পড়ার পর মনে হতে পারে, এ-বই না পড়লে জীবনে একটা ঘাটতি থেকে যেত। ঠিক এরকমই সারা জীবন ধরে বহু মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ-পরিচয় হওয়ার মাঝে কোনো কোনো মানুষের জীবনকে জেনে, যাঁরা লড়াই-সাফল্যের কথা শুনতে ভালোবাসেন, তাঁদের মনে হতে পারে, এই মানুষটির জীবনকে না জানলে লড়াই-সাফল্য কাকে বলে ঠিকঠাক জানা হত না। এরকম একজনের সঙ্গে পরিচয় হল কয়েক দিন আগে। নাম মহাম্মদ আলি। মহাম্মদ আলির কথা কয়েক মুহূর্ত সরিয়ে রেখে বলে নিই, কেন বই পড়া আর মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করলাম লেখাটা। ভালো বই পড়া আর কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছি, এ-বিষয়টা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মোটিভেশনের বিখ্যাত বক্তা ও লেখক চার্লি জোনস ট্রিমেন্ডাস বলেছেন, আজকের আপনি আগামী পাঁচ বছরে কোথায় পৌঁছোবেন, সেটা নির্ভর করছে আপনি কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন এবং কী বই পড়ছেন, তার ওপর। এদিক থেকে দেখতে গেলে মহাম্মদ আলির সঙ্গে আমাদের সবার মেলামেশার করার সুযোগ না হলেও, তাঁর জীবনকে আমরা পড়তে পারি। সে-জীবনপাঠ আমাদের নতুন দিশা দিতেই পারে। দিশা দেওয়ার মতোই সংগ্রাম, সাফল্যে ভরপুর মহাম্মদ আলির জীবন। আসুন শুরু করি মহাম্মদ আলির কথা।

মহাম্মদ আলি, আল-আমীন মিশন থেকে ডাক্তারি পড়তে সুযোগ পাওয়া প্রায় হাজার খানেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একজন। এখন তাঁর নামটা লেখা হয় এভাবে— মহাম্মদ আলি, এমবিবিএস (ক্যাল), এমডি (পেড্রিয়াট্রিকস, পিজিআই, চণ্ডীগড়), এফপিসিসি (ফেলো পেড্রিয়াট্রিকস ক্রিটিক্যাল কেয়ার), ডিএম (পেড্রিয়াট্রিকস ইনটেনসিভ কেয়ার, পিজিআই, চণ্ডীগড়)। মহাম্মদ আলির ডিগ্রি পড়ে চিকিৎসার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা বুঝতে পারবেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকের ধারণা হতে পারে, অনেক ডাক্তারের যেমন এক-গাদা ডিগ্রি থাকে, সেরকমই কিছু। মহাম্মদ আলির বিষয়টা বোঝাতে শুধু এটুকু বলে রাখি, আলি যে-বিষয়ে ডিএম করেছেন, সেই বিষয়ে আলিকে নিয়ে গোটা ভারতে চিকিৎসক আছেন মাত্র ছ-জন। উত্তর-পূর্ব ভারতে একমাত্র মহাম্মদ আলি। আলির বর্তমান সম্পর্কে এটুকু জানা থাক। এবার আমরা বরং আলো ফেলি অতীতে। কতটা চড়াই-উতরাই টপকে আলি ওই উচ্চতায় পৌঁছেছেন দেখে নেওয়া যাক।

মহাম্মদ আলির বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার ভবানীপুর গ্রামে। ভবানীপুর গ্রামটিকে ঘিরে আছে খিদিরপুর, পার্বতীপুর, চন্দ্রপ্রসাদপুর, পুরন্দরপুর গ্রাম। কাছের শহর বহরমপুর। দূরত্ব বাইশ কিলোমিটার। ভবানীপুর গ্রামটা মুসলমান অধ্যুষিত। গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা চাষবাস। কিছু মানুষ মধ্য প্রাচ্যে যাচ্ছেন গত পাঁচ-সাত বছর থেকে, কম লেখাপড়া জানা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে। গ্রামের কেউ কেউ স্থানীয়ভাবে ছোটোখাটো ব্যাবসার সঙ্গেও যুক্ত। বর্তমানে গ্রামে লেখাপড়ার হার অনেকটাই বেড়েছে। গ্রামে প্রাইমারি স্কুল থাকলেও হাই স্কুল নেই। হাই

চিকিৎসাক্ষেত্রে ডা. মহাম্মদ আলি।

স্কুল পাশের পুরন্দরপুর গ্রামে। হাই স্কুলের পাশেই গত সাত-আট বছর হল একটা সরকারি মাদ্রাসাও চালু হয়েছে। গ্রামের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলেই ভর্তি হয়। ভবানীপুর গ্রামটা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার গ্রামেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য বহন করছে বলা যায়। এই গ্রামেই ১৯৮৪ সালের ৩ জুলাই মহাম্মদ আলির জন্ম। দাদু জামশেদ সেখের সাত পুত্রসন্তানের একজন আনিসুর রহমান, মহাম্মদ আলির বাবা। মহাম্মদ আলির দাদু এবং বাপ-চাচারা কেউই পড়াশোনা জানতেন না। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের মতো আলিদের পরিবারের প্রধান ভরসা ছিল চাষবাস। আলিরা আবার আট ভাই-বোন। বাবা-মায়ের সপ্তম সন্তান মহাম্মদ আলি। আলির ছোটোভাই মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আর এক দিদি উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন। বাকিদের পড়াশোনা মাধ্যমিকের মধ্যে। এইরকম এক পরিবার থেকেই উঠে এসেছেন মহাম্মদ আলি। কিন্তু এটা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়। কারণ, মনে হয় প্রতিটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষই বিশ্বাস করেন, যে কেউ সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছোতে পারেন, যদি উপযুক্ত পরিবেশ পান। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে প্রভূত সম্ভাবনা। কেউ তা বিকশিত করতে পারেন, কেউ পারেন না। এখনও কেউ কেউ গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, বংশগতিই সব। আদি পিতা আদম হতেই মানুষের সৃষ্টি, একাধিক ধর্মে এ-কথা বলা থাকলেও ধর্মনিষ্ঠ মানুষদের বংশগৌরব নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়, খেয়ালই করেন না ওই ধারণা আসলে ধর্মবিরোধী। কিন্তু পৃথিবীতে মহাম্মদ আলির মতো মানুষরাই প্রমাণ করেছেন, ওই ধারণা ভুল। শুধু তাই নয়, নিজেদের সাফল্য নিয়ে বঞ্চিতদের প্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন। ভরসা জুগিয়ে চলেছেন হাজার হাজার সেইসব ছেলেমেয়েদের, যাঁরা সাফল্যের শীর্ষ ছুঁতে সংগ্রাম করে চলেছেন প্রতিকূলতা সঙ্গী করে। যেমন একদিন প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছেন মহাম্মদ আলি। তাঁর লড়াইয়ের দিনগুলোতে ফেরা যাক।

প্রতিটি মানুষের জীবন কিছু সাধারণ আর কিছু অসাধারণ ঘটনার সমাহার। বিশিষ্ট মানুষদের জীবনে অসাধারণ ঘটনা বেশি থাকে, এই যা। আলির জীবনও নানা আশ্চর্যজনক ঘটনায় ভরপুর। মহাম্মদ আলির বাবা আনিসুর রহমান যে পড়াশোনা জানতেন না, তা আমরা জেনেছি। এটা জেনে হয়তো অনেকেই আশ্চর্য হবেন, এই মানুষটার কাছ থেকেই পড়াশোনা শেখার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন আলি। সেটা কীরকম? শুনুন আলির মুখ থেকে, 'আমার দাদা-দিদিরা যখন পড়াশোনা করতেন সন্ধ্যায়, আব্বা চেরাগ ধরে বসে থাকতেন। চেরাগ জানেন তো?'— হ্যাঁ, সাঁঝবাতি, বলার পর কথা এগিয়ে নিয়ে যান— 'দিদি-দাদাদের পড়া শুনে আব্বা অনেক পড়া মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। যখন আমরা তাঁর পাশে ঘুমোতে যেতাম, তিনি ছড়াগুলো আমাদের শোনাতেন। অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি খাব পেড়ে, এইসব অক্ষর চেনানো ছড়া আর অ-আ-ক-খ সব আব্বার কাছেই শেখা।' আলির প্রথাগত পড়ালেখা শুরুর ক্ষেত্রে ওঁর বাবার ভূমিকা আরও একটু বেশি। একেবারে শিশুবয়সে, দাদা-দিদিদের সঙ্গে কিছুদিন স্কুল যাওয়ার পর স্কুল-ভীতি তৈরি হয়। অন্য পড়ুয়াদের প্রহার করা দেখে অবোধ শিশু নিরাপদ দূরত্ব তৈরি করে। লেখাপড়ার চেয়ে অনেক ভালো নদীর পাড়ে মার্বেল খেলা। আর মার্বেল খেলায় তাঁর দোসর ছোটোভাই আয়াত আলি। আয়াতের জেদকে বাড়ির সবাই মান্য করতেন। তাই বাড়ির চাল নিয়ে গিয়ে দোকানে দিয়ে মার্বেল জোগাড় করার দায়িত্ব ছিল আয়াতের। স্কুল পালিয়ে খেলে বেড়াতেন দু-ভাই। একদিন বাবার হাতে ধরা পড়ে আয়াত যখন প্রহার খাচ্ছেন, তখন আয়াতকে খুঁজতে এসে আলি সেই দৃশ্য দেখে দে-দৌড়। বাবা পিছু নিয়ে ধরার পর জানতে পেরেছিলেন, স্কুল পালানোর প্রকৃত কারণ। স্কুলের শিক্ষকদের বলে, প্রহার করা হবে না— এই আশ্বাস পেয়ে শুরু হয় আলির স্কুলজীবন। সংগৃহীত তিনশো মার্বেল নিক্ষেপিত হল বাড়ির পাশের ময়ূরাক্ষী নদীর জলে, সঙ্গে জীবনের মার্বেল অধ্যায়ও। স্রোতের প্রতিকূলে জীবন-নৌকা বাওয়া শুরু করলেন আলি।

মহাম্মদ আলির প্রাথমিক পড়াশোনা খিদিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারপর ক্লাস ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত পড়েছেন পুরন্দরপুর জুনিয়র হাই স্কুলে, সেটা অবশ্য এখন হাই স্কুল। নাইন-টেন এই দু-বছর পড়েছেন ছাতিনা-কান্দি গুরুপদ হাই স্কুলে। ইলেভেন-টুয়েলভ আল-আমীন মিশন থেকে। এশিয়ার সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছেন আলি। তাঁর উচ্চশিক্ষার ভিত তৈরি হয়েছিল এই স্কুলজীবনে। সেই জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে লুকিয়ে আছে লড়াইয়ের গল্প আর প্রায় অবিশ্বাস্য নানা ঘটনা। শুরু করা যাক সেই বৃত্তান্ত।

মহাম্মদ আলি ক্লাস ওয়ান পড়েননি, সরাসরি টু-য়ে ভর্তি হন। ফোর পর্যন্ত প্রথম হতেন। ক্লাস ফাইভে ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হলেন, রোল

নম্বর হল ৬। কিন্তু সিক্সে ওঠার সময় দেখা গেল ...। এই পর্যন্ত পড়ে হয়তো অনেকেই ভেবে নিয়েছেন, বাক্যটার শেষ অংশটুকু হবে— মহাম্মদ আলি হলেন ফার্স্ট। কিন্তু মোটেও তা নয়। যাঁর ৩৭ রোল ছিল তিনি হলেন ফার্স্ট, যাঁর ছিল ১২ রোল তিনি হলেন দ্বিতীয়, আর যিনি ফার্স্ট ছিলেন, তিনি হলেন থার্ড। আর মহাম্মদ আলির রোল সেই ৬ থেকে গেল। ঘটনাটা মহাম্মদ আলির কাছে ধরা দিল অন্যরকমভাবে। তিনি দেখলেন পিছনের সারি থেকে উঠে এসে যিনি প্রথম হলেন, তাঁকে সবাই পাত্তা দিচ্ছেন, যেচে বন্ধুত্ব করছেন। পাত্তা পাওয়ার লোভেই, বলা যায়, মহাম্মদ আলি ফার্স্ট হতে চাইলেন। মহাম্মদ আলি দেখলেন, যারা ফার্স্ট-সেকেন্ড হন প্রত্যেকেই টিউশনি পড়েন। টিউশনি পড়ার কথা বাড়িতে গিয়ে মাকে বললেন। কিন্তু টিউশনি পড়াবার পয়সা কোথায়! সম্পর্কে এক আত্মীয়ের কাছে নিয়ে গেলেন মা। তিনি নূর সেলিম। মহাম্মদ আলির প্রথম টিউশনি শিক্ষক। ছেলে পড়িয়ে তিনি হয়তো সামান্যই উপার্জন করতেন। তবু তিনি মহাম্মদ আলিকে প্রায় বিনা পয়সাতেই পড়াতে চাইলেন। টিউশনিতে ভর্তি হওয়ার পর, এমন ভাবার কারণ নেই, মহাম্মদ আলি পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে গেলেন। যেমন চলছিল সেরকমই চলতে লাগল। আগে মহাম্মদ আলি স্কুলের পড়া পিরিয়ডের ফাঁকে ফাঁকে স্কুলেই পড়ে নিতেন। টিউশনিটায় লাভ হল, ঘণ্টা দুয়েক বাড়তি সময় বইখাতাপত্রের সঙ্গে কাটান। বাড়ি ফিরে তাঁর পড়াশোনা করার সময় কোথায়? মার্বেল খেলা বন্ধ হলেও, তার জায়গা নিয়েছে ক্রিকেট। চাচাতো ভাইদের নিয়ে সাত জনের টিম ছিল মহাম্মদ আলিদের। সকালে উঠে যেখানে পড়ুয়াদের পাঠে মন দেওয়ার রেওয়াজ, সেখানে ওই টিম চা পান করে বেরিয়ে পড়ত ব্যাট নিয়ে। মহাম্মদ আলি, আয়াত আলিদের এক হাতে থাকত বাঁশকঞ্চির উইকেট, অন্য হাতে ছাগলের দড়ি। মা-বাবা মনে করতেন, ছাগলগুলো চরালে খানিকটা উপকার হবে। কিন্তু কোথায় কী! শুকনো খটখটে মাঠে ছাগল বেঁধে দিয়ে চলত ক্রিকেট খেলা। ওদিকে ছাগলগুলো খিদেয় চিৎকার করতে করতে সর্বশক্তি দিয়ে গোঁজ খুলে নিয়ে অন্যের সবুজ ফসলে মুখ ডুবিয়ে আশ মেটাত। চাষি ছাগল ধরে খোঁয়াড়ে দিত। খোঁয়াড়ে দিলেই দশ টাকা দিয়ে ছাড়াতে হত। এই অন্যায়ের বিনিময়ে জুটত মার আর বকা খাওয়া। ক্লাস টেন পর্যন্ত এই রুটিন ছিল। ছাগল পোষাটা মহাম্মদ আলিদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অনেকদিন পর্যন্ত। বস্তুত চাষবাস আর পশুপালনই হল মানুষের জীবনযাপনের প্রাচীন পেশা। শুধু প্রাচীন নয়, আজও এই পৃথিবীর অনেক মানুষের প্রধান জীবিকাও বটে। মহাম্মদ আলিদের বিঘে আড়াই জমি ছিল। সেই জমিতে কখনও ফসল হত কখনও হত না। কারণ, জমি বর্ষায় ডুবে যায় তো শুখা মরসুমে পড়ে খরার কবলে। প্রকৃতির দয়া আর তাঁর বাবা আনিসুর রহমান ও দাদা আহম্মদ আলির যৌথ পরিশ্রমে ফসল ফললে ভাতের ব্যবস্থাটুকু হত। কিন্তু জামাকাপড়, ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য খাতা-পেন কেনার খরচ আসবে কোথা থেকে? সেগুলো জোগান দিতেই ছাগল পালতে হত। বছরে একবার, যেকোনো একটি ইদে নতুন জামাকাপড় হত ওই ছাগল বিক্রির টাকায়। পাঠক লক্ষ করবেন, দুটো বাক্য পেছনে ছাগল বিক্রির টাকায় জামাকাপড় আর খাতা-পেন কেনার কথা বলেছি। বইয়ের কথা বলিনি। মহাম্মদ আলি আজ সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে বলছেন, 'নতুন বই পেতে খুব ইচ্ছা করত। কিন্তু পেতাম না। দিদিদের পুরোনো বই নিয়ে পড়াশোনা করতে হত। ক্লাস টেনে যখন পড়ি, নতুন বই কেনা হয়েছিল। দাদা, মানে আহম্মদ আলি খুব রেগে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, নতুন বই কেনা মানে অপচয় করা, বিলাসিতা করা।' এইসব বিলাসিতা আহম্মদ-মহাম্মদ-আয়াতদের জন্যে নয়। এই সামান্য বিষয় কেন বিলাসিতা মনে হচ্ছে আহম্মদ আলির? তাঁকে না জানলে সেটা বোঝা যাবে না। আহম্মদ আলিকে আমরা জেনে নিই মহাম্মদ আলির বক্তব্য থেকে: 'দাদা আমাদের পরিবারের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছেন। আমাদের যৌথ-পরিবার ছিল। বাপ-চাচারা যখন পৃথক হন, আব্বার তখন গ্যাসট্রিক আলসার। দাদা ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় থেকে মাঠে কাজ করা শুরু করেন। সেভেনে পড়া একটা ছেলের হাতে যখন থাকার কথা পেন-ব্যাট-বল তখন দাদা কোদাল-কাস্তে তুলে নিয়েছিলেন। এই পরিশ্রম করাও ঠিক ছিল, যদি দু-বেলা পেটপুরে খেতে পেতেন। এমন দিন গেছে যখন দাদা সকাল বেলা না খেয়ে মাঠে চলে গেছেন। স্কুল যাবেন বলে বাড়ি ফিরে স্নান করে দেখেন বাড়িতে খাবার কিছু নেই। না খেয়েই স্কুলে চলে গেছেন। মা হয়তো দুপুর বেলা সামান্য কিছু খাবার জোগাড় করেছেন। দাদা বসে থেকে সবার খাওয়ার শেষে খেতে বসতেন। আমি মাছ-মাংস খেতাম না, তবে ডিম খুব ভালোবাসতাম। ডিম না হলে ভাত খেতাম না। সব দিন সমান হত না, হয়তো কোনোদিন একটাই ডিম হয়েছে। দাদার পাশেই বসে খাচ্ছি। দাদাকে কোনোদিন মনখারাপ করতে বা মায়ের কাছে কিছু অভিযোগ করতে শুনিনি। আমার দাদা সবার বড়ো নয়, তাঁর আগে এক দিদি আছেন। আমার দিদিরা পাঁচ জন। দাদা বিয়ে করে নিলে দিদিদের বিয়ে দিতে অসুবিধা হতে পারে ভেবে দাদা বহু দিন বিয়ে করেননি। সব বোনের বিয়ে দিয়ে বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। শুধু ছোটোবোনের বিয়ের আগে, মানে চার বোনের বিয়ে দেওয়ার পর, বিয়ে করেছেন। দাদাকে এরকমও করতে দেখেছি, হয়তো শ্বশুরবাড়ি থেকে প্যান্ট-জামা কিনতে বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে টাকা দিয়েছে, যে-টাকা দাদা আমাদের জন্য খরচ করেছেন। এরকম দাদা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। দাদা না থাকলে আমাদের কিছু হত না।' কথা বলতে বলতে গলা ধরে আসে আলির। অন্যমনস্ক হয়ে নিজের মুখের সঙ্গে আলির দাদার মুখটা মেলাতে থাকি। খানিক মেলে খানিক মেলে না। আলির দাদাকে দেখার ইচ্ছে তৈরি হয় মনের গভীরে। সে-কথা আলিকে বলা হয় না। সে-কথা থাক, কয়েক অনুচ্ছেদ আগে ছেড়ে আসা আলির পড়াশোনার কথায় ফিরে যাই।

ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে মিশনে পড়তে হবে। আল-আমীন মিশনের ক্ষেত্রে এই একটি ঘটনা বার বার ঘটতে দেখা যায়। আল-আমীনের পড়ুয়ারা এবং প্রাক্তনীরাই পরিচিত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মিশনে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আল-আমীন মিশন যে সেরা মেধাবীদের সেরা ঠিকানা, তা মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে ভালো আর কে জানে!

স্কুলে সহপাঠীদের কাছে পাত্তা পাওয়ার বাসনা আলিকে ৬ রোল থেকে

তুলে আনল ৩ নম্বরে। সেটা সিক্স থেকে সেভেনে ওঠার সময়। সেভেন থেকে শুরু হল প্রথম হওয়া। এর মানে এই নয় যে, আলি পড়াশোনায় খুব মন দিলেন। স্কুলের পড়া স্কুলে, টিউশনির পড়া টিউশনিতেই করে নিতেন। হোম ওয়ার্ক কিছু করতেন, সেটা বাড়িতে বসে খাতা-পেন নিয়ে নয়, খেলার ফাঁকে ফাঁকে খেলার ছলেই। আলিদের প্রতিবেশীদের বাড়ির দেয়াল ছিল পাকা। সেই দেয়ালে নানা রঙের ইটের টুকরো দিয়ে ছড়া, কবিতা, ছবি আঁকা চলত। সাদা, কালো, খয়েরি, লাল রঙের লেখায় রঙিন হয়ে উঠত দেয়াল, সঙ্গে আলির মনও। একদমই পড়াশোনা করতেন না, তা নয়, পরীক্ষার আগে সবটা একবার রিডিং দিয়ে যেতেনই। এর জন্যে বাবাকে

সস্ত্রীক ডা. মহাম্মদ আলি।

রাত্রে তুলে দিতে বলতেন। রাত থেকে সকালে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত একটানা পড়ে নিতেন। এতেই হয়ে যেত? জিজ্ঞাসা করায় আলি বলেন, 'হ্যাঁ, বাড়তি পড়তাম না। যেকোনো পড়া একবার পড়লেই আমার সবটা মনে থেকে যায়। আজও।' স্মৃতিশক্তি তো সবার সমান হয় না। কেউ সামান্য পড়ে ভালো ফল করে, কাউকে অনেক পড়তে হয়। এই সামান্য পড়াশোনা ছাড়া বাড়ির কাজকর্ম কিছু করতেন কি না, জানতে চাওয়ায় আলি জানালেন, 'দাদা সব সময় বলতেন, কাজ করতে হবে না, তুই পড়। কিন্তু আমার সব সময় পড়তে ভালো লাগত না। তাই কাজও করতাম। সব রকমের কাজ। ক্লাস এইট থেকে টেন পর্যন্ত চাষের সব কাজ করেছি। মিশনে পড়ার সময় বাড়ি গেলে, এমনকী এমবিবিএস থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় পর্যন্ত মাথায় করে মাঠ থেকে ধান বয়ে এনেছি।' শুনে কি মনে হচ্ছে এসব অবাক করা ঘটনা? মোটেও না। যাঁরা লড়াই করেন এরকমভাবেই করেন। আমরা যেসব সংগ্রামী জীবনকে জানি এবং যাঁদেরকে জানি না, তাঁদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন ঘটনা। তবে ভাগ্য কাউকে কাউকে বাড়তি সুবিধা দেয়। যেমন আলি জানিয়েছেন আহম্মদ আলিকে দাদা হিসেবে পাওয়াটা, তেমনি কিছু শিক্ষক, কিছু বন্ধু মহাম্মদ আলি পেয়েছেন ভাগ্যের জোরেই। বন্ধুভাগ্যের কথাটাই প্রথমে বলা যাক। মহাম্মদ আলিদের কোনো সাইকেল ছিল না। আলি সাইকেল চালাতেও পারতেন না। এতক্ষণ আমরা যতটা আলিকে জেনেছি সেখান থেকে আন্দাজ করা যায়, স্কুলে টিফিন খাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না আলির। কিন্তু এ-দুটো নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি আলিকে। সৌজন্যে তাঁর বন্ধু-সহপাঠীরা। পুরন্দরপুরের স্কুলে পড়ার সময় গৌতম মণ্ডল সাইকেল নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন বন্ধুকে নিয়ে যাবেন বলে। টিফিন খাওয়াতেন রেজ্জাক আলি, তাঁর খাবার ভাগ করে। টিউশনি পড়তে যেতেন তরুণ মণ্ডলের সাইকেল চেপে। কান্দি হাই স্কুল ছিল বাড়ি থেকে আট কিমি দূরে। বাস স্টপ থেকে পায়ে হেঁটে যেতে সময় লাগত কুড়ি মিনিটের মতো। প্রতিদিন বাস স্টপ থেকে সাইকেলে নিয়ে যাওয়া আর টিফিন খাওয়ানোর ভার নিয়েছিলেন আনসার আলি। পরে আল-আমীন মিশনে পড়ার সময় অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। এমবিবিএস পড়ার সময় তন্ময়কুমার মণ্ডল নামে একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তন্ময়ের কথা আর-একটু পরে আমরা শুনব। আলির জীবনে এইসব বন্ধুরা এক-একটা সময়ে এক-একটা ভূমিকা পালন করে তাঁকে এগিয়ে দিয়েছেন। আলির সঙ্গে এইসব বন্ধুদের কারো কারো সঙ্গে যোগাযোগ আছে। কেউ হারিয়ে গেছেন জীবন থেকে। যেমন আনসার আলি। মহাম্মদ আলি অনেকদিন পর দেখা করতে গিয়ে জানতে পেরেছিলেন, আনসারদের গোটা পরিবার অন্যত্র চলে গেছেন। হয়তো আনসারের সঙ্গে আর দেখা হবে না আলির। তবু আনসার থেকে যাবেন আলির হৃদয়ে। জীবন এরকমই। চলার পথে, এক-একটা পর্যায়ে, কিছু মানুষ জড়িয়ে পড়েন জীবনের সঙ্গে। তাঁদের সান্নিধ্যে, সখ্যে ভরে ওঠে জীবন। পর্বান্তরে, অন্য দৃশ্যে, নতুন মুখ দেখা যায়। একদিন তার ভূমিকাও হয়তো আনসারের মতো শেষ হয়ে যায় সবার অলক্ষে।

বন্ধুদের কথা তো কিছুটা জানলাম আমরা, এবার আসি শিক্ষকদের কথায়। মহাম্মদ আলির প্রাইভেট টিউটর নূর সেলিমের কথা ইতিমধ্যে বলেছি। প্রায় বিনা পয়সায় উনি ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়িয়েছেন তো বটেই, আর-একটা বড়ো পাওনা— ওই স্যারের কাছে না গেলে হয়তো আল-আমীন মিশনে পড়তে যাওয়াই হত না। নূর সেলিম সাহেবের প্রাক্তন ছাত্র হাসিবুর রহমান। যিনি আল-আমীন মিশনে পড়ে পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। এখন বহুজাতিক সংস্থায় মোটা অঙ্কের বেতনের চাকরি করেন। যিনি আবার আলির মতোই কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান। হাসিবুর মিশন সম্পর্কে সব তথ্য দিয়েছিলেন। শুধু তথ্য দেওয়া নয়, বাড়ি গিয়ে আলির দাদাকে জানিয়েছিলেন সব। আলিকেও উৎসাহিত করেছিলেন। বলেছিলেন, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে আল-আমীনে পড়তে হবে। আল-আমীন মিশনের ক্ষেত্রে এই একটি ঘটনা বার বার ঘটতে দেখা যায়। আল-আমীনের পড়ুয়ারা এবং প্রাক্তনীরাই পরিচিত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মিশনে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আল-আমীন মিশন যে সেরা মেধাবীদের সেরা ঠিকানা, তা মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে ভালো আর কে জানে! ফিরে আসি মহাম্মদ আলির শিক্ষকদের কথায়। নাইনের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় রেজাল্ট বের হতে দেখা গেল, আলি সব বিষয়ে ভালো ফল করলেও ইংরেজিতে পেয়েছেন মাত্র ৫১। স্কুলের ইংরেজি স্যার ছিলেন তরণীকান্ত সিনহা। উনি একদিন স্কুল-শেষে গেটের কাছে সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আলিকে ডেকে বললেন, বাড়িতে আসবি, ইংরেজিটা দেখিয়ে দেব, বাড়ি চিনিস তো? উনি বাড়িতে টিউশনি পড়াতেন। স্যারের কথা শুনে আলি চুপ করে আছেন। টিউশনির পয়সা কীভাবে দেবেন, এমন ভাবছিলেন কি না বোঝার উপায় নেই। স্যার বললেন, কোনো পয়সা-কড়ি দিতে হবে না। এখন আলি স্বীকার করেন, ইংরেজি যতটুকু শিখেছি ওই স্যারের জন্যই। আলি ছাতিনা-কান্দি গুরুপদ

হাই স্কুল থেকে ২০০০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেলেন ৬৯৪ নম্বর। শতাংশের হিসাবে ৮৭। যা এখনও পর্যন্ত ওই স্কুলের সর্বোচ্চ নম্বর। আলির এই সাফল্যে স্কুল থেকে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। টাকা, বইপত্র, পোশাক-সহ অনেক উপহার তুলে দেওয়া হয়েছিল আলির হাতে।

মাধ্যমিকের পর আলি বড়ো স্বপ্ন বুকে নিয়ে পা রাখলেন আল-আমীন মিশনের উঠোনে। খলতপুরে। আল-আমীন মিশন দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের যে বিশেষ আর্থিক ছাড়ের সুযোগ দেয়, তা পেয়েছিলেন আলিও। বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। আলির কোনো ভর্তি-ফিও নেয়নি মিশন। মিশন নিয়ে অনেক স্মৃতি, অনেক কথা। সেখান থেকে বেছে নিয়ে কয়েকটা বলা যাক। মিশনে ভর্তি হয়ে আলি প্রথম ধাক্কা খেলেন ত্রিকোণমিতির ক্লাসে। স্যার ক্লাস করতে এসে শুরু করলেন এভাবে, অনুশীলনী একের কোনো অঙ্ক করতে হবে? ছাত্ররা বলল— না। এভাবে ন-নম্বর অনুশীলনীতে গিয়ে স্যার অঙ্ক শেখানো শুরু করলেন প্রথম দিনের ক্লাসে। মিশনে আগে থেকে পড়া ছাত্ররা এগিয়ে থাকার কারণেই ওটা হয়েছিল। মহাম্মদ আলি নতুন, জড়তা কাটিয়ে কিছু বলতে না পারার প্রভাব পড়ল প্রথম পরীক্ষায়। পেলেন ২৮-এর মতো। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে মিশনের সমস্যার মধ্যে দাদাকে অঙ্ক বুঝতে না পারার কথা জানিয়ে ছিলেন আলি। ওই ছুটির ক-দিন একজনের কাছে অঙ্কটা শিখেছিলেন কিছুটা। ফাইনাল পরীক্ষায় মহাম্মদ আলি অঙ্কে পেলেন ৯২। মিশনে পড়াশোনা নিয়ে আরও দুটো ঘটনা স্মরণ করা যায়। ইলেভেনের প্রথম পরীক্ষায় কেমিস্ট্রির খাতা দেখেছিলেন মোশারফ স্যার। তিনি উত্তরপত্র নিয়ে আলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন উত্তর কীভাবে তৈরি করলে? দু-তিনটে বই নিয়ে তৈরি করেছি, বলেছিলেন আলি। পরে আলিকে উনি নিজের রুমে আলাদা করে যত্ন নিয়ে কেমিস্ট্রি দেখিয়ে দিতেন। পরের ঘটনা টুয়েলভের প্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময়। বোর্ডের পরীক্ষার জন্য আলিদের ব্যাচের রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল শ্যামপুর হাই স্কুল থেকে। ওই স্কুলে দেওয়া প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় আলি ফিজিক্সে ৯০-এর মধ্যে ৯০ পেয়েছিলেন। ওই স্কুলের ফিজিক্স স্যার এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন, মিশনে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মিশন জুড়ে একটা অন্যরকম ভালো লাগা তৈরি হয়েছিল। এবার মিশনের বন্ধুদের কথায় আসা যাক। মিশন মানেই অনেকে মনে করেন শুধু পড়া আর পড়া। কিন্তু এর মাঝেও যে নিয়ত কত সুখস্মৃতি তৈরি হয়, তা কেবল ব্যাচ-মেটরাই জানে। মহাম্মদ আলির ব্যাচে ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন জন। প্রথম হতেন হাম্মাদুর, যাঁর কথা 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগে আপনাদের জানিয়েছি। হাম্মাদুর ভারত-সেরা প্রতিষ্ঠান এইমস থেকে ডিএম করেছেন। মহাম্মদ আলি শিশুদের চিকিৎসার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান পিজিআই, চণ্ডীগড় থেকে ডিএম করেছেন। শুধু তাই নয়, হাম্মাদুর ও মহাম্মদ আলির বিষয় আলাদা হলেও দুজনেই সর্বভারতীয় স্তরে একটি মাত্র আসনের জন্য ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আল-আমীন মিশনের একই ব্যাচের দুই ছাত্রের এমন অসাধারণ সাফল্য যথেষ্ট গর্বের। আল-আমীন মিশনের উত্থান ও প্রসার যেমন পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের কাছে গর্বের, ঠিক তেমনি আল-আমীন মিশনকে গর্বিত করেছে মহাম্মদ আলি-হাম্মাদুর রহমানের মতো মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা। ওই ব্যাচের মুর্শেদ আলম ডাক্তার হয়েছেন, রেডিয়োলজিতে এমডি করেছেন, তানবির আহমেদ ডাক্তার হয়েছেন, ডাক্তার হয়ে চাকরি করছেন মনোয়ার আলি, রেজ্জাক সেখ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হয়েছেন, বাপি সেখ ইঞ্জিনিয়ার, আবদুল মগনি হয়েছেন স্কুল শিক্ষক। পুরো ব্যাচটাই সুপ্রতিষ্ঠিত। বন্ধুদের কথা স্মরণ করতে গিয়ে আলি স্মৃতি হাতড়ান। কয়েক জনের কথা বলেন। যেমন বজলুল হক। 'ওর কাজ ছিল সবার পিছনে লাগা। নানা অঙ্গভঙ্গি করতে পারত। আবদুল আজীজ ছিল আদনান স্বামীর চেয়ে একটু বেশি মোটা, ওয়াইস কুরনি ছিল শাহরুখ খানের ভক্ত। চুল, পোশাক, হাঁটাচলা সবকিছু ছিল শাহরুখ খানের মতো। বাপি সেখ ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভক্ত। কেউ যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টা পড়তে পারেন, তা রাজ্জাক আলিকে না দেখলে জানতে পারতাম না।' মজা হত না, জিজ্ঞাসা করায় আলি বললেন, 'প্রচুর মজা হত। মজা করতে করতে, কথা বলতে বলতে পিছনের দিকে হেঁটে তিন তলা থেকে পড়ে গিয়েছিল আলি হোসেন। শিড়দাঁড়ায় আঘাত লেগেছিল।' আল-আমীন মিশনে এসে প্রাপ্তির কথা বলতে গিয়ে আলি পড়াশোনা, ইসলামি কালচার আর এইসব বন্ধুদের সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করেন। মহাম্মদ আলি ২০০২ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেলেন ৮৮.৭ শতাংশ নম্বর। ওই বছরই রানিংয়ে জয়েন্ট মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক হল ১২৭ আর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩৮৩। আলি বাবার কথামতো ডাক্তারিতে ভর্তি হলেন। আলির বাবা দীর্ঘ দিন গ্যাসট্রিকে ভুগেছিলেন, হয়তো সেই কারণেই একজন ঘরের ডাক্তার চেয়েছিলেন তাঁর বাবা। কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হলেন। ভর্তি হওয়ার সমস্ত খরচা দিয়েছিল মিশন। শুধু তাই না, যতদিন আই ডি বি স্কলারশিপ পাননি ততদিন মাসিক খরচও জুগিয়েছে মিশন জি ডি স্কলারশিপ থেকে। আই ডি বি লোন-স্কলারশিপের আবেদনটাও করে দিয়েছিল মিশন। স্কলারশিপের অর্থ শুধু পড়াশোনার কাজে লাগেনি আলির, যতটা পারা যায় খরচ বাঁচিয়ে যেটুকু থাকত, তা বাড়িতে দেওয়া বা বাড়ির ইদের কেনাকাটা করার মতো কাজও চালিয়েছেন। আর্থিক দিকটা যখন এভাবে সামাল দিচ্ছেন তখন পড়াশোনার দিকে তৈরি হল নতুন সমস্যা। ইংরেজি ভালো না জানার জন্য পড়াশোনার প্রতি অনীহা বাড়তে লাগল। মনোয়ার হোসেনও এনআরএসেই সুযোগ পেয়েছিলেন। দু-বন্ধু মিলে ঘুরে বেড়ানো, সিনেমা দেখায় মজে গেলেন। ফল হল প্রথম পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে ফেল। ক্লাস শুরু হওয়ার ছ-মাসের মাথায় একটা ঘটনা ঘটল। অ্যানাটমির ক্লাসে একটা কঠিন বিষয়, যা অনেক ভালো ছেলেমেয়েরাও সহজে আয়ত্ত করতে পারে না, পড়ে যাওয়ার কারণে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেন। ক্লাস-শেষে তন্ময়, যাঁর কথা উল্লেখ করেছি, আলিকে সন্ধ্যায় তাঁর রুমে আসতে বলেন। তন্ময় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনী, হুগলি জেলার আরামবাগে বাড়ি, ইংরেজিতে তুখোড়। শুধু ইংরেজি নয়, মেডিকেল সায়েন্সের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রচুর খবর রাখেন। মহাম্মদ আলি তাঁর জীবনের মোড় ঘোরানো ঘটনায় এক-একটি পর্যায়ে এক-একটি ঘটনার কথা বলেছেন। তার মধ্যে তন্ময়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ঘটনা একটি। মহাম্মদ আলির প্রথম জীবনে মা-দাদার ভূমিকা

হাম্মাদুর ভারত-সেরা প্রতিষ্ঠান এইমস থেকে ডিএম করেছেন। মহাম্মদ আলি শিশুদের চিকিৎসার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান পিজিআই, চণ্ডীগড় থেকে ডিএম করেছেন। শুধু তাই নয়, হাম্মাদুর ও মহাম্মদ আলির বিষয় আলাদা হলেও দুজনেই সর্বভারতীয় স্তরে একটি মাত্র আসনের জন্য ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

অপরিসীম। ডাক্তারি জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে আছে আল-আমীন মিশন। আর ডাক্তারির উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছোনোর জন্য তন্ময়ের পথপ্রদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যানাটমির ওই ক্লাসের পর তন্ময় নিজে ডেকে মহাম্মদ আলিকে প্রতিটি চ্যাপটার ধরে ধরে বুঝিয়েছিলেন। ফলে মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কে আগ্রহ বহু গুণ বৃদ্ধি পায় আলির। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এমবিবিএস পাস করেন। এমডি-তে ভর্তির জন্য স্টেট ও অল ইন্ডিয়া দুটো স্তরেই ভর্তির পরীক্ষা দিলেন। রাজ্যে র‍্যাঙ্ক হল ৩৩০। অল ইন্ডিয়াতে কোনো র‍্যাঙ্কই হল না। তন্ময়ই পরামর্শ দিলেন কোচিং নেওয়ার। অন্য প্রসঙ্গে গেলে তন্ময়ের কথা হয়তো আর বলা হবে না, তাই আরও দুটো গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের কথা জানিয়ে রাখা যাক। তন্ময়ই আলিকে প্রথম বলেছিলেন, পড়তে হলে সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আর সেরা বইপত্র পড়তে হবে। আলি যখন পেড্রিয়াট্রিকস নিয়ে এমডি করার চিন্তা করছেন, তখন তন্ময়ই বলেছিলেন পেড্রিয়াট্রিকস করলে চণ্ডীগড় থেকেই করতে হবে। কোচিং নেওয়ারও পরামর্শ দিলেন দিল্লির আইএএমএস থেকে। ওদের কোর্স-ফি পঞ্চান্ন হাজার টাকা। হাতে এক পয়সাও নেই। আল-আমীন মিশন জি ডি স্কলারশিপ থেকে তিরিশ হাজার টাকা ব্যবস্থা করে দিল। বাকি টাকা আলি মেজোদিদির থেকে নিয়ে উঠে বসলেন দিল্লিগামী ট্রেনে। উঠলেন বসন্ত বিহারের এক হস্টেলে। সেটা ছিল মার্চ মাস। প্রচণ্ড গরম। একটা ছোটো রুমে তিনটে বেডে তিনজন থাকেন। পাখা একটা। ক্যান্টিনে এত মাছি যে, হাত দিয়ে ধরতে গেলে একমুঠো মাছি ধরা যাবে। রাতে ঘুম হয় না। অন্যদিকে কোচিং হত এয়ার কন্ডিশনড রুমে। ক্লাস শুরুর সামান্য সময় পরেই কোচিং ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়তেন আলি। সবাই হাসাহাসি করত। বলত ডিস্টার্ব করিস না, টাকা দিয়ে ঘুমোতে এসেছে। কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে সুবিধা হল, কী ধরনের প্রশ্ন আসে, কীভাবে উত্তর করতে হয়, পড়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো জানা গেল। কষ্ট সহ্য করে থাকতে না পেরে বন্ধুদের কয়েক জন ফিরে এলেন। আলি দাঁতে দাঁত চেপে শুধু প্রার্থনা করে গেলেন ভর্তির পরীক্ষাগুলো দেওয়া পর্যন্ত যেন থাকতে পারেন। এদিকে অন্য একটা ভালো ব্যাপার ঘটল। আইএএমএসের দেশ জুড়ে কোচিং সেন্টার ছিল কুড়িটার মতো। সব ব্রাঞ্চ মিলে যে-স্টুডেন্ট ক্লাস টেস্টে ফার্স্ট হতেন, তাঁকে দেওয়া হত পাঁচ হাজার টাকা। মহাম্মদ আলি পর পর চার বার ফার্স্ট হয়েছিলেন। তিন মাস পর এইমস-এর ভর্তির পরীক্ষা দিলেন। এক মাস পর পিজিআই, চণ্ডীগড়ে। এইমস-এর ভর্তির পরীক্ষায় সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হল ৩৬। চণ্ডীগড়ে যে-দিন পরীক্ষা দিলেন সে-দিন বিকেলেই রেজাল্ট বের হতে দেখা গেল ১৪ র‍্যাঙ্ক হয়েছে। দু-জায়গাতেই পেড্রিয়াট্রিকস পড়ার সুযোগ পেলেন। পিজিআই, চণ্ডীগড়ে ভর্তি হলেন বন্ধু তন্ময়ের পরামর্শের কথা মনে রেখে। এমডি শেষ হল ২০১১ সালে। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ইনসটিটিউট অব মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, চণ্ডীগড়, যাকে আমরা এতক্ষণ পিজিআই, চণ্ডীগড় বলে আসছি, তার এত সুখ্যাতি কেন? জিজ্ঞাসা করায় মহাম্মদ আলি জানালেন, 'ওখানে ভালো পড়াশোনা হয়, এটা তো সকলেই আন্দাজ করতে পারছেন। কিন্তু কীভাবে হয় জানেন? প্রায় মেলেটারি ট্রেনিংয়ের মতো। আঠারো ঘণ্টা ডিউটি করতে হয়। কোনো রোগী বিনা যত্নে পড়ে আছেন, এটা ভাবাই যায় না ওখানে। পুরো দায়িত্ব নিয়ে দেখতে হয় সবটা। চিকিৎসা কী সেটা ওখানে না গেলে বোঝা যাবে না। আমেরিকার স্কলাররা এসেছিলেন আমরা যখন পড়ি, কোনো খুঁত ধরতে পারেননি। ওখানে আছেন বিখ্যাত ডেডিকেটেড ফ্যাকাল্টি। বিশেষ করে প্রফেসার সুমিত সিংঘির কথা বলতে চাই। উনি বিভাগীয় প্রধান, আবার ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব পেড্রিয়াট্রিকস ক্রিটিক্যাল কেয়ার সোসাইটির প্রেসিডেন্টও। এমন শিক্ষক সত্যিই দুর্লভ। যদি ভবিষ্যতে কিছু হতে পারি, জানবেন, ওঁর জন্যেই হয়েছি। এমডি শেষ করার পর এক বছর সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসেবে পিজিআই-তে কাজ করতে হয়। যেটা শিখলেন, তা হাতে-কলমে প্রয়োগ করার জন্য। এমডি করার পর আরও উচ্চতর পড়াশোনার তেমন আগ্রহই ছিল না আলির, এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন একজন, তাঁর স্ত্রী মাজদুন নাহার। ২০১১ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন আলি। আল-আমীন মিশনে পড়ার সময় ঠিক উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে সেক্রেটারি স্যার অর্থাৎ এম নুরুল ইসলাম ছাত্রদের নিয়ে একটা উৎসাহব্যাঞ্জক বক্তব্য রেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'ডাক্তারিতে চান্স পেলে অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা পাবে।' রাজ্য আর রাজকন্যা পেয়েছেন কি না জানতে চাওয়ায় আলি জানালেন, 'অনেক বেশি পেয়েছি।' এমডি শেষ করে চণ্ডীগড় থেকে স্যারকে ফোন করে আলি জানতে চেয়েছিলেন, 'রাজ্য, রাজকন্যা কোথায়?' স্যার বলেছিলেন, 'সব পাবে, এবার ডিএম করো।' ওই বছরই উচ্চবিত্ত বনেদি পরিবারে বিয়ে করে রাজ্য ও রাজকন্যা হস্তগত করেন। সেই রাজকন্যাই তাঁকে প্রায় জোর করে ডিএম করতে পাঠান। মহাম্মদ আলি ডিএম করেছেন পেড্রিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার নিয়ে, যা ভারতের মধ্যে একমাত্র পিজিআই, চণ্ডীগড়েই পড়ানো হয়। একটিমাত্র সিট ছিল, সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়ে ওই সুযোগ অর্জন করেন আলি। গোটা ভারতে ওই বিষয়ে আলিকে নিয়ে মাত্র ছ-জন চিকিৎসক ডিএম করেছেন ২০১৫ সাল পর্যন্ত। ২০১৫ সালে আলি ডিএম শেষ করে চাকরি নিয়েছেন দুর্গাপুর মিশন হাসপাতালে। আলি কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন বা ভবিষ্যতে করবেন, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। শুধু আর্থিক সাফল্য অর্জন করা কোনো মানুষেরই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। আলিও এমন স্বপ্ন দেখেন না। স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যতে তাঁর ধাত্রীভূমি মুর্শিদাবাদে শিশুদের একটি হাসপাতাল করার, যেখানে কম খরচে ভালো চিকিৎসা পরিষেবা পাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। আলি কি সেটা পারবেন? যিনি 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগের এই লেখাটির জন্য ভোর চারটেয় উঠে দুর্গাপুর থেকে এসে সময়মতো পৌঁছোন, দু-ঘণ্টার পরিবর্তে প্রায় ঘণ্টা চারেক সময় দেন এবং কথা বলার ফাঁকে জানান, তেমন তাড়া ছিল না, একজন পরিচিতর বাচ্চা ভর্তি আছে, তাকে ঠিকঠাক কেয়ার নেওয়া দরকার না হলে খারাপ ভাবতে পারেন, তাঁর সময়জ্ঞান আর দায়বদ্ধতাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, তিনি পারবেন। ভবিষ্যতে তিনি চিকিৎসাজগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠবেন আশা করাই যায়। মহাম্মদ আলির সঙ্গে কথা বলতে বলতে, তাঁর লড়াইয়ের কথা শুনতে শুনতে এক সময় চোখের কোনা চিকচিক করে উঠেছিল। আর কথা যখন শেষ করলাম, পড়ে রইল একরাশ মুগ্ধতা, আর কিছু নয়। মহাম্মদ আলির জীবন শুধু আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে যায়— লড়াই জারি রাখো, জীবন তোমায় কোথায় নিয়ে যাবে তুমি নিজেও জান না। সত্যিই জান না। ■

মহাম্মদ আলি ডিএম করেছেন পেড্রিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার নিয়ে, যা ভারতের মধ্যে একমাত্র পিজিআই, চণ্ডীগড়েই পড়ানো হয়। একটিমাত্র সিট ছিল, সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ওই সুযোগ অর্জন করেন আলি। গোটা ভারতে ওই বিষয়ে আলিকে নিয়ে মাত্র ছ-জন চিকিৎসক ডিএম করেছেন ২০১৫ সাল পর্যন্ত।

নিজেকে শিক্ষকতার পেশায় দেখতে পছন্দ করতেন আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্থান ছিল শিক্ষাঙ্গন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অজস্র শিক্ষাঙ্গনে ঘুরেছেন তিনি। মিশেছেন লাখো ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে। মন দিয়ে শুনেছেন তাদের কথা। সাধ্যমতো উত্তর দিয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিটি প্রশ্নের। এখানে সেই প্রশ্নোত্তরের নির্বাচিত অংশ। সংকলন ও অনুবাদ করেছেন একরামূল হক শেখ

চিরন্তন অনুপ্রেরণা আবদুল কালাম

ছোটোবেলায় আমাদের পড়াশোনায় ছড়া পড়ার এক ধরনের আলাদা মজা ছিল। বাড়ি ও স্কুলে আমরা জোরে জোরে ছড়া আবৃত্তি করতাম। আজকাল বাচ্চাদের ছড়া পড়ার সেই প্রবণতা অনেকটাই কমে গেছে। শৈশবের সেইসব ছড়ার বেশিরভাগই আজ বিস্মৃত। তারই মাঝে শিশুসাহিত্যিক ও কবি সুনির্মল বসুর (১৯০২—১৯৫৭) 'সবার আমি ছাত্র' একটু আলাদা। 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র/নানানভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র' আজও আমাদের চেতনার জগতে অম্লান। বিশেষ করে এই ছত্র ক-টিতে জ্ঞানার্জনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর স্বরূপ যথার্থরূপে চিত্রিত। শিক্ষাদাতা ও শিক্ষাগ্রহীতা উভয়ই বিশ্বশিক্ষক মহানবি মহম্মদ (স.)-এরও খুবই প্রিয় ছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর এক চিরস্মরণীয় বাণী— 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ব্যতীত কেউ আমার আপন নয়।'

বছর তিনেক আগে শিক্ষা বিষয়ক এক আলোচনাসভায় বিশিষ্ট শিক্ষক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. সৌভিক ভট্টাচার্যের ভাবনাচিন্তা শুনে মুগ্ধ হই। তিনি যাদবপুর, সিনসিনাটি ও টেক্সাসের এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যথাক্রমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝের পনেরো মাস বাদ দিলে, ১৯৯১ সাল থেকেই তিনি দেশের প্রথম আইআইটি খড়্গপুরে শিক্ষকতা ও গবেষণায় মগ্ন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাপবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ভট্টাচার্য সম্প্রতি রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার পিলানি শহরস্থিত বিড়লা ইনসটিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সে উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। ওই সভায় তাঁর অভিমত ছিল, দেশের জাতীয় নেতাদের মধ্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধাশীল। তাঁর মতে স্বাধীন দেশে শিক্ষার পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও প্রসারে মৌলানা আজাদের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এবং দেশে বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণাও তাঁরই দূরদর্শিতার ফল।

একজন মৌলানা, যাঁর পড়াশোনার প্রায় পুরোটাই স্বগৃহে গৃহশিক্ষকের কাছে, শুধু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নয়, মক্তব-মাদ্রাসা-বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষাও প্রায় ছিল না তাঁর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-জগতের একজন বিশিষ্ট শিক্ষকের তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আমাদের অনেককেই বিস্মিত করে। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষাবিস্তারে শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের অবদান

সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নিতে পারি। মৌলানা মুহিউদ্দিন আহমেদ আবুল কালাম আজাদ (১১ নভেম্বর ১৮৮৮—২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮) ১৯৪৭ সাল থেকে আমৃত্যু দীর্ঘ এগারো বছর শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রথম থেকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও বাস্তববাদী। গ্রামীণ দরিদ্র, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষায় তিনি প্রথম থেকেই গুরুত্ব আরোপ করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে বয়স্ক সাক্ষরতা, বিনা ব্যয়ে চোদ্দো বছর পর্যন্ত বয়সের বালক-বালিকাদের পঠনপাঠন, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, মেয়েদের শিক্ষা, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বহুমুখী করার ওপর জোর দেন তিনি। তাঁর ভাবনায় ছিল প্রতিটি দেশবাসীর সার্বিক শিক্ষা। ১৯৪৮ সালের ১৬ জানুয়ারি সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা, 'আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে গেলে চলবে না যে, অন্তত বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক ভারতবাসীর এক জন্মসিদ্ধ অধিকার। এটি ছাড়া নাগরিক হিসেবে সে তার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।'

দেশে ব্রিটিশ প্রবর্তিত ও দেশীয় শিক্ষার হালহকিকত ও বর্তমান প্রয়োজন জানতে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন তিনি। ১৯৪৭ সালেই বিজ্ঞানী শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের (১৮৯৪—১৯৫৫) সভাপতিত্বে সায়েন্টিফিক ম্যানপাওয়ার কমিটি তিনি গঠন করেন । এই কমিটির উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দেশে কত মানুষের প্রয়োজন, তার অনুমান এবং তদনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। ফলস্বরূপ আজ আমাদের দেশ শুধু এ-ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরই নয়, ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি ও কর্মকুশলতার কারণে ভুবনময় সমাদৃতও। এ-বিষয়ে তাঁর অপর এক অক্ষয় কীর্তি উচ্চতর কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র আইআইটি স্থাপন। এ ছাড়া ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি), ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর), ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব সায়েন্স (আইআইএসসি)-এর ব্যাপ্তিসাধন এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক। শুধুই শিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষা নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সংগীতের উচ্চস্তরীয় প্রোতসাহনের উদ্দেশ্যে জাতীয় স্তরে সাহিত্য অকাদেমি, ললিতকলা অকাদেমি ও সংগীত-নাটক অকাদেমি এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (এনবিটি) প্রভৃতি তাঁর বহুজ্ঞতার সন্ধান দেয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নের 'বিশ্বভারতী'কে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেওয়া উপলক্ষ্যে ১৯৫১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর 'বিশ্বভারতী'র অনুষ্ঠানে তিনি কবিগুরুর জীবনাদর্শ ও শিক্ষাদর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর আগে ওই বছরেরই ১৮ অগাস্ট আমাদের রাজ্যের খড়্গপুরে দেশের প্রথম আইআইটি উদ্‌বোধন করেন স্বাধীন দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ। এই প্রতিষ্ঠানেই প্রায় সিকি শতক অধ্যাপনারত অধ্যাপক ভট্টাচার্য। আমাদের বিশ্বাস, জাতীয় শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চস্তরীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা গবেষণা পরিকাঠামোর পরিকল্পনা ও তার দেশব্যাপী সফল রূপায়ণের কারণেই শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল অধ্যাপক ভট্টাচার্য। দেশগঠন পর্বে ভারতরত্ন মৌলানা আজাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাসংস্কারের ফলেই ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা যে সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এটি অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য, অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বক্তৃতার দিনটি ছিল ১১ নভেম্বর অর্থাৎ 'জাতীয় শিক্ষা দিবস'। ভারত সরকার ২০০৭ সাল থেকে প্রতি বছর মৌলানা আজাদের জন্মদিন ১১ নভেম্বর 'জাতীয় শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষা সংক্রান্ত বিপ্লবে কালাম নামের আরও এক রূপকার আছেন, তবে তিনি আবুল কালাম নন, আবদুল কালাম। ভারতের ১১-তম রাষ্ট্রপতি আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালাম (১৫ অক্টোবর ১৯৩১—২৭ জুলাই ২০১৫)। শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের কার্যক্রম ও কৃতিত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য দুটি হল, সমগ্র ভারতবাসীর বুনিয়াদি শিক্ষা, শিক্ষায়তন ও শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে নিরন্তর চিন্তাভাবনা এবং জন্মভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ। এতদ্‌ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কালামের ছিল সৃষ্টিশীল ও বহু বিচিত্র শখ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাজগতের উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিত্ব হয়েও তিনি নিয়মিত কাব্যচর্চা করতেন। 'দ্য লাইফ ট্রি: পোয়েমস' নামে তাঁর একটি কবিতার সংকলনও আছে। ওই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত বাংলা অনুবাদে 'দৃষ্টি' নামক কবিতাতেও জ্ঞান আহরণ ও দেশবাসীর উন্নতির আকুল প্রার্থনা লক্ষণীয়:

আমার নিরন্তর আরোহণ
কোথায় গেল শিখর, হে প্রভু?
আমার অন্তহীন খনন,
কোথায় গেল জ্ঞান, প্রভু আমার?
আমার অবিরাম ভেসে চলা,
বিধাতা আমার, কোথায় আছে শান্তিদ্বীপ?
সর্বশক্তিমান, আমার জাতিকে দাও
অন্তর্দৃষ্টি আর শ্রমজাত আনন্দ অনাবিল।

তাঁর আরও একটি অভিনব কাজ ছিল, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রধানত ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণীর নানান প্রশ্নের আহ্বান এবং যথাসময়ে তার জবাব দেওয়া। নার্সারি থেকে প্রাইমারি, সরকারি অসরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজ, আইআইটি, আইআইএম-সহ দেশের সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের স্রোত ছিল বিরামহীন। জিজ্ঞাসাগুলির অধিকাংশই কৌতূহলোদ্দীপক ও বিষয়ানুগ হলেও বেশ কিছু অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নও আসত। এইসব অনুসন্ধান ছিল তরুণ সমাজের উদ্‌বেগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতিফলন। অজস্র প্রশ্নের উত্তরে শক্তিধর, সংঘবদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী ভারত গঠনই হল কালামের একমাত্র দিকনির্দেশনা। কালামের গবেষণালব্ধ ও সুচিন্তিত এইসব অভিপ্রায় দ্বারা কেবলই শিক্ষাক্রম ও জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশবাসী নয়, আমাদের বিশ্বাস, দেশের প্রত্যেক নাগরিকই অনুপ্রাণিত হবেন। ছয়টি বিভাগে বিন্যস্ত এই প্রশ্নোত্তর পর পর সংকলিত হল:

তাঁর আরও একটি অভিনব কাজ ছিল, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রধানত ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণীর নানান প্রশ্নের আহ্বান এবং যথাসময়ে তার জবাব দেওয়া।

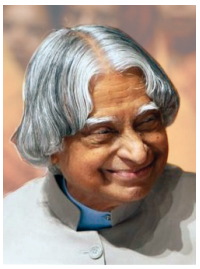

ভারতীয় স্পিরিট

যদি ৫৪ কোটি তরুণ এই তেজস্বিতায় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে যে, আমি এটা করতে পারি, আমরা এটা করতে পারি এবং ভারতবর্ষ এটা করতে পারে, তাহলে কোনো কিছুই আমাদের জন্মভূমির উন্নত দেশ হওয়ার পথ রুদ্ধ করতে পারবে না।

● সৈনিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী বা রাজনীতিবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশসেবক।

■ সবাই সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে দেশের সেবায় নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। একজন সৈন্য দেশের রক্ষায় নিযুক্ত থাকে এবং দিবারাত্র সজাগ থাকে, যাতে করে একশো কোটির বেশি দেশবাসী নিরুপদ্রবে দেশের উন্নয়নে কর্মঠ থাকতে পারে। একজন শিক্ষক আলোকিত নাগরিক ও ভবিষ্যতের দেশব্রতী সৃষ্টিতে থাকে নিয়োজিত। নিজের মগজাস্ত্রকে ব্যবহার করে মনুষ্যজাতির পীড়া অপসারণ— এটাই একজন চিকিৎসকের জীবনের মূল আদর্শ হওয়া উচিত। বিজ্ঞানীদের উচিত দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের নিয়মিত জোগান দেওয়া।

জাতীয় উন্নয়নের সর্বজনীন লক্ষ্যে সমস্ত বর্গের সব সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকর্মের একীভূত পথ নির্দেশনা করাই দেশব্রতী রাজনীতিবিদের কাজ। সর্বোপরি সবাইকে ভালো মানুষ হতে হবে।

● একদিকে ধনী ও গরিবের অসাম্য, অন্য দিকে এগিয়ে যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতার কারণে পিছিয়ে যাওয়ার ভয়। এরই মাঝে কার্যকরী পথ।

■ শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সমাজে চাকরিপ্রার্থীর পরিবর্তে কর্মসংস্থান উদ্ভাবনকারীর উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। বৃহদায়তন গ্রামীণ অকৃষি উদ্যোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা উচিত আমাদের। এর মাধ্যমে গ্রামীণ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এভাবেই এক কার্যকরী সমতা সৃষ্টির পথ সুগম হবে।

● একশো কোটিরও বেশি ভারতবাসীর অগ্রনেতা আপনি। আপনার অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিস্বার্থের আগে দেশের স্বার্থকে জায়গা দেওয়ার একমাত্র উপায়।

■ এটি এক সুন্দর প্রশ্ন। নেতৃত্বের গুণগত মানই নিজ ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে অনুপ্রাণিত করে। একজন জননায়ক, যিনি কর্মে নিজেকে বিলীন করেন এবং ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নেন ও সাফল্যের কৃতিত্ব নিজ অধীনস্থ গোষ্ঠীকে দেন, তাঁর পক্ষেই জনগণকে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব।

● ভারতের জ্ঞানের পাওয়ার হাউস হওয়ার এবং দেশ ও বিশ্বকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পদ্ধতি।

■ শিল্পনির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞান-অর্থনীতিতে ভারতকে অগ্রসর হতে হবে। সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে জনগণের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি তাদের মৌলিক চাহিদাও পূরণ করতে হবে। শিক্ষাপ্রণালী হবে সৃজনক্ষম (ক্রিয়েটিভ), মিথস্ক্রিয় (ইন্টারঅ্যাকটিভ), স্বশিখন (সেল্ফ লার্নিং) ও বিধি-বহির্ভূত (ইনফরম্যাল)। শুধুমাত্র পাঠ্য বইনির্ভর শিক্ষাদানের বদলে এর কেন্দ্রবিন্দু হবে মান, যোগ্যতা ও উৎকর্ষ। কর্মীরা নিছক দক্ষ বা কিছুটা দক্ষ হিসেবে বিভাজিত না হয়ে হবে টগবগে, নিপুণ, বুদ্ধিমান ও স্বক্ষমতায়নসম্পন্ন। কাজের ধরন সুসংগঠিত ও হার্ডওয়্যার-চালিত হওয়ার পরিবর্তে কম সংগঠিত ও সফটওয়্যার-চালিত হবে। পরিচালকবর্গ হবে অধিক প্রতিনিধিমূলক, কেবলই আদেশ-নিষেধমূলক নয়। বায়ুমণ্ডল ও বিভিন্ন শক্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয়ভাবে কম হবে।

● এখন থেকে একশো বছর পরের ভারত।

■ আমার মতে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বারা এটি নির্ধারিত হবে। প্রথমত, ওই সময় ভারতের থাকবে এক সুদক্ষ ও বিশাল শিক্ষা ব্যবস্থা, ঠিক যেভাবে এক হাজারেরও বেশি বছর আগে বিহারের নালন্দায় ছিল। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তরীয় গবেষণার সম্ভাবনা বিদেশিদের ভারতে আসতে আকৃষ্ট করবে। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তি ফুরিয়ে যাবে। ফলে পৃথিবীর কক্ষপথে বসানো বড়ো উপগ্রহ মাইক্রোওয়েভ সৌরবিদ্যুতের জোগান দেবে। তৃতীয়ত, মানবসমাজ মঙ্গল গ্রহে বসতি গড়ে তুলবে। হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেখানে বসবাসও করবে!

● তাজমহল, ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ ও অগ্নি-৩ মিসাইলের মধ্যে ভারতের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

■ তাজমহল শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ আর্থিক বৃদ্ধির সহায়ক। ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য অগ্নি-৩ দরকার। তুমি একটার জন্য অন্যকে পরিহার বা পরিবর্তন করতে পারবে না।

● বিশ্বে ভারতের সম্মানের সম্ভাবনা।

■ যতদিন না ভারত বিশ্বের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, ততদিন কেউ আমাদের সম্মান করবে না। এই জগতে ভয়ের কোনো স্থান নেই। কেবল শক্তিই সম্মান পায়।

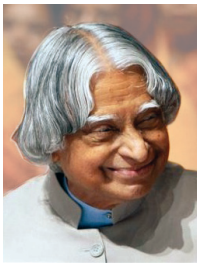

শিক্ষার স্পিরিট

সামাজিক ক্ষেত্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ দেশকে বদলে দিতে সক্ষম। পিতা, মাতা ও শিক্ষক।

● শিক্ষার অর্থ বই পড়া না বিদ্যালয়ে যাওয়া না জ্ঞান আহরণ।

■ শিক্ষার লক্ষ্য আলোকিত সমাজ সৃজন। আলোকিত সমাজের তিন উপাদান— প্রথম, মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষালাভ। দ্বিতীয়, ধর্মের আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তর। এবং তৃতীয়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বিদ্যালয় গমন যুবসম্প্রদায়কে জ্ঞাননির্ভর সমাজের অংশ হয়ে ক্ষমতায়ন করবে। এর দ্বারা নিজ উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় অগ্রগতিতেও তার অবদান থাকবে।

● ভালো শিক্ষার্থীর জন্য সময়ের পরিমাপ।

■ একজন ভালো শিক্ষার্থীর সৃষ্টি তখনই ঘটে, যখন সে তার শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় দুটো বিষয়ের যথোপযুক্ত যত্ন নেয়: জ্ঞান অর্জন এবং সৎ মূল্যবোধ অর্জন।

● পড়াশোনায় অমনোযোগী হওয়ার মতো নানান বিষয় চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। এসবকে পরাস্ত করে দায়িত্বশীল পড়ুয়া হওয়ার পথ।

■ বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়া জীবনেরই অনুষঙ্গ। একজন দায়িত্ববান পড়ুয়া হিসেবে তোমাকে তোমার শক্তি ও আগ্রহ চিহ্নিত করতে হবে। লক্ষ্য অর্জন করতে হলে কাজের মাঝে নিশ্চিতরূপেই বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু এই প্রতিকূল সমস্যা দ্বারা তুমি কোনোমতেই হারবে না। তোমার উচিত হবে পরাজিত মানসিকতাকে ঘায়েল করে, তোমার লক্ষ্যের শ্রেষ্ঠতা অর্জন। এভাবেই তুমি জীবনে জয়ী হতে পারবে।

● একদিকে দেশের লক্ষ সার্বিক সাক্ষরতার, অন্য দিকে দিনে দিনে শিক্ষা ব্যয়বহুল হচ্ছে। উভয়ের মধ্যেকার যৌক্তিক ভারসাম্যের উপায়।

একজন জননায়ক, যিনি কর্মে নিজেকে বিলীন করেন এবং ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নেন ও সাফল্যের কৃতিত্ব নিজ অধীনস্ত গোষ্ঠীকে দেন, তাঁর পক্ষেই জনগণকে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব।

■ দেশে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার খরচ মোটামুটি কম। এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি খুবই জরুরি। মান বৃদ্ধির জন্য কয়েক জন যোগ্য শিক্ষক পরিচালিত সাম্প্রতিক কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগ করতে হবে। টেলি-শিক্ষার মাধ্যমে এর প্রসার ঘটবে। এটি একটি প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ, যার ব্যয় সরকারি কোষাগার থেকে হওয়া উচিত। এ ছাড়া উচ্চশ্রেণির পড়ুয়ারা বিনা পয়সায় নীচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পড়াবে।

● একজন শিক্ষার্থীর দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার ও জীবনযুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

■ শিক্ষায়তনে একজন শিক্ষার্থীর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবকাশ থাকা জরুরি। যেমন— ক্রীড়ানৈপুণ্য, তর্ক-বিতর্ক, উদ্যোগী হওয়ার অনুশীলন, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিকাশ প্রভৃতি। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এইসব কার্যাবলির অবশ্যই সন্নিবেশ হওয়া প্রয়োজন।

● প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও বাস্তব জীবনের সম্পর্ক।

■ প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে বাস্তব জীবনের কার্যকরী সম্পর্ক থাকা উচিত। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের পাশাপাশি চলতে গেলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও ক্রমোন্নয়ন দরকার। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা ও অনুসন্ধান, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগী নেতৃত্ব, নৈতিক নেতৃত্ব প্রভৃতি বিষয়ে উপযোগী করে গড়া সম্ভব। জীবনযাত্রার বাস্তবতা মোকাবিলায় ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব সূক্ষ্মতা অর্জন জরুরি।

● বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী কেবলমাত্র রুটি-রুজির মাধ্যম না ভবিষ্যতের ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্বের উদ্ভবের পথ।

■ একজন ব্যক্তির পাঁচ রকম মনের বিকাশ ঘটাতে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, যথা— ডিসিপ্লিনারি বা নিয়মানুবর্তী মন, সিন্থেসাইসিং বা সমন্বয়ী মন, ক্রিয়েটিভ বা সৃজনশীল মন, রেসপেক্টফুল বা সম্ভ্রমসূচক মন ও এথিক্যাল বা নৈতিক মন। প্রথম তিনটি চিত্তের সম্পর্ক ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং শেষ দুটির সম্পর্ক কোনো গোষ্ঠী বা সমাজের সঙ্গে তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্বন্ধ। নৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টিতে উভয় রকমের সমন্বয়পূর্ণ মিশ্রণ দরকার। অন্য কথায়, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, শিক্ষার্থীর পাঁচ ধরনের মন সৃষ্টির। এর ফলে আমরা ভবিষ্যতের ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্ব পেতে পারি।

● প্রাথমিক শিক্ষা ও সৃজনশীলতার সম্পর্ক।

■ সৃজনশীলতাই ভবিষ্যতের সাফল্য আনে। আর প্রাথমিক শিক্ষাই সেই ক্ষেত্র, যেখানে শিক্ষকরা শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা রোপণ করতে পারেন।

● আদর্শ ছাত্রের বৈশিষ্ট্য।

■ আমার দৃষ্টিতে একজন আদর্শ ছাত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হল— সে ন্যায়নিষ্ঠ হবে। সে এই নীতি অনুসরণ করবে যে, হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার দিনগুলি যাতে নিরর্থকভাবে শেষ না হয়ে যায়। সে পড়াশোনায় উৎকর্ষ অর্জন করবে। সে তার পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হবে। তার লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সে নিজ কার্যকলাপে হবে ধৈর্যশীল। সে পিতামাতা, গুরুজন ও শিক্ষকদের প্রতি হবে শ্রদ্ধাশীল।

● কর্মসংস্থান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য আজকাল চলছে বেপরোয়া প্রতিযোগিতা। তবুও সাফল্যের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক কৌশলের গুরুত্ব।

■ পাঁচ থেকে সতেরো বছর বয়সিদের শিক্ষার সময় ছেলেমেয়ের চরিত্র গঠনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাল। এর বুনিয়াদ গড়বে পিতা-মাতা ও শিক্ষকগণ। ত্রিচির সেন্ট জোশেফ কলেজে আমার ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করি। আমাদের নীতিবিদ্যা (মর‍্যাল সায়েন্স)-র ক্লাস নিতেন জেসুইট যাজকতন্ত্রের অনুক্রমে সর্বোচ্চ স্থানে থাকা রেভারেন্ড ফাদার রেক্টর। মহান আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় অগ্রদূত, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং সর্বোপরি মহত্তম মানুষ নিয়ে প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টা ধরে তিনি আমাদের পড়াতেন। আমি নিশ্চিত ওই নীতিবিদ্যার ক্লাসে যা শিখেছি, আজও তার ওপর দাঁড়িয়ে আমি। বিদ্যালয় ও কলেজে সপ্তাহে কমপক্ষে একবার ওই কোর্সের শিক্ষাদান করা হত। এই শিক্ষা তরুণ মানসের উন্নতিসাধন হিসেবে পরিচিত। হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের মহাপুরুষের আলোচনা তরুণ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ধনাত্মক প্রভাব ফেলত। এ ছাড়াও কনফুসিয়াস (৫৫১ খ্রি.পূ.—৪৭৯ খ্রি.পূ.), বুদ্ধদেব (৫৬৩/৪৮০ খ্রি.পূ.—৪৮৩/৪০০ খ্রি.পূ.), সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪—৪৩০), খলিফা ওমর (৫৮৩—৬৪৪), মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯—১৯৪৮), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১), আইনস্টাইন (১৮৭৯—১৯৫৫), আব্রাহাম লিংকন (১৮০৯—১৮৬৫) প্রমুখ মনীষীর ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের সভ্যতা ও ঐতিহ্যের নৈতিক কাহিনি আলোচিত হত।

● আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলি।

■ যিনি ছেলেমেয়েদের স্নেহ করেন এবং পড়ানোর কাজকে উপভোগ করেন, তিনিই আদর্শ শিক্ষক। তিনি সাধারণ মানের পড়ুয়ার কৃতিত্বপূর্ণ উন্নতিতে সক্ষম। তিনি শিক্ষকতাকে এক মহান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন। তিনি একজন শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র শিক্ষাদান করছেন না, সঙ্গে-সঙ্গে একজন আলোকিত নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়তাও করছেন। এই শিক্ষার্থীই পরবর্তীতে দেশের প্রতি নিজ কর্তব্য পালনে, অনেকের মধ্যে এক হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত হবে।

● দিন প্রতিদিন ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের সুবিধা ক্রমবর্ধমান হওয়ার পরও ক্লাসরুম-শিক্ষার যৌক্তিকতা।

■ ক্লাসরুমের শিক্ষাক্রম দূরশিক্ষা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে না। উভয়ই একে অন্যের পরিপূরক। মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষায় একজন শিক্ষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সমৃদ্ধীকরণে দূরশিক্ষা (টেলি এডুকেশন) ব্যবহৃত হতে পারে।

● আপনার কল্পনায় ২০২০ সালের ভারতীয় শিক্ষা।

■ প্রাথমিক শিক্ষার ক্রিয়া-কেন্দ্র শিশুদের সৃজনশীলতা সচল রাখার ওপর হওয়া উচিত। মাধ্যমিক শিক্ষার উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা। এর দ্বারা তারা নিজেদের ক্ষুদ্র কর্মোদ্যোগ গড়ে তুলতে বা উচ্চশিক্ষা বা গবেষণায় যেতে পারবে। উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রগুলির আন্তর্জাতিক মানের উৎকর্ষকেন্দ্র ও শিল্পের অংশীদার হওয়া উচিত।

● ছাত্রের পরিচয়।

■ একজন ছাত্রের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তার প্রশ্ন করার ক্ষমতা। ছাত্রদের প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহ দাও।

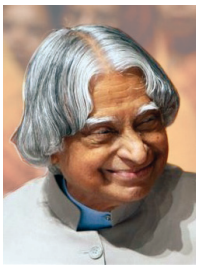

বৈজ্ঞানিক স্পিরিট

অনুসন্ধিৎসাই সৃজনশীলতার ভিত্তি। এর সঙ্গে জিজ্ঞাসু মন বৈজ্ঞানিক মেজাজ সৃষ্টির পথ সুগম করে।

● দুনিয়ার প্রথম বিজ্ঞানী।

■ কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা দ্বারাই বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও টিকে থাকা। বিজ্ঞানের পুরো ভিত্তিটাই প্রশ্ন করার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাবা-মা ও শিক্ষকগণ ভালো করেই জানেন যে, শিশুরাই বিরামহীন জিজ্ঞাসার মূল উৎস। অতএব, শিশুরাই প্রথম বিজ্ঞানী।

● সঠিক উপলব্ধির জন্য সবকিছুকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রয়োজনীয়তা।

■ এটাই একমাত্র সঠিক পদ্ধতি। কারণ, বিজ্ঞানই একমাত্র উপায়, যার দ্বারা মানবসমাজের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।

● খোদার সৃষ্টি এই সুন্দর পৃথিবী। কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস করবে এমন মারণাস্ত্রের আবিষ্কারের কারণ।

■ প্রতিনিয়ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চক্রাকারে সৃষ্টি ও ধ্বংসকাজে নিয়োজিত। মানবজাতিকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে, প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রকৃতিজগৎকে ধ্বংস না করে, কেবলই মানবসমাজের উন্নয়নে যেন ব্যবহৃত হয়।

● ভারতীয়দের মাঝে বৈজ্ঞানিক মেজাজ সৃষ্টির পন্থা।

■ বিজ্ঞানীদের হতে হবে নাগরিক বিজ্ঞানী (সিভিক সাইন্টিস্ট) এবং তাদের এটা সুনিশ্চিত করতে হবে, বিজ্ঞানের সুফল সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত যেন পৌঁছোয়। এই প্রক্রিয়া যদি অনবরত চলে এবং জনসাধারণ তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে বিজ্ঞানের সুফল পায়, বৈজ্ঞানিক মেজাজ অবশ্যই গড়ে উঠবে।

● বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার স্বরূপ।

■ বিজ্ঞান হল আমাদের চারপাশের ঘটমান বিষয় সম্পর্কে নিজ নিজ বুদ্ধি ব্যবহার করে উত্তর খুঁজে পাওয়া। ওইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের সহায়তায় বিকশিত পন্থাই প্রযুক্তিবিদ্যা।

● ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নতির পারস্পরিক সম্পর্ক।

■ অধিকাংশ ব্যক্তি, যাঁরা বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক। আইনস্টাইন (যিনি $E=mc^2$ আবিষ্কার করেছেন) যখনই ছায়াপথ (গ্যালাক্সি) ও নক্ষত্ররাজি পর্যবেক্ষণ করতেন, তিনিও মহাবিশ্ব ও তার স্রষ্টার চমৎকারিত্বে বিস্মিত হয়ে যেতেন। নোবেল বিজয়ী ড. সি ভি রমন (১৮৮৮—১৯৭০) আধ্যাত্মিকতায় অনুরক্ত ছিলেন। আধ্যাত্মিকতায় দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রসর হলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

● বেশ কিছু বিচ্যুতি-সহ বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ।

■ বিজ্ঞান বেকসুর। এটি অবশ্যই অভিশাপ নয়। আমরা বিজ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার করি, তার ওপরেই নির্ভর করছে বিজ্ঞান মঙ্গলময় না সর্বনাশী। যেমন, পারমাণবিক শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনে কিংবা পরমাণু বোমা সৃষ্টিতেও ব্যবহৃত হতে পারে। কৃষিতে সার ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যায়। আবার ওই একই রাসায়নিক ব্যবহার করে মারণাস্ত্রও তৈরি করা হয়। বিজ্ঞানের ওপর ভর দিয়ে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটে। সমাজের অগ্রনায়কগণ ঠিক করেন কীভাবে ওই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে।

● ভারতের দারিদ্র্য হ্রাস বা নির্মূল করতে বিজ্ঞানের উপযোগিতা।

■ দারিদ্র্য বাস্তবিকই আমাদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। এটাও বাস্তব— বিজ্ঞান দারিদ্র্য হ্রাস করতে আমাদের সহায়তা করছে। যেমন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বহু প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগ গড়তে সহায়ক হয়েছে। এবং রিমোর্ট সেন্সিং প্রযুক্তি দ্বারা কৃষকগণ বহুভাবে উপকৃত।

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করার অনুমতি ও সুযোগ আমাদের দিতে হবে। তাদের জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক বিজ্ঞানভিত্তিক উত্তরও ধৈর্য সহকারে দিতে হবে আমাদের। প্রশ্ন করার অভ্যাসকে নিষেধ করা উচিত নয়।

● ধর্ম না বিজ্ঞানের প্রতি অধিক ভরসা।

■ ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই জীবনের সত্য ও বাস্তবতায় আমাদের নিয়ে যায়। ধর্ম আধ্যাত্মিকতার জন্য এবং বিজ্ঞান পার্থিব উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উভয়ই জীবনের জন্য জরুরি।

● পড়ুয়াদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা বৃদ্ধির উপায়।

■ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করার অনুমতি ও সুযোগ আমাদের দিতে হবে। তাদের জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক বিজ্ঞানভিত্তিক উত্তরও ধৈর্য সহকারে দিতে হবে আমাদের। প্রশ্ন করার অভ্যাসকে নিষেধ করা উচিত নয়। অনুসন্ধিৎসাই সৃজনশীলতার ভিত্তি। এর সঙ্গে জিজ্ঞাসু মন বৈজ্ঞানিক প্রবণতা বৃদ্ধির সহায়ক।

● একজন বৈজ্ঞানিকের জীবিকার সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ।

■ যাঁরা বৈজ্ঞানিক কর্মজীবনে আগ্রহী বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে গবেষণা করেন, তাঁরা জীবনের সুখ ভোগ করবার জন্যে এতে প্রলুব্ধ হন না। তাঁরা এই জগতে তাঁদের নিজস্ব গভীর আসক্তি এবং বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেই আসেন।

● ভবিষ্যতের তরুণ প্রকৌশলীদের (ইঞ্জিনিয়ার) জন্য উপদেশাবলি।

■ তরুণ প্রকৌশলীগণকে জীবিকা শুরুর সময় নীচের প্রতিজ্ঞাগুলোর শপথ নিতে হবে:

১. ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমার জীবনভরের লক্ষ্য। আমি কঠোর পরিশ্রম করব এবং সফল হব।

২. আমি যেখানেই থাকি, আমি এই সংকল্প নিয়ে কাজ করব— কোনো পদ্ধতি বা পণ্য আমি প্রবর্তন, উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করতে পারি কি না।

৩. আমি সবসময় মনে রাখব, আমার হাওয়ায় ওড়া দিনগুলো যেন বৃথা

না চলে যায়।

৪. আমি উপলব্ধি করি, আমার একটি প্রযুক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। উচ্চ সংকল্প ও অধ্যবসায়ী কঠোর পরিশ্রম ওই লক্ষ্যে আমাকে পৌঁছোবে।

৫. আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু মহান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদগণ, যোগ্য শিক্ষক ও উপযোগী বইপত্র।

৬. আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোনো সমস্যাই আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। ওই সমস্যাকে পরাজিত করে আমি বিজয়ী অধিনায়ক হব।

৭. আমি জগতের জল, শক্তি, আবাসস্থল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ প্রভৃতি নানান সমস্যা থেকে দেশ ও সমাজকে মুক্ত রাখতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে সচেষ্ট থাকব।

৮. দেশের জাতীয় পতাকা আমার হৃদয়ে থাকবে উড্ডীয়মান। আমি আমার মাতৃভূমির জন্য সাফল্য আনব।

● একজন বিজ্ঞানী সৃষ্টির উপায়।

■ তিরিশ শতাংশ মনীষা আর সত্তর শতাংশ কঠিন পরিশ্রমের সংমিশ্রণের ফল।

তারুণ্যের স্পিরিট

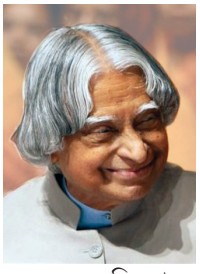

সততার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন এবং শুদ্ধতার সঙ্গে সফলতা অর্জন— এটাই তোমাদের জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সমাজ উন্নয়নের এটিই একমাত্র পথ।

● ছেলেমেয়েদের প্রতি আপনার বিশেষ অনুরাগের কারণ।

■ তরুণদের স্বপ্ন ও জিজ্ঞাসু মন আছে। তোমাদের মহত্ত্ব, অনুসন্ধিৎসা, অঙ্গীকার, আন্তরিকতা ও উদ্‌বেগ দেশকে মহান করবে। এভাবে তুমি নিজেও মহৎ হতে পারো।

● এখনকার এবং আপনার সময়ের ছেলেমেয়ের তুলনা।

■ এখনকার বাচ্চারা খুবই জিজ্ঞাসু এবং তারা দ্রুত ফল প্রত্যাশা করে। তাদের গৌরবাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল।

● তরুণদের দেশপ্রেম ও সেবা মনোভাব জাগানোর পদ্ধতি।

■ এটা তরুণদের সমস্যা নয়, এটা পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের সমস্যা। কিশোর ও তরুণ সম্প্রদায় অবশ্যই দেশপ্রেমী, কিন্তু পিতা-মাতা ও বয়স্কদের দেশের প্রতি মনোভাবে পরিবর্তন আনতে হবে। বাবা-মা যদি দেশপ্রেমী হন, তাঁদের কঠোর পরিশ্রম দ্বারা আমাদের দেশীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের অনুসরণ করবে।

● বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলে, একদিকে বাবা-মা ও শিক্ষকের চাপ, সিলেবাসের বোঝা, টেনশন এবং অন্যদিকে সমাজের হীন মানসিকতা। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় বিজ্ঞান-কীর্তির সম্ভাবনা কতটুকু।

■ অন্যান্যদের মতামতকে পাত্তা না দিয়ে, যে-বিষয় ও কর্মের প্রতি তোমার স্বাভাবিক প্রবণতা ও অনুরাগ, তাতেই তোমাকে মনস্থির করতে হবে। এভাবেই সর্বোত্তম সফল ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

● তরুণ সমাজের প্রতি অনুপ্রেরণাদায়ক উপদেশাবলি।

■ দেশের তরুণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমার একটি বিশেষ বার্তা আছে। প্রত্যেক যুবকের অদম্য তেজ থাকা উচিত। অদম্য তেজ বা উদ্দীপনার দুটি উপাদান থাকে। প্রথমত, তোমাদের একটি লক্ষ্য থাকা উচিত এবং ওই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করো। দ্বিতীয়ত, কাজ করার সময় তোমরা নিশ্চিতরূপেই কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবে। এই অবস্থায় সমস্যা যেন তোমার শাসক না হয়ে যায়। পরিবর্তে তুমি সমস্যার মালিক হও, তাদের পরাস্ত করো এবং বিজয়ী হও। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে তরুণ জনসংখ্যার এক বড়ো সম্পদের ভাণ্ডার আছে। এইসব তরুণের প্রজ্বলিত চেতনা, অন্যান্য সম্পদের তুলনায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অদম্য তেজস্বিতার ওপর ভর করে যখন তরুণদের প্রজ্বলিত মেধা যেকোনো কাজ সম্পন্ন করে তখনই এক সমৃদ্ধ, সুখী ও নিরাপদ ভারত বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

কাজ করার সময় তোমরা নিশ্চিতরূপেই কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবে। এই অবস্থায় সমস্যা যেন তোমার শাসক না হয়ে যায়। পরিবর্তে তুমি সমস্যার মালিক হও, তাদের পরাস্ত করো এবং বিজয়ী হও।

● আমি এগারো বছরের এক বালিকা। দেশের সমস্যা সমাধানে আমার অবদান।

■ তোমার প্রথম কাজ ভালোভাবে পড়াশোনা এবং লেখাপড়ায় উৎকর্ষ অর্জন। ছুটির সময় তোমার যদি সময় থাকে, তুমি নিরক্ষর দু-জনকে পড়াতে পারো। তোমার আশেপাশে বা বিদ্যালয়ে দুটো চারাগাছ লাগানো ও তার দেখভাল করতে পারো তুমি। তুমি জল ও বিদ্যুৎশক্তির অপচয় রোধ করার প্রচেষ্টা চালাতে পারো। তোমাদের বাড়ির আশপাশ ও সন্নিহিত এলাকা দূষণমুক্ত ও সবুজ রাখতে তুমি তোমার পরিবারের সদস্যদের সহায়তা করতে পারো।

● পূর্বপুরুষ, পারিবারিক, দেশের নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষকদের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধের মধ্যে আমাদের জন্য অনুসৃত মূল্যবোধ।

■ এরকম কিছু নেই যে, মূল্যবোধ কেবলমাত্র চার রকমের। মূল্যবোধ হল বিশ্বজনীন এবং সকলের জন্য তার রূপ একই। ন্যায়পরায়ণতা, নিঃস্বার্থতা, দেওয়ার মনোভাব, স্বচ্ছতা, সবার সঙ্গে একইরকম ব্যবহার করা প্রভৃতি মূল্যবোধগুলির অনুশীলন ও অনুসরণ করা উচিত আমাদের।

● বাচ্চা ও তরুণদের সঙ্গে আপনার একাত্মতার রহস্য।

■ উভয়েই সৃজনশীল উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন। এরা নিয়তই প্রশ্ন করে। এরাই দেশের ভবিষ্যৎ।

● বর্তমান প্রজন্মের তরুণ পেশাদার গোষ্ঠী নিয়ে আপনার মত।

■ আমি গত সাত বছরে পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি ছাত্র-যুবার সঙ্গে মিলিত হয়েছি এবং প্রতিদিন বহু ই-মেলও পেয়েছি। তারা সবাই প্রাণচাঞ্চল্যে উচ্ছল। আমাদের উচিত শিক্ষা ও মূল্যবোধের মাধ্যমে তাদের সক্রিয় ও ক্ষমতায়ন করা।

● শিক্ষার্থী ও যুবসম্প্রদায়ের জন্য আপনার বিশেষ বার্তা।

■ তাদের প্রতি আমার বার্তা হল, তাদের মধ্যে অন্যভাবে চিন্তা করার সাহস থাকা জরুরি, উদ্ভাবনের শক্তি, অজানা পথে চলার মতো আবিষ্কারের উৎসাহ এবং সমস্যাকে জয় করে সাফল্য লাভের ক্ষমতা। এই গুণগুলিকে বাড়িয়ে তুলতেই তাদের পরিশ্রমী হতে হবে।

সাফল্যের স্পিরিট

সাফল্য তখনই সম্ভব, যখন আমরা কাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হই। 'স্বপ্ন বোনা-চিন্তা করা-কর্মনিষ্ঠ হওয়া' এই দর্শন আমি প্রত্যেক ভারতীয়র মনের ভেতর গেঁথে দিতে চাই।

● নিজের লক্ষ্য পূরণ করা না অন্যের প্রত্যাশা কার্যকর করা উচিত।

■ নিজের স্বপ্নই একজনের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। একজনের যা পছন্দ, সেটাই তার করা উচিত।

● আদর্শ মানুষ হওয়ার রাস্তা।

■ ভালো বই, আদর্শ শিক্ষক, সৎ মানুষজন এবং ভালো বন্ধুদের সাহচর্যে আদর্শ মানুষ হওয়া সম্ভব।

● নিয়মানুবর্তী হওয়া, পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া, সৎ হওয়া, কঠোর পরিশ্রম করা— এসবের মধ্যে একজন কিশোরের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

■ একজন কিশোরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হল নিজের কাছে সৎ এবং অন্যদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। এটাই তোমাকে আলোকিত নাগরিক হতে সহায়তা করবে।

● আপনার সাফল্যের রহস্য।

■ স্বপ্ন, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। তোমার জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত। কঠোর পরিশ্রম দিয়ে তা অর্জন করো। কাজ করতে গেলে নিশ্চিতরূপেই তোমার সঙ্গে কিছু সমস্যার সাক্ষাৎ ঘটবে। সাহসী হয়ে সমস্যার মোকাবিলা করে তা অতিক্রম করতে হবে। খোদা যদি আমাদের সহায় হন, আমাদের বিরুদ্ধে কে থাকতে পারে?

● জীবনের লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্য অর্জনের সমস্যা।

■ লক্ষ্যের প্রতি তোমার অবিচল একমুখী শ্রদ্ধাই তোমাকে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে। আমি কখনওই হাল ছাড়ব না এবং সমস্যা যেন আমাদের হারিয়ে না দেয়।

● মন দিয়ে কাজ করা।

■ যারা আন্তরিকভাবে কাজ করে না, তারা যা অর্জন করে, তা শূন্য বই কিছু নয়। উৎসাহহীন কাজ চারপাশে কেবল তিক্ততাই সৃষ্টি করে।

● ভাগ্যের সহায়তা না কঠোর পরিশ্রম জরুরি।

■ প্রথমেই প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম। কঠোর পরিশ্রমে অটল থাকলে নসিবের আনুকূল্য তুমি পাবে। এ-সম্বন্ধে বিখ্যাত বাণী হল— খোদা তাদেরই সহায়তা করেন, যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করে।

● স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ। ব্যর্থতার ভীতি থেকে মুক্তির উপায়। আত্মবিশ্বাসী হওয়ার নিয়ম।

■ জ্ঞানের আহরণ তোমাকে আত্মবিশ্বাসী হতে সহায়তা করবে। ব্যর্থতা নিয়ে আমাদের শঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। ব্যর্থতা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে এবং পরবর্তী ব্যর্থতা থেকে মুক্তি পেতে এই শিক্ষা প্রয়োগ করতে হবে। এভাবেই তুমি সাফল্য পাবে। নিজস্ব করণীয় কাজে তোমার মনোনিবেশ ঘটলে অলসতা থেকে বাঁচা যায়।

● শুনেছি বিজ্ঞানীদের মেধাবী মস্তিষ্ক থাকে। আমাদের বুদ্ধিমান মগজ গড়ার উপায়।

■ অনুসন্ধিৎসু হও, নিরন্তর প্রশ্ন করো এবং সঙ্গে-সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম চাই। এর পরের সবকিছুই আপনা-আপনি ঘটতে থাকবে।

● টাইম ম্যানেজমেন্ট (সময় ব্যবস্থাপনা)।

■ তোমরা সবাই জান পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় বা চোদ্দোশো চল্লিশ মিনিটে বা ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ডে অর্থাৎ একদিনে নিজ অক্ষ বরাবর একবার আবর্তিত হয়। আবার সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘুরতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর এক আবর্তনের শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তোমার বয়সের এক বছর বেড়ে যায়। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন ও বছর এভাবেই চলে যায়। এদের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। একটিমাত্র কাজ আমরা করতে পারি, সময়ের এগিয়ে চলার সঙ্গে-সঙ্গে সময়ের সদ্ব্যবহার ও পরিচালনা করা। মনে রেখো, হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো দিনগুলি যেন বিফলে না যায়।

সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর এক আবর্তনের শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তোমার বয়সের এক বছর বেড়ে যায়। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন ও বছর এভাবেই চলে যায়। এদের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। একটিমাত্র কাজ আমরা করতে পারি, সময়ের এগিয়ে চলার সঙ্গে-সঙ্গে সময়ের সদ্ব্যবহার ও পরিচালনা করা।

● তকদির না নিজের কর্মপ্রচেষ্টা।

■ তুমি এখন যা, তা তোমার তকদির। তুমি আজকে যা করছ, আগামীকাল সেটাই তোমার কর্মফল দ্বারা নির্ধারিত হবে।

● স্বপ্ন দেখা না পরিকল্পনা করা।

■ স্বপ্নের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প ও অভীষ্ট লক্ষ্য থাকলে সেই স্বপ্নের দ্বারা সফলতা আসে। জীবনের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। পরিকল্পনা হল এমন এক কৌশল, যা আমাদের সক্ষম করে প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবনের লক্ষ্য অর্জনে।

● আপনি একবার বলেছিলেন, জীবন হল অমীমাংসিত সমস্যা, অনিশ্চিত বিজয় ও নিরাকার পরাজয়ের সংমিশ্রণ। এ-ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়।

■ জীবনে কোনো সময় নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়। যে-পরিস্থিতিতেই সমস্যা আসুক না কেন, তোমাকে তার চালক হয়ে সেটাকে পরাস্ত করে বিজয়ী হতে হবে।

● যোগ্য জননায়ক হওয়ার পথ।

■ একজন যোগ্য অগ্রনেতা হতে গেলে, তোমার মধ্যে যে-গুণাবলির অনুশীলন করতে হবে, তা হল— অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীলতা, একাগ্রতা, সচ্চরিত্র, সাহসিকতা, অনন্য সাধারণ প্রতিভা, কাণ্ডজ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও প্রত্যয়।

● জ্ঞানার্জন জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, কিন্তু কর্মজীবনেও তা চালিয়ে যাওয়ার কৌশল।

■ হ্যাঁ, জ্ঞানার্জন এক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। যখন

তুমি তোমার জীবিকার সূচনা কর, তোমার সঙ্গে এক নতুন পরিস্থিতির পরিচয় ঘটে। প্রচলিত পথে না গিয়ে চেষ্টা করো, সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতির উদ্ভাবন দ্বারা ওই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার। এতে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সৃজন ঘটবে। জ্ঞানের স্বোপার্জনের এই পদ্ধতি তোমাকে জীবনভর জ্ঞানার্জনে উদ্‌বুদ্ধ করবে।

● জীবনের অসংখ্য সমস্যা মোকাবিলায়, আপনার অধিক ক্ষমতা অর্জনের রহস্য।

■ ক্ষমতা বিকশিত হয় জ্ঞানের স্বোপার্জন এবং যেকোনো সম্ভাব্য পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকার ওপর।

● বাধা ও ব্যর্থতা সামলানোর উপায়।

■ যখন আমরা প্রতিবন্ধকতা সামলাই, তখনই আমরা বুঝি, আমাদের সুপ্ত শক্তি ও সাহসের কথা। আমরা আগে যা জানতাম না। এবং যখনই আমরা ব্যর্থতার মুখোমুখি হই, তখনই বুঝতে পারি, এই সম্পদগুলি আমাদের মধ্যে চিরকালই ছিল। আমাদের কাজ শুধু সেগুলোকে খুঁজে নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলা।

● মহৎ মনীষীর নানা কথা শোনা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার বিষয়। কিন্তু সাধারণ মানুষেরা তাঁদের নাগাল পায় না। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায়।

■ মহৎ মনীষীর লেখা বইপত্র বা অন্তর্জাল (ইন্টারনেট) থেকে তাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারো। এ ছাড়া তোমরা তোমাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করেও অনেক কিছুই জানতে পারো।

● আপনার সবকিছুতেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলনের কারণ।

■ সফলতার এটিই একমাত্র পথ।

● একজন আদর্শ মানুষ আপনি। আমরাও ভালো মানুষ হতে চাই। আপনার মতে আমাদের করণীয়।

■ কঠোর পরিশ্রম ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মেজাজের মিলিত রূপই তোমাকে ভালো মানুষ হতে সাহায্য করবে।

● বর্তমানে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রটি মেধাবী ছাত্রদের দখলে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মেধার ছাত্রদের জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ কতটুকু।

■ প্রথমে তোমার মন থেকে এটা অবশ্যই ঝেড়ে ফেলে দাও যে, তুমি একজন সাধারণ মানের শিক্ষার্থী। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট অনন্য শক্তি আছে। অনুগ্রহ করে ওই শক্তিকে স্বীকার করো, মনযোগী হও এবং কঠোর পরিশ্রম করো। আমি নিশ্চিত তুমি সফল হবে এবং তোমার পছন্দসই ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুমি অন্যকে টক্কর দিতে পারবে।

কালাম স্পিরিট

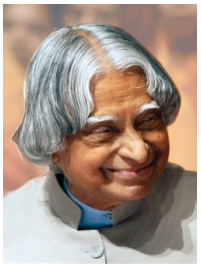

মানুষের চিন্তাশক্তি এক অনন্য উপহার। আমাদের জীবনযাত্রায় উত্থান ও পতন যাই ঘটুক না কেন, চিন্তাশক্তিই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হওয়া উচিত। চিন্তাশক্তিই অগ্রগতি। চিন্তা থেকেই আসে কর্মশক্তি। কর্মহীন জ্ঞান অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। জ্ঞান ও কর্মের যোগফলই সৃজনশীলতা সৃষ্টি করে এবং সমৃদ্ধি আনে।

● এখন আপনি ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং আগে ছিলেন ডিআরডিও (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন)-এর বিজ্ঞানী। অভিজ্ঞতার মিল ও অমিল।

■ উভয় পদেই কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। সে-অর্থে উভয় ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় কোনো পার্থক্য নেই।

● বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, যেখানে মানবজাতির এক ষষ্ঠাংশ মানুষের বসবাস, তার রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে আপনার অনুভূতি।

■ আমার বেশ ভালোই লেগেছে। দায়িত্ব ও কর্তব্য আমার একসঙ্গেই চলেছে।

● সমতারক্ষা, উদ্‌বেগহীনতা, আশাবাদ প্রভৃতি আপনার জীবনে খুবই সুস্পষ্ট। আমাদের জন্য এগুলি অর্জনের প্রক্রিয়া।

■ আমি নিজের করণীয় একটা বা অনেক কাজে নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখি।

● মানুষের স্মৃতিতে আপনি থাকতে আগ্রহী— রাষ্ট্রপতি হিসেবে না বিজ্ঞানী হিসেবে।

■ একজন ভালো মানুষ হিসেবে।

● দ্বিতীয় বার সুযোগ পেলে আপনি রাষ্ট্রপতি না বীণাবাদক হতে আগ্রহী।

■ দ্বিতীয় বার যদি সুযোগ পাই, তবুও আমি একজন শিক্ষক হতে আগ্রহী। রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে আমি একজন শিক্ষক ছিলাম এবং মেয়াদ শেষ হলে আমি আবার শিক্ষকতায় ফিরে যেতে চাই।

● ছোটোবেলায় আপনার চিন্তায় ছিল কি আপনি একদিন এত উঁচু পদে অধিষ্ঠিত হবেন।

■ একেবারেই না। একাধিক কাজের কর্মদক্ষতায় সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে। এবং অবশ্যই করেছি কঠোর পরিশ্রম, কঠোর পরিশ্রম, কঠোর পরিশ্রম।

● ভারতরত্ন পেয়ে আপনার অনুভূতি। আমিও পেতে আগ্রহী। আমার করণীয়।

■ আমার জীবনের বহু ঘটনার মাঝে ভারতরত্ন সম্মান পাওয়া আরও একটি ঘটনামাত্র। ভারতরত্ন নিয়ে তুমি বিচলিত হয়ো না। যে-কাজ তুমি করছ, তা মনপ্রাণ দিয়ে করো, পরিশ্রম করতে থাকো, দাতা হও, যতটা সম্ভব অন্যের সেবা করো। এতেই তুমি আনন্দ পাবে এবং সফল মানুষ হবে।

● খোদার কাছে আপনার বিশেষ অনুরোধ।

■ আমি সর্বশক্তিমান খোদার কাছে প্রার্থনা করব, আমার দেশকে কঠোর পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান মানুষ দিয়ে ভরিয়ে দিতে। কারণ, এরাই আমাদের জন্মভূমিকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে নিয়ে যাবে।

● উৎকর্ষের সংজ্ঞা।

■ উৎকর্ষ কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

● বিদ্যালয়ে আপনার প্রিয় বিষয় ও তার কারণ।

■ বিজ্ঞান আমার প্রিয় বিষয় ছিল। এটির সাহায্যে আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছি, প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট ঘটমান বিষয় কীভাবে ঘটছে।

● আপনার গড়ে ওঠার পেছনে কাদের প্রভাব সর্বাধিক। যাঁরা আপনাকে নিয়মানুবর্তিতা শিখিয়েছেন, না যাঁরা আপনাকে বিভিন্ন বিষয় পড়িয়েছেন।

■ আমি আমার শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে প্রতিনিয়ত স্মরণ করি। আমার বাবা আমার প্রথম শিক্ষক, যিনি আমাকে নিয়মানুবর্তিতা ও জীবনের মূল্যবোধ শিখিয়েছেন। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীশিবা সুব্রহ্মণ্য আয়ার আমাকে বিমানচালনাবিদ্যা পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই প্রথম আমাকে প্রভাবিত ও জীবন গড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

● আপনার সহজ সরল জীবনযাপনের রহস্য, যদিও আপনি রাষ্ট্রপতি।

■ আমার চাহিদা খুবই অল্প।

● জীবন থেকে আপনার শিক্ষণীয় বিষয়।

■ জীবন এক চলমান স্রোতধারা। প্রতিটি দিনই অনন্য এবং প্রত্যেক কর্মেরই নিজস্ব চ্যালেঞ্জ আছে। আমাদের উচিত নিজ নিজ কাজকে ভালোবাসা এবং এর প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করা।

● আপনার জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় ও বেদনাদায়ক মুহূর্ত।

■ হালকা এফআরও (ফ্লোর রিঅ্যাকশন অর্থোসিস)* পরে পোলিয়ো-আক্রান্ত শিশুদের আনন্দোচ্ছ্বাস, লাফালাফি ও দৌড়াদৌড়ি আমাকে চরম আনন্দিত করেছিল। একশো তিন ও তিরানব্বই বছরে, যদিও পরিণত বয়সে, তিন মাসের ব্যবধানে আমার বাবা-মায়ের মৃত্যু আমার দুঃখতম সময়।

● একজন মানুষের সবচেয়ে উত্তম কাজগুলি।

■ ক্ষুধার্থকে খাদ্যদান, আর্তের সেবা, দুঃখীর কষ্ট লাঘব, আহতের শুশ্রূষা ও মানুষের হৃদয়ে আনন্দসঞ্চার, এগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম।

● নতুন কোনো প্রকল্প শুরু করার সময় আপনি কোনো পরামর্শ নিতেন, না নিজেই সেটা করতেন।

■ অভিজ্ঞতা এক বড়ো ভাণ্ডার। তোমার উচিত ওই ভাণ্ডার থেকে নিয়মিত গ্রহণ করা।

● নীল জামা পরার কারণ।

■ আশমানের রং নীল। আমি আকাশ ও আকাশের বিস্ময়কে ভালোবাসি।

● স্বপ্ন না পরিশ্রম অথবা স্বপ্ন ও পরিশ্রম।

■ আকশের দিকে তাকাও। আমরা একা নই। সমগ্র মহাবিশ্বই আমাদের বন্ধু। শ্রেষ্ঠ জিনিসটি তারাই পারে, যারা স্বপ্ন দেখার সঙ্গে-সঙ্গে পরিশ্রমও করে।

● জীবন মানে।

■ জীবন বড়ো জটিল বিষয়। মানুষ হয়ে ওঠার তোমার জন্মগত অধিকারের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই তুমি জীবনকে জয় করতে পারো।

● আপনার অদ্ভুত হেয়ার স্টাইলের কারণ।

■ চুল বড়ো হয়, তাই!

● আপনার প্রতি খোদার উপহার বা সৌভাগ্য, যার জন্য আপনার মুখমণ্ডলে ঔজ্জ্বল্য এবং আপনার কাজে তার ঝলক দেখা যায়।

■ আমার জন্য বিশেষ উপহার আমার বাবা-মা। তাঁরা আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হওয়ায়, আমি তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হই। এটাই আমার জন্য খোদার উপহার ও আশীর্বাদ।

● প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে থাকে এক মহিলা। কিন্তু আপনি তো অবিবাহিত। আপনার সফলতার রহস্য।

প্রতিটি দিনই অনন্য এবং প্রত্যেক কর্মেরই নিজস্ব চ্যালেঞ্জ আছে। আমাদের উচিত নিজ নিজ কাজকে ভালোবাসা এবং এর প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করা।

■ আমি যেহেতু যৌথ পরিবার থেকে এসেছি, আমার সাফল্যের অংশীদার আমার বাবা-মা, ভাই, বোন-সহ আমার গোটা পরিবার, শিক্ষাগুরু এবং ভারতের সমস্ত নাগরিক।

● আপনার স্কুলজীবনের দুষ্টুমির কথা।

■ আমাদের প্রধান শিক্ষক একদিন ভূগোল পড়াচ্ছিলেন। ক্লাস চলাকালীন সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমরা কয়েক জন খুব মনোযোগী নই। তিনি বললেন, আমাদের চলন্ত ট্রেনে চড়া উচিত। আমি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলাম, চলন্ত ট্রেনে উঠার চেষ্টা করলে আমরা পড়ে যাব এবং আহত হব। এ-কথা শুনে তিনি আমাকে সজোরে বেত্রাঘাত করেছিলেন! প্রকৃতপক্ষে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর পড়াবার সময় পড়াশোনার প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত। কিন্তু আমি তা না ভেবে শারীরিকভাবে চলন্ত ট্রেনে উঠতে হবে বলে ভেবেছি!

● আপনার সবচেয়ে পছন্দের কাজ।

■ ছোটোদের সঙ্গে কথা বলা ও আলোচনা করা এবং তাদের স্বপ্ন উপলব্ধি করা।

● আমরা আপনার কাছ থেকে বহু বিষয় শিখছি। আমরা ছাত্র, আমাদের কাছ থেকে আপনার শেখার বিষয়।

■ প্রশ্ন করার গুরুত্ব।

● আপনার বেশি পছন্দ বিজ্ঞান না বাচ্চারা এবং তার কারণ।

■ উভয়কেই বেশি পছন্দ করি, কারণ, আমি প্রত্যেকটি বাচ্চার মধ্যে একজন বিজ্ঞানীকে দেখি।

● আপনার অধিকতম ভালোবাসার পাত্র।

■ স্রষ্টার পরে স্রষ্টার সৃষ্টিকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

● একটি প্রযুক্তি, উদ্ভাবন বা আবিষ্কার, যা সবচেয়ে বেশি আপনাকে অভিভূত করেছে।

■ বিদ্যুৎ আবিষ্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

● একটি নির্ধন পরিবারের সন্তান হয়েও কাজের মাধ্যমে উপার্জন না করে পড়াশোনা করার কারণ।

■ পড়াশোনার ব্যাপারে আমার বাবা-মা ও শিক্ষকগণ খুবই সহায়ক ছিলেন। তাঁরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আমাকে অনুপ্রাণিত করতেন।

● আপনার পছন্দের খাদ্য।

■ আমি নিরামিষাশী। আমি সবরকম ভারতীয় খাবার পছন্দ করি।

● আপনার জীবনসংগ্রাম অন্যের জন্য আদর্শ না অনুপ্রেরণা।

■ আমি এ-কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাব না যে, আমার জীবন কারোর কাছে

আদর্শ হতে পারে, কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামের সামাজিক সুবিধাহীন পরিবেশের কোনো গরিব শিশু, সে হয়তো আমার জীবনসংগ্রাম জেনে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারে। হয়তো হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারে।

● আপনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য।

■ একশো কোটি ভারতবাসীর মুখে হাসি দেখা।

এটা সুবিদিত যে, এ পি জে আবদুল কালাম তাঁর বহু সত্তার মধ্যে শিক্ষকসত্তাকে খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর কর্মজীবনের নানা পর্বে এই পরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ হামেশাই দেখা যায়। চিরবিদায়ের মুহূর্তেও তিনি শিক্ষক ছিলেন। গতবছর ২৭ জুলাইয়ের সন্ধ্যায় শিলংয়ের ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম)-এ তিনি পৌঁছোন। উপলক্ষ্য ছাত্রদের একটি কোর্স করানো, যার নাম ছিল 'মেকিং দ্য আর্থ এ লিভিং প্লানেট' (পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য গ্রহে পরিণত করা)। এই বক্তৃতা শুরু করলেও শেষ করতে পারেননি তিনি। মহাপ্রস্থান ঘটে তাঁর। বিদায়কালেও তাঁর চারপাশে ছিল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকুল। চোখের সামনে ঘটা কালামের চিরবিদায় নিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'তিনি ছিলেন একজন আদ্যন্ত শিক্ষক। ভাগ্য তাঁকে তাঁর জীবনের যোগ্য উপসংহারই দান করেছে। মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিতে দিতেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।'

বাচ্চা, পড়ুয়া ও তরুণ-তরুণীর সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তাদের নিয়ে তাঁর ছিল বহু স্বপ্ন। যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে, পূর্ণাঙ্গ জীবনমুখী শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করার ওপর জোর দিতেন তিনি। কিন্তু তবুও তাঁর মূল সুরটি বাঁধা ছিল মাস্টারমশাইদের জন্য, যাঁরা আদর্শ নাগরিক গড়ার কারিগর। একজন আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকের গুণাবলি ও করণীয় নিয়ে আবদুল কালাম আলাপ আলোচনা এবং নানান সভায় শিক্ষকদের শপথও করাতেন। তাঁর উদ্ভাবিত এই বিষয়গুলি হল: একজন শিক্ষক শিক্ষকতাকে ভালোবাসবে। শিক্ষকতা তাঁর পেশা হলেও, এটিকে তাঁর প্রাণ ভাবতে হবে। তাঁদের দায়িত্ব শুধু ছাত্র নয়, আলোকিত যুবসমাজ গঠন, যারা বিশ্বের সেরা সম্পদ। শিক্ষকতার প্রতি তাঁরা সমর্পিত হবেন। গড়পড়তা ছাত্রকে সেরা বানানোতেই বড়ো শিক্ষক হওয়ার সার্থকতা। শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের মা, বাবা, ভাই, বোনের মমতায় দেখবেন। তাঁদের জীবনযাপন থেকে যেন শিক্ষা নিতে পারে পড়ুয়ারা। ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসু হতে ও প্রশ্ন করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে, যাতে তারা সৃজনশীল হয়। সব ছাত্রকে সমান চোখে দেখতে হবে, ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি ও ভাষার বিভেদ করা যাবে না। ছাত্রদের সেরাটা দেওয়ার জন্য শিক্ষকতার মান উত্তরোত্তর বাড়াতে হবে। ছাত্রদের সফলতার উদ্‌যাপন জরুরি। শিক্ষকতার মাধ্যমে জাতির উন্নয়নে সামিল হওয়ার উপলব্ধি থাকা চাই। শিক্ষকদের মন ও মানসিকতা থাকবে মহৎ চিন্তায় পূর্ণ, ভাবনা ও কাজের মাধ্যমে যার প্রসার ঘটবে। জাতীয় পতাকাকে হৃদয়ে ধরে রেখে দেশের সম্মান বাড়াবার অঙ্গীকার করতে হবে।

দেশের শিক্ষা ও শিক্ষককুল নিয়ে তিনি নিয়ত চিন্তামগ্ন থাকতেন, কারণ, তিনি নিজেও এক অতুলনীয় শিক্ষাগুরু। অনেকেই তাঁর শিক্ষকসত্তার ও দেশভক্তির কথা সশ্রদ্ধচিত্তে আলোচনা করেছেন। কলকাতার সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টর, বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ড. বিকাশ সিনহা রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন আবদুল কালামের সঙ্গে বহুবার মিলিত হয়েছেন। তাঁর বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি লেখেন, 'সদাসর্বদা চঞ্চল, একমুহূর্ত নষ্ট করতে নারাজ মানুষটিকে মনে হত, তিনি যেন তাড়িত হচ্ছেন, যেন তাঁকে অনেক কিছু করতে হবে, অর্জন করতে হবে, অথচ সময় বয়ে যাচ্ছে। কালাম সাহেবের কোনো অসন্তোষ ছিল না, তিনি ছিলেন সরল ও ভয়হীন, তাঁর মধ্যে কোনো যুদ্ধং দেহি ভাব ছিল না। চলার পথে নানা দায়িত্ব নেবার পক্ষে তাঁর কাঁধদুটি ছিল যথেষ্টই চওড়া। তিনি ছিলেন শান্ত অথচ সদা উত্তেজিত।' এরকম একজন মানুষের দেশহিতৈষণা থাকাই স্বাভাবিক। শিশু থেকে বৃদ্ধ, গ্রামীণ ও শহুরে, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে ভারতবাসীর সার্বিক উন্নয়নই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই মঙ্গালাকাঙ্ক্ষাকে সফল করতেই তিনি শান্ত অথচ সদা উত্তেজিত থাকতেন। মানুষের জন্য অকৃত্রিম দরদী এই মনীষী দেশের জন্য যা করতে পেরেছেন, পরিকল্পনা সাজিয়েছেন তার বহু গুণ। দেশকে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত করতে তাঁর কর্মপরিকল্পনা হল: নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যে ব্যবধান ন্যূনতম করা, পরিস্রুত জল ও বিদ্যুৎশক্তির ওপর প্রত্যেকের সমানাধিকার, নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে নিয়মিত ধন উৎপাদনের মাধ্যমে উচ্চমানের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, সামাজিক বা অর্থনৈতিক বা বাধ্যতামূলক আইনকানুনের জন্য মেধাবী ছাত্রের শিক্ষাগ্রহণের পথ রুদ্ধ না করা, দেশকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও বিনিয়োগকারীর গন্তব্যস্থল হিসেবে গড়া, সবার জন্য থাকবে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ এবং কঠিন ও জটিল রোগের সংখ্যা কমিয়ে আনা, সেরা প্রযুক্তি ও ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হবে এবং শাসনপ্রণালী সরল ও সহজলভ্য, ফলত দুর্নীতিমুক্ত হবে, দারিদ্র্য একেবারে নির্মূল করা, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি, নারীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা প্রভৃতি। এভাবেই গড়ে উঠবে আমাদের দেশ, যা হবে সমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শান্তিপূর্ণ, সুখী ও ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসরমান। এবং বিশ্বের মধ্যে বসবাসের পক্ষে অন্যতম সেরা ও সমস্ত ভারতীয়র মুখে হাসি ফোটাতে যা হবে সক্ষম।

বই পড়া নিয়ে তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে বই সর্বদাই ছিল আমার আপনজন। এদের অনেককেই খুঁজে পেয়েছিলাম যখন আমি খুব ছোটো। তারা ছিল আমার বন্ধুর মতো, যারা আমাকে হাত ধরে জীবনের পথে কীভাবে চলতে হয়, তা শিখিয়েছে।'

এতসব চিন্তাভাবনা ও কর্মব্যস্ততার মাঝেও আবদুল কালাম নিয়ম করেই প্রতিনিয়ত সংবাদ ও সাময়িকপত্র এবং বই পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। বই পড়া নিয়ে তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে বই সর্বদাই ছিল আমার আপনজন। এদের অনেককেই খুঁজে পেয়েছিলাম যখন আমি খুব ছোটো। তারা ছিল আমার বন্ধুর মতো, যারা আমাকে হাত ধরে জীবনের পথে কীভাবে চলতে হয়, তা শিখিয়েছে। তাদের কথা বহু পরিস্থিতিকে বুঝতে আমায় সাহায্য করেছে, তাদের সাহায্যেই আমি আমার চারপাশের পৃথিবীকে

চিনে নিতাম।' কালামের কাছে গ্রন্থ ছিল ফ্রেন্ড, ফিলজফার ও গাইড। নিজস্ব মেধা, বৈচিত্র্যময় দীর্ঘ কর্মজীবনের সুবিশাল অভিজ্ঞতা, অসংখ্য বই এবং পড়ুয়া ও যুব সম্প্রদায়ের অজস্র প্রশ্ন দিয়ে গড়া তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল দেশের অগ্রগতিতে সমর্পিত। তিনি ছিলেন জ্ঞানের আধার, কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, জ্ঞান ও কর্মের সম্মিলিত রূপই আমাদের দেশের মাথা থেকে উন্নয়নশীল তকমা সরিয়ে উন্নত করতে সক্ষম। এটি ত্বরান্বিত করতে তিনি বই লেখা থেকে দেশের উচ্চপদস্থ নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মত বিনিময় করেছেন। একেবারে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে দেশের শীর্ষতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, গবেষকদের অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁর বক্তৃতায় ও আলাপ-আলোচনায়।

শুধু পড়ুয়া ও যুব সম্প্রদায় নয়, তাঁর কথপোকথনে মুগ্ধ হননি, এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল। বাংলা কিশোরসাহিত্যে জনপ্রিয় 'কাকাবাবু' চরিত্রের অমর স্রষ্টা, কবি ও সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও (১৯৩৪—২০১২) আবদুল কালামের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর কথায়, 'জীবনে আমি অনেক বক্তৃতা শুনেছি, বেশ কিছু শুনতে বাধ্যও হয়েছি। কিন্তু এমন অভিনব, মর্মস্পর্শী ও মজার বক্তৃতা জীবনে শুনিনি। শোনার পর থেকেই সে-অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য ছটফট করছি।' ওই বক্তৃতায় কালামের গ্রন্থপ্রীতির এক নতুন রূপ দেখে তিনি খুবই মজা পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, তাঁর সভায় উপস্থিত সবাইকে কালাম বিভিন্ন বিষয়ের শপথ পাঠ করাতেন।

সে-দিনের সভার একটি বিশেষ শপথ নিয়ে সুনীলবাবু লিখছেন, 'শেষ শপথটির কথা না বললেই নয়। সেটা এরকম: ১. আজ থেকে আমার বাড়িতে অন্তত কুড়িটি বই নিয়ে একটা লাইব্রেরি চালু করব, যার মধ্যে দশটি বই থাকবে বাচ্চাদের জন্য। ২. আমার মেয়ে আর ছেলে বাড়ির সেই লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলবে অন্তত দুশোটি। ৩. আমার নাতি-নাতনিরা সেই বইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলবে অন্তত দু-হাজারে। ৪. আমাদের বাড়ির লাইব্রেরিটিই হবে আমাদের পরিবারের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি। ৫. আমরা পরিবারের সবাই মিলে সেই লাইব্রেরিতে প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা সময় কাটাব। কালাম আরও জানালেন যে, তামিলনাড়ুর এক বইমেলায় তিনি প্রায় দু-লক্ষ মানুষের এক সমাবেশে শ্রোতাদের এই শপথ পাঠ করিয়েছিলেন। তারপর অনেকেই তক্ষুনি একসঙ্গে কুড়িখানা বই কেনার জন্য ছুটে যায়। বইমেলার অনেক দোকানই খালি হয়ে গেল এর ফলে।' অবিশ্বাস্য! কালাম এফেক্ট।

ড. এ পি জে আবদুল কালামের জীবনের প্রতিটি পর্বই অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যা করেছেন, যা বলেছেন বা যা লিখেছেন, সবকিছুতেই আছে সমাজে মনুষ্যত্ববোধ ও শুভবোধ জাগরণের নিরন্তর প্রচেষ্টা। এই সংকল্পে তিনি একদিকে রেখেছেন বিদ্যাভ্যাসী এবং অন্যদিকে বিদ্যাদাতাদের। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মেলবন্ধনে এক শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ ভারতবর্ষই ছিল তাঁর চিরকাঙ্ক্ষিত। শিক্ষাগুরুদের প্রতি তাঁর আহ্বান, দেশের কোটি কোটি পড়ুয়াদের প্রতি তাঁরা যেন সংবেদনশীল দায়িত্বসচেতনতার পাশপাশি তাদের অভিভাবকও হতে পারেন। এ-বিষয়ে তাঁর যুগান্তকারী অনুধাবন হল, 'শিক্ষা প্রকৃত অর্থে সত্যের অন্বেষণ। শিক্ষক একেবারে কেন্দ্রীয় অংশ, যাঁকে ভিত্তি করে শিক্ষা সংক্রান্ত সবকিছু আবর্তিত হয়। শিক্ষক সর্বদা তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করার মাধ্যমে সমকালীন মানের সমতুল্য হবেন, যাতে তাঁর ছাত্ররা তাঁকে চলমান বিশ্বকোষ বলে মান্য করে এবং ভালোবাসা ও সর্বোপরি বিশ্বস্ততার প্রতিভূ বলে মনে করে। শিক্ষককে সেই পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে, যাতে তিনি একেবারে শেষতম প্রযুক্তির কথা পড়ুয়াদের জানাতে পারেন এবং তা শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারও করতে পারেন, যাতে প্রযুক্তি ও শিক্ষক দ্বারা প্রদেয় শিক্ষা ভারতের স্বাভাবিক শিক্ষাপদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে। জ্ঞান ও আলোকের দিকে যাত্রা অন্তহীন। এই ধরনের যাত্রা মানবপ্রগতির নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে, যেখানে নীচতা, বিশৃঙ্খলা, ঈর্ষা, ঘৃণা ও শত্রুতার কোনো স্থান নেই। এই জ্ঞানালোক মানুষকে সম্পূর্ণ করে, করে মহাত্মা ও পৃথিবীর সম্পদ। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ প্রকৃত অর্থে এই ধরনের শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রকৃত শিক্ষা মানবচরিত্রকে মহিমা দান করে এবং একজন মানব বা মানবীর আত্মসম্মানকে দৃঢ় করে। যদি প্রতিটি ব্যক্তি শিক্ষকের সহায়তায় প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করার পর সেই শিক্ষাকে কর্মক্ষেত্রে বিকশিত করে, তাহলে নিশ্চয়ই পৃথিবী আরও বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।' শিক্ষা নিয়ে দিনরাত চর্চা, তার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাপদ্ধতির শেষতম খোঁজখবর না রাখলে মাটি-সম্পৃক্ত উচ্চস্তরীয় শিক্ষা স্বরূপের এমন বর্ণনা সম্ভব হত না। দেশের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করেও তিনি মুহূর্তের জন্যও বাবা-মা ও তাঁর শিক্ষকদের বিস্মৃত হননি। ফলে গুরুজনদের প্রতি তাঁর ছিল সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাবোধ। চেন্নাইয়ের আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রতি এক ভাষণে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'আপনাদের পেশা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি বিশ্বাস করি, সমাজে আপনাদের দানের

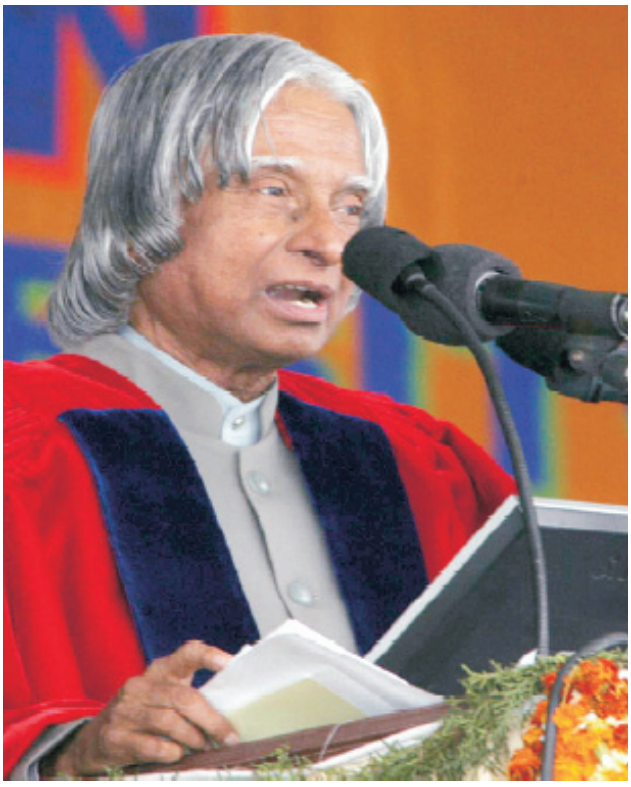

চেয়ে অন্য কোনো দান বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

শিক্ষা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষালয়, শিক্ষানীতি, শিক্ষাদর্শ, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি নিয়ে বহুবিদ্যাজ্ঞ আবদুল কালামের নিজস্ব ভাবনাসমৃদ্ধ শিক্ষাচর্চার সঙ্গে এতক্ষণ পরিচিত হয়েছি আমরা। তাঁর জীবনাবসানের পর-পরই দেশের কয়েকটি রাজ্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিক্ষা সম্পর্কিত কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু এ-তথ্যটি অনেকের অজানা যে, জীবিতকালেই রাষ্ট্র সংঘ ২০১০ সালের ১৫ অক্টোবর তাঁর ৭৯-তম জন্মজয়ন্তীকে 'বিশ্ব ছাত্র দিবস' হিসেবে পালন করে। রাষ্ট্রপতি, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ হয়েও যে-মনীষী শিক্ষকতাকে নিজের শ্রেষ্ঠ পরিচয় দেন, যিনি দেশের উচ্চতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেধাবী পড়ুয়াদের পাশাপাশি দেশের একেবারে চরম অবহেলিত গ্রামের দলিত ও আদিবাসী শিশুদের হাতে ধরে ব্ল্যাকবোর্ডে অ, আ, ক, খ লিখতে শেখান এবং তাদের সঙ্গে একাসনে বসে মিড ডে মিলের খাবার খান, তিনিই তো চিরস্মরণীয় ছাত্রসখা দেশবন্ধু ও দেশের প্রকৃত জননায়ক। তাঁর প্রয়াণ দেশবাসীর জন্য, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের জন্য যে অপূরণীয় ক্ষতি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ও গুজরাতের কচ্ছ থেকে নাগাল্যান্ডের কোহিমার অসংখ্য শিক্ষার্থীর রাশি রাশি প্রশ্নের অনুপ্রেরণাদায়ী সদুত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে ই-মেল পড়তে কম্পিউটারের সামনে আবদুল কালাম আজ আর বসে নেই।

আমাদের দীর্ঘ সমীক্ষণের সমাপাতন রাষ্ট্রপতির প্রতি এক বাঙালি তরুণীর আপাত কঠিন একটি ঔৎসুক্য দিয়ে করতে আগ্রহী। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কল্যাণী দাসের প্রশ্ন: যদি প্রত্যেকেই শিক্ষিত হয়ে যায়, তাহলে কারা তথাকথিত ঝাড়ুদার, ধোপা ও এইরকম ভৃত্যসম গার্হস্থ্য ও নীচ কাজগুলি করবে। আপনি কি মনে করেন, সকলের জন্য শিক্ষা আমাদের সমাজের সমস্যাগুলোর সমাধান ঘটাতে পারবে? দেশের ১১-তম একমাত্র অকৃতদার রাষ্ট্রপতি আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আবদুল কালামের সপ্রতিভ উত্তর: কোনো কাজই ভৃত্যসম গার্হস্থ্য ও নীচ নয়। শিক্ষা ওই একই কাজ সুলভে, দ্রুততর ও সর্বোত্তম উপায়ে করতে মানুষকে সক্ষম ও সমৃদ্ধ করবে।

তথ্যপঞ্জি

১. A P J Abdul Kalam, 'Spirit of India', Rajpal & Sons, Delhi, 2013.

(প্রশ্নোত্তরগুলির বেশিরভাগই এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত। ভাবানুবাদ বর্তমান নিবন্ধকারের।)

২. সত্যম রায়চৌধুরি-সম্পাদিত, 'কালাম কথা', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬।

৩. এ পি জে আবদুল কালাম, সহযোগী লেখক: অরুণ তিওয়ারি, 'অগ্নিপক্ষ-আত্মজীবনী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০১৫।

৪. এ পি জে আবদুল কালাম, 'সন্ধিক্ষণ-প্রতিকূলতা জয়ের লক্ষ্যে যাত্রা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০১৪।

৫. A P J Abdul Kalam & Sivathanu Pillai, 'We Can Do It-Thoughts for Change', Shree Book Centre, Mumbai, 2014.

৬. A P J Abdul Kalam & V Ponraj, 'A Manifesto For Change', Harper Collins Publishers, Noida, 2014.

৭. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মৌলানা আবুল কালাম আজাদ', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫।

৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'সবাই আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে শপথ নিন', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

*এফআরও (ফ্লোর রিঅ্যাকশন অর্থোসিস) এটি ঘরের মেঝে বা সমতল জায়গায় সক্রিয় হওয়ার এক কৃত্রিম যন্ত্র, যা পা-কে চলাফেরা করতে আপেক্ষিকভাবে সহায়তা করে বা আটকায়। এটিকে ক্যালিপারও (caliper) বলা হয়। একবার হায়দরাবাদ হাসপাতাল পরিদর্শনকালে আবদুল কালাম দেখতে পান, এক পোলিয়ো-আক্রান্ত বাচ্চা প্রায় তিন কেজি ওজনের এফআরও পরে কষ্টেসৃষ্টে হাঁটছে। ওই হাসপাতাল (নিজাম ইনসটিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স)-এর অস্থি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. বি এন প্রসাদ ড. কালামের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে হালকা এফআরও প্রস্তুতের অনুরোধ জানান। কালাম ও তাঁর সহযোগীরা অগ্নি মিসাইল তৈরিতে ব্যবহৃত তাপ থেকে রক্ষাকারী যৌগিক পদার্থ দিয়ে কিছু দিনের মধ্যে মাত্র তিনশো গ্রাম ওজনের এফআরও প্রস্তুত করে ডাক্তারদের হাতে তুলে দেন। ডাক্তারদের সহায়তায় সেটি বাচ্চাদের পরানো হলে, হালকা হওয়ায় তারা খুশিতে লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি শুরু করে এবং এ-দৃশ্য দেখে উপস্থিত সবারই চোখ আনন্দাশ্রুপূর্ণ হয়। উল্লেখ্য, যেখানে প্রচলিত এফআরও-র মূল্য ছিল তিন থেকে চার হাজার টাকা, কালামদের দ্বারা প্রস্তুত যন্ত্রটির মূল্য মাত্র পাঁচশো টাকা। এই মেডিকেল কলেজেরই প্রখ্যাত কার্ডিয়োলজিস্ট ডা. বি সোমা রাজুর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তিনি ১৯৯৮ সালে হৃদ্‌রোগীদের জন্য সস্তা মূল্যের স্টেন্ট (stent) তৈরি করেন। এই স্টেন্টটির নাম 'কালাম-রাজু স্টেন্ট'। কালাম-রাজু স্টেন্টের মূল্য মাত্র দশ হাজার টাকা। কিন্তু বাজারে প্রচলিত স্টেন্টের মূল্য পঁচাত্তর হাজার থেকে দেড় লক্ষ টাকা। রসিকতা করে কালাম একবার বলেছিলেন, অনেকে আমাকে বলে মিসাইল কিন্তু মানুষকে হত্যা করে। স্টেন্ট উদ্ভাবনের পর আমি তাঁদের বলি, স্টেন্ট হৃদ্‌রোগীদের বাঁচাবে। গ্রাম্য স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যবহারের জন্য তাঁরা 'কালাম-রাজু ট্যাবলেট' তৈরিও করেন। ■

যুগান্তকারী কাজ করেও কেউ কেউ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে চলে যান। পরবর্তীকালের মানুষজন তাঁদের কীর্তি দূরের কথা, নামটুকুও জানতে পারেন না। তেমনই একজন কীর্তিমান মানুষ মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীন। তাঁর জীবনের চমকপ্রদ বিবরণ এই পাতায়।

ইংলণ্ডে প্রথম ভারতীয়

আইনুল হক খাঁ

অনেকের ধারণা, রাজা রামমোহনের পূর্ব্বে আর কোন শিক্ষিত ভারতবাসী ইংলণ্ডে যান নাই। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, তাহা বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একখানি বই হইতে সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত বইখানি ভ্রমণকারীর লিখিত ফারসী বিবরণের ইংরাজি অনুবাদ। উক্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা জানতে পারি যে, রাজা রামমোহন রায়ের বহু পূর্ব্বে ১৭৬৫ সালে মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীন নামক একজন বাঙ্গালী মুসলমান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যব্যপদেশে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং দেড় বৎসর কাল ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন।

মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীন পুরাপুরিই বাঙ্গালী ছিলেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত পাঞ্চনুর বা পাঁজনুর নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। ই. বি. রেলওয়ে মেন লাইনের চকদহা ষ্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে উক্ত গ্রামটি অবস্থিত। ১৮৫৫-৫৭ সালের রেভিনিউ সার্ভে-ম্যাপে পাঁজনুর গ্রামটির নাম বদলাইয়া কাজীপাড়া রাখা হয়। বর্ত্তমানে পাঁজনুর নদীয়া জেলার একটি পরগণা বলিয়া অভিহিত। মির্জা সাহেবের লিখিত "নসবনামা" বা পারিবারিক ইতিহাসে পাঞ্চনুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়:

"প্রাচীন কালে পাঞ্চনুর একটি শহর ও বন্দর ছিল। ইহার তলদেশ দিয়া গঙ্গানদী বহিয়া যাইত। নদীর উপর দিয়া যে-সমস্ত জাহাজ ও নৌকা যাতায়াত করিত, গ্রাম হইতে তাহা দৃষ্টিগোচর হইত। বরকত খাঁর প্রাসাদের পশ্চিমে জাহাজ হইতে নামিবার ঘাট ছিল। কালক্রমে পূর্ব্ব উপকূলে চর পড়িতে লাগিল এবং নদী পশ্চিম দিকে ভাঙিয়া চলিল। এইরূপে নদী যখন পাঞ্চনুর হইতে পশ্চিমে বহুদূরে সরিয়া গেল, তখন বন্দরটীও পাঞ্চনুর হইতে সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামে স্থানান্তরিত হইল। অতঃপর গঙ্গা সাতগাঁ হইতেও সরিয়া গিয়া হুগলি শহর ও বন্দরের সৃষ্টি করিল।

পাঞ্চনুরের পতনের পর একজন সম্ভ্রান্ত খাজা উহার উন্নতিবিধান করেন। উক্ত খাজা রাজার একজন জায়গীরদার ছিলেন। তিনি পাঞ্চনুর পরগণার জমিদার রাজারাম রায় ও রাজা রুদ্র রায়ের পৌত্রগণের নিকট হইতে পাঞ্চনুর ও আরও কয়েকটী গ্রামের ইজারা লন। এই খাজা সাহেবের বংশধরগণ পরে উক্ত পরগণার কাজীরা পদ লাভ করেন। তাঁহারা বংশপরম্পরায় বহুদিন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর আনুলিয়া হইতে আরও চারিটি পরিবার আসিয়া জঙ্গল কাটিয়া এখানে বসবাস করেন। পরে আনুলিয়া ও সমুদ্রগড় হইতে আরও অনেক পরিবার এখানে আসেন।"

পাঠান রাজত্বকালে আনুলিয়ায় বাঙ্গালার কোষাগার স্থাপিত ছিল এবং বহু সম্ভ্রান্ত বংশের বাস ছিল। দ্বিতীয় দলে আনুলিয়া হইতে যে-সমস্ত পরিবার পাঞ্চনুরে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীনের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদের অন্যতম। এহ্‌তেশামুদ্দীনের পূর্ব্বপুরুষ— যিনি পাঞ্চনুরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন, তাঁহার নাম মোহাম্মদ জামাল। এহ্‌তেশামুদ্দীন পিতৃধারায় নবম বংশধর, যথা: মোহাম্মদ জামাল, শেখ গুল মোহাম্মদ, শেখ বাহ্‌লুল, শেখ ফরিদ, শেখ হজরত আবদুশ্‌ শুকুর, হজরত শেখ-উল-ইস্‌লাম, শাহাবুদ্দীন, তাজুদ্দীন, এহ্‌তেশামুদ্দীন। মির্জা সাহেবের বংশধরগণ এখনও পাঞ্চনুরে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাদের অনেকে মুফ্‌তি, দেওয়ান, কাজী প্রভৃতি উচ্চপদ দখল করিয়া আসিয়াছেন।

মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীন কে কি ভাবে রাজকীয় ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ইংলণ্ডে যাইতে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ আমরা তাঁহারই পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি: নবাব মীর জাফর আলি খাঁর শাসনকালে প্রধান মুনসী শেখ সলিমুল্লা সাহেবের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। তাঁহারই সাহায্যে আমি ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের সুযোগ পাই। মীর কাশীম আলি খাঁর বংশধরগণের রাজত্বকালে আমি মেজর পার্কের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করি। উন্‌সুদ্‌ জমান খাঁ ও বীরভূমের রাজার বিরুদ্ধে যে-যুদ্ধ হয়, আমি তাহাতে উপস্থিত ছিলাম। যুদ্ধ-বিরতির পর আমি বাদশাহ্‌ শাহ্‌ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং পরে মেজর পার্কের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। মেজর পার্ক ইউরোপে চলিয়া যাওয়ার পর আমি মিঃ স্ট্রেচি ও আরও কয়েকজন ভদ্রলোকের অধীনে চাকুরি করি। এই সময় (১৭৬৫ সালে) নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত লর্ড ক্লাইভের এক সন্ধি হয় এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করেন। অতঃপর লর্ড ক্লাইভ ইংলণ্ড প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলে শাহ্‌ আলম সজল-নয়নে তাঁহাকে বলিলেন: 'আপনি নিজের ইচ্ছামত কোম্পানীর কাজের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু আমার টাকা-কড়ি সম্বন্ধে কোন পাকা বন্দোবস্ত করিলেন না। আমি যতদিন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া আছি, ততদিন আপনি দিল্লীর নিকটে কোন ইংরাজ সৈন্য মোতায়েন রাখিতে চান না। এখন আপনি আমাকে শত্রুর মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতেছেন।' ইহা শুনিয়া লর্ড ক্লাইভ ও জেনারেল চার্নক অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন: 'আমাদের রাজার অনুমতি না লইয়া এবং কোম্পানীর ইচ্ছা না জানিয়া ইংরাজ সৈন্য আপনার নিকট মোতায়েন রাখা যাইতে পারে না। আমরা ইংলণ্ডে রাজার নিকট সমস্ত বিষয় লিখিতেছি। তাঁহার হুকুম পাইলে সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে। তবে যতদিন তাঁহার হুকুম না পাওয়া যায়, ততদিন আপনি এলাহাবাদেই থাকুন। ইতিমধ্যে জেনারেল স্মিথ একদল সৈন্য লইয়া আপনার নিকট থাকিবেন এবং সকল বিষয়ে আপনার হুকুম তামিল করিবেন। তাহা ছাড়া জৌনপুরে ইংরাজ সৈন্যের একটী ঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছে। জৌনপুর এলাহাবাদ হইতে বেশী দূর নহে। দরকার হইলে এখানকার সমস্ত সৈন্য আপনার নিকট হাজির হইবে।' অতঃপর বাদশাহ্‌ শাহ্‌ আলমের ইচ্ছাক্রমে ও তাঁহার মন্ত্রিগণের পরামর্শে লর্ড ক্লাইভ ইংলণ্ডে রাজার নিকট বাদশাহের নাম দিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র পাঠাইতে রাজি হইলেন: 'আপনি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিলে আমি ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য পাইতে পারি; আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায়

ইহাই আমি চাই। আপনার বন্ধুত্বলাভের জন্য আমরা বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।' ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, এই চিঠির সঙ্গে এক লক্ষ টাকা মূল্যের উপঢৌকনও বিলাতে রাজার নিকট প্রেরিত হইবে।

অতঃপর লর্ড ক্লাইভ ও বাদশাহের উজির কলিকাতা আসিলেন। উপরোক্ত মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিয়া বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নামের শীলমোহর দিয়া বাদশাহের দূত হিসাবে ক্যাপ্টেন 'এস্'কে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। এক লক্ষ টাকা মূল্যের উপহারও এই সঙ্গে দেওয়া হইল। ইহাও স্থির হইল যে, বাদশাহের পক্ষ হইতে একজন মুন্‌শীও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যাইবেন। মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীন এই কার্য্যের জন্য মনোনীত হইলেন এবং খরচপত্রের জন্য বাদশাহের নিকট হইতে ৪ হাজার টাকা পাইলেন। ইউরোপ ভ্রমণের এই সুযোগ পাইয়া মির্জা সাহেব অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন এবং ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন।

এক সপ্তাহ সমুদ্রযাত্রার পর ক্যাপ্টেন মির্জা সাহেবকে জানাইলেন: লর্ড ক্লাইভ বাদশাহ্ শাহ্ আলমের চিঠি ফিরাইয়া লইয়াছেন এই অজুহাতে যে, এক লক্ষ টাকার উপহার বাদশাহের নিকট হইতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। যাহা হউক, ক্যাপ্টেন তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, পর বৎসর লর্ড ক্লাইভ স্বয়ং উক্ত চিঠি ও উপহার লইয়া ইংলণ্ডে রাজার নিকট উপস্থিত হইবেন। এহ্‌তেশামুদ্দীন এই কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন; কিন্তু সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিলেন না। এহ্‌তেশামুদ্দীন দেড় বৎসর কাল ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। যে-উদ্দেশ্যে মির্জা সাহেবকে বিলাতে যাইতে হইয়াছিল, তাহার পরিণতি সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন: "আমি ইংলণ্ডে দেড় বৎসর কাল ছিলাম এবং প্রত্যেক দিনই মোগল বাদশাহের চিঠির প্রতীক্ষা করিয়াছি। ইংলণ্ডেশ্বরকে আনুগত্য ও শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য লর্ড ক্লাইভ যখন বিলাতে আসিলেন, তখন বাদশাহের লক্ষ টাকা মূল্যের উপহার তিনি সঙ্গে করিয়া আনিলেন; কিন্তু বাদশাহের নাম না করিয়া নিজের পক্ষ হইতেই সেগুলি রাণীকে উপহার দিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে যথেষ্ট রাজ-অনুগ্রহও লাভ করিলেন। লর্ড ক্লাইভ বাদশাহের চিঠি বা অনুরোধ সম্বন্ধে কোনই উচ্চবাচ্য করিলেন না। ক্যাপ্টেন 'এস্'ও লর্ড ক্লাইভের অনুগ্রহলাভের আশায় এ সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই।"

তৎকালীন এই সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা ছাড়াও এহ্‌তেশামুদ্দীন তাঁহার পুস্তকে নানা বিষয়ের বর্ণনা দিয়াছেন। যাত্রাপথে তিনি যে-সমস্ত দ্বীপ ও স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন সেখানকার বহু দ্রষ্টব্য বিষয়ের আলোচনা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 'মারমেড্' সম্বন্ধে যে-বর্ণনা দিয়াছেন তাহাই হইয়াছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক! তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "এসেন্‌সন দ্বীপে এই অদ্ভুত জীব সম্বন্ধে আমি গল্প শুনি, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি দেখিতে পাই নাই। 'মারমেড্' মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত অবিকল একটি সুন্দরী নারী— ভ্রমরকৃষ্ণ কেশপাশ, কাজল-কালো চক্ষু, ধনুকের মত ভ্রূ, সুন্দর গঠন সবই তার আছে। কিন্তু খোদার কাছে প্রার্থনা, 'মারমেড্' যেন কাহারও দৃষ্টিপথে না পড়ে। কেন না এরা জেনপরীর একটা জাত মাত্র। সমুদ্রের জলে এরা যখন কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া থাকে, তখন এদের চেহারা নাবিকদের নজরে পড়িলে তারা অজ্ঞান হইয়া যায়। এক একটা নাবিকের নাম ধরিয়া এরা ডাকে আর সেই নাবিক একেবারে পাগল হইয়া যায় এবং যাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে। তৃতীয়বার ডাক শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারে না— জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া যায়।"

এহ্‌তেশামুদ্দীন লণ্ডনে পৌঁছিলে বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসেন। কালক্রমে তিনি সকলের নিকট পরিচিত হইয়া গেলেন এবং নানা স্থানে নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। একদিন তিনি একটি মজলিসে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা হইয়াছে— বহু মহিলা ও পুরুষ সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নৃত্যগীত থামিয়া গেল এবং সকলে তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার পোষাক, পাগড়ী ও শাল ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, ইহা থিয়েটারে অভিনয় ও নৃত্য করিবারই উপযুক্ত পোষাক। মির্জা যতক্ষণ সেখানে ছিলেন, তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া সকলে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। মির্জা সাহেব লণ্ডনের বহু দ্রষ্টব্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। বৃটিশ মিউজিয়ম, থিয়েটার, সার্কাস, প্রভৃতি বহু বিষয়ের উল্লেখ তাঁহার পুস্তকে আছে। মির্জা সাহেব লিখিয়াছেন: লণ্ডন শহরে যত সস্তায় নাচ দেখিতে পাওয়া যায়, এমন আর কোথাও নহে। ভারতবর্ষে নাচ দেখিতে হইলে বহু স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতে হয়— ধনী ব্যতীত অন্য কেহ সে ব্যয় বহন করিতে পারে না; কিন্তু লণ্ডনে সামান্য খরচ করিয়াই নাচ দেখা যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের বহু পূর্ব্বে ১৭৬৫ সালে মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীন নামক একজন বাঙ্গালী মুসলমান ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যব্যপদেশে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং দেড় বৎসর কাল ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন।

অক্‌স্‌ফোর্ডে গিয়া মির্জা সাহেব আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায় হস্তলিখিত অনেকগুলি পুস্তক দেখিতে পান। উহার পাঠোদ্ধারে ও অনুবাদে তিনি বিশেষ সাহায্য করেন। মিঃ জোন্‌স্ নামক এক ব্যক্তিকে তিনি ফারসী গ্রামার প্রণয়নেও সাহায্য করিয়াছিলেন।

অক্‌স্‌ফোর্ড লাইব্রেরীতে মির্জা সাহেব নানারূপ সুন্দর চিত্রকলার সহিত পরিচিত হন। এই সম্পর্কে তিনি এক অদ্ভুত গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন: "বহুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এক চিত্রকর বাস করিতেন। সেকালে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। একদা তিনি একজন গরীব লোককে তাঁহার গৃহের ভিতরে লইয়া গিয়া মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া ফেলেন। অতঃপর তাহার দুই পা ও বিলম্বিত দুই হাত দেওয়ালে পেরেক দিয়া আবদ্ধ করিয়া তাহার বুকে ছুরিকাঘাত করেন। যখন সে মৃত্যু-যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে, সেই সময় চিত্রকর তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখভাবের অবিকল চিত্র আঁকিয়া লইয়াছিলেন: ইতিপূর্ব্বে এমন সুন্দর ও অদ্ভুত চিত্র আর কেহ আঁকিতে পারে নাই; সর্ব্বত্র ইহার উচ্চ প্রশংসা ও আদর হইল। কিন্তু এই নরহত্যা গোপন রহিল না। বিচারে চিত্রকরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। চিত্রকর বুদ্ধিকৌশলে এই প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা পান। তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হইবে এমন সময় তিনি বলিলেন: 'আমার চিত্র এখনও শেষ হয় নাই, উহাতে এখনও কিছু রং দিতে বাকী আছে।' তাঁহাকে উহা শেষ করিবার সুযোগ দেওয়া হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ চিত্রটির উপর কাল কালি লেপিয়া দিলেন। এমন সুন্দর চিত্রটি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন কেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'অনেক পরিশ্রম করিয়া এই চিত্রটী আঁকিয়াছিলাম। ইহার জন্য যদি আমার জীবনই যায়, তবে ইহা রাখিয়া আমার লাভ কি?' ইহাতে রাজা বলিলেন, 'আমি তোমার জীবন রক্ষা করিব, যদি তুমি চিত্রটি পূর্ব্বের ন্যায় আঁকিয়া দিতে পার।' চিত্রকর স্বীকার করায় রাজা তাঁহাকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলেন। বলাবাহুল্য, চিত্রকর ছবিটী অবিকল পূর্ব্বের ন্যায় আঁকিয়া দিয়াছিলেন।" মির্জা এহ্‌তেশামুদ্দীন স্কটল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া স্থানীয় পার্ব্বত্য এবং সৌন্দর্য্য এবং জাতীয় পোষাক ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে খৃষ্টধর্ম্ম ও ইস্‌লাম সম্বন্ধেও তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। মির্জা সাহেবকে ইংলণ্ডে রাখিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি ফারসী শিক্ষা দিয়া অনায়াসে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। তাঁহাকে মদ ও শূকর মাংস খাওয়াইবার চেষ্টাও কম হয় নাই। কিন্তু এসমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। অবশেষে যখন তিনি দেখিলেন যে, যে-উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠানো হইয়াছিল, তাহা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিলেন এবং ১৭৬৮ সালের কার্ত্তিক মাসে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন।

(বানান অপরিবর্তিত রেখে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল 'বুলবুলে'র শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৪১ সংখ্যা থেকে।) ■

দুনিয়ায় এমন জাতি নেই, যাদের নিজস্ব লোককথা উপকথা কিংবা রূপকথা পাওয়া যাবে না। এবারে আমাদের দেশ ভারতবর্ষের ঝাড়খণ্ডি অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটি লোককথা মুদ্রিত হল। সংগ্রহ ও গ্রন্থনা করেছেন

বঙ্কিম মাহাত

সোনার পাখি সোনার গাছ

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। রাজার তিন রানি। তিন রানির তিন ছেলে। বড়ো আর মেজোরানির ছেলে দুজন বয়সে বড়ো আর ছোটোরানির ছেলে ওদের চেয়ে বয়সে ঢের ছোটো। একদিন রাজা ছেলেদের বুদ্ধি, শক্তি আর সাহস পরীক্ষা করার জন্য বললেন, 'এবার তোমরা দেশ বিদেশ ঘুরবার জন্যে বেরিয়ে পড়ো। পৃথিবীর যেখান থেকে পারো সোনার পাখি সোনার গাছ নিয়ে এসো। যে সোনার পাখি ও সোনার গাছ আনতে পারবে, সে এ-রাজ্যের রাজা হবে।' বড়ো দু-ভাইয়ের ভেতর বেশ ভাবসাব। রাজার কথা শুনে ওরা ঘোড়া টগবগিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তখন ছোটোরানিও তাঁর ছেলেকে বললেন, 'যা, তুইও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়।' ছোটোরাজপুত্রের ঘোড়া নেই, তাই সে পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে ওর দাদারা ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

এদিকে বড়োরাজপুত্র দুজন যেতে যেতে এক গভীর বনের ভেতর এক রাজপ্রাসাদ পেল। ওরা বাইরে ঘোড়া বেঁধে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভেতরে ঢুকে দেখে এক রাজকন্যা একা একা আপন মনে পাশা খেলছে। ওদের দেখে রাজকন্যা মিষ্টি হেসে আদর করে বসাল। বলল, 'একা একা কি পাশা খেলা যায়? এসো না, এক-হাত পাশা খেলা যাক।' বড়োভাই বলল, 'বেশ তো, এক-হাত খেলাই যাক।' রাজকন্যা বলল, 'আমার কিন্তু একটা পণ আছে। আমাকে যে পাশা খেলায় হারাতে পারবে, আমি তাকেই বিয়ে করব। আর যদি কেউ হেরে যায়, তবে তাকে চিরকাল কয়েদখানায় কয়েদি হয়ে থাকতে হবে।' বড়োরাজপুত্র বলল, 'আমি তাতেও রাজি।' পাশা খেলা শুরু হল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজকন্যার কাছে বড়োরাজপুত্র হেরে গেল। অমনি তাকে বন্দি করে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারপর মেজোরাজকুমারও পাশা খেলতে বসল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সেও হেরে গেল। তাকেও বন্দি করে কয়েদখানায় রাখা হল।

এদিকে ছোটোরাজকুমারও সোনার পাখি সোনার গাছ খুঁজতে বেরিয়েছে। পায়ে হেঁটে চলেছে সে। চলেছে তো চলেছেই। দেখতে দেখতে ছ-মাস পার হয়ে গেল। একদিন সে এক গভীর বনের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

বনের ভেতর মানুষের পায়ে-হাঁটা একফালি সরু রাস্তা। ছোটোরাজকুমার সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলতে লাগল। যেতে যেতে একটি পাতা-ছাওয়া কুঁড়েঘর দেখতে পেল। ঘরটি একজন তপস্বী সাধুর। ঘরে কেবল একটি গাইগোরু ও একটি বাছুর বাঁধা ছিল। সাধু তখন কুটিরে ছিলেন না। ছোটোরাজকুমার ঘরদোর, গোয়ালঘর পরিষ্কার করল, তারপর পাশের ঝোপে গিয়ে লুকিয়ে থাকল। সন্ধ্যার সময় সাধু ঘরে ফিরে এলেন, এসে দেখলেন, কে যেন ঘরদোর ঝকঝক করে পরিষ্কার করে রেখেছে। তখন সাধু বললেন, 'কোন অভাগার ছেলে এসেছিল এখানে। আমার ঘরদোর পরিষ্কার করে আমার সঙ্গে না দেখা করে চলে গেছে!' তখন ছোটোরাজকুমার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে সাধুর পায়ে প্রণাম করে বলল, 'আমি পরিষ্কার করেছি সাধুবাবা।' সাধু বললেন, 'তুই কে?' তখন ছোটোরাজকুমার বলল, 'আমি এক রাজপুত্র। আমার বাবা আমাকে সোনার পাখি সোনার গাছ নিয়ে যেতে বলেছেন।' তখন সাধু বললেন, 'আমরা তিন ভাই, আমি ছোটো। এখান থেকে আরও এগিয়ে গেলে পাবি মেজোভাইয়ের কুটির, তারপর আরও এগিয়ে গেলে বড়োর কুটির। ওখানেই পাবি সোনার পাখি সোনার গাছ।' তারপর সাধু রাজকুমারকে একটি চাবিকাঠি দিয়ে বললেন, 'যা, ওই একটু আগে একটা ঘর আছে। ওখানে ভাত ছাড়া আর-সব খাবার জিনিস পাবি। যত খুশি পেট ভরে খেয়ে নিয়ে এখানে ফিরে আয়।' ছোটোরাজকুমার খেয়েদেয়ে ফিরে এল আর সাধুর ডেরায় রাত কাটাল। সকাল বেলা সাধু ছোটোরাজকুমারকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ-রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে যা।' রাজকুমার বলল, 'আমার পায়ে বড়ো ব্যথা, আমি আর চলতে পারছি না।' তখন সাধু রাজকুমারকে একটা বাঘের চামড়া দিয়ে বললেন, 'এটার ওপর চেপে বসলেই এটা চলতে আরম্ভ করবে।' রাজকুমার বাঘের চামড়ার ওপর চেপে বসল, অমনি বাঘের চামড়া হড়র হড়র শব্দ করে চলতে লাগল।

তারপর আরও দু-একদিন কেটে যাবার পর রাজকুমার সাধুকে বলল, 'সাধুবাবা, এবারে আজ্ঞা করুন, আমি ঘরে ফিরে যাই।' সাধুবাবা ওদের আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন। তখন রাজকুমার আর তিন কন্যা বাঘের চামড়ার ওপর গিয়ে বসল। বাঘের চামড়ার এমনই গুণ যে, ওতে যত লোক বসবে ততই ওটি লম্বা হবে। বাঘের চামড়া হড়র হড়র করে চলতে লাগল। চলতে চলতে মেজোসাধুর ঘর। ওখানে মেজোসাধু আরও তিনটি সোনার পাখি সোনার গাছ বানিয়ে দিলেন। রাজকুমার সাধুকে বলল, 'সাধুবাবা, আমার বড়ো দু-ভাই কোনো এক দেশের রাজার কয়েদখানায় কয়েদি হয়ে আছে, ওদের কী করে উদ্ধার করা যায়, উপায় বলে দিন না।' সাধু বললেন, 'তবে শোন। বাঘের চামড়াকে বললেই, ওটা তোকে ওই রাজার বাড়িতে নিয়ে যাবে। ওখানে রাজকন্যার পণ আছে, যে তাকে পাশা খেলায় হারাতে পারবে, তাকেই সে বিয়ে করবে, যে হেরে যাবে, তাকে সারাজীবন কয়েদখানায় কয়েদি হয়ে থাকতে হবে। রাজকন্যা হারে না, তার কারণ আছে, সেটা ওখানে গেলেই বুঝতে পারবি। তুই এই দুটি ইঁদুরছানা নিয়ে যা, এরাই তোকে জিতিয়ে দেবে।' এই বলে সাধু রাজকুমারকে দুটো ইঁদুরছানা দিলেন। তখন রাজকুমার ইঁদুরছানাদুটো নিয়ে তিন কন্যার সঙ্গে বাঘের চামড়ার ওপর চেপে বসল।

বাঘের চামড়া ওদের রাজকন্যার দেশে নিয়ে গেল। গ্রামের প্রান্তে পৌঁছে রাজকুমার বলল, 'একটি বিনি দরজার বন্ধ মন্দির তৈরি হয়ে থাক এখানে, মধ্যিখানে থাক তিন কন্যা।' বাঘের চামড়াকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলবার সঙ্গে-সঙ্গে তিন কন্যাকে মাঝখানে রেখে বাঘের চামড়াটি একটি বিনি দরজার মন্দির হয়ে গেল। তারপর রাজকুমার রাজবাড়িতে গেল আর রাজকন্যার সঙ্গে পাশা খেলতে বসল। রাজকন্যা তার একটি পোষা বেড়ালের মাথার ওপর জ্বলন্ত প্রদীপ রেখে পাশা খেলতে বসত। রাজকুমার খেলতে বসে বুঝতে পারল, পাশা খেলায় রাজকন্যাকে হারানো সহজ কথা নয়। খেলতে খেলতে যখন সে বুঝতে পারল যে, এবার আর হার ঠেকানো যাবে না, তখন সে ইঁদুরছানাদুটো ছেড়ে দিল। বিড়াল ইঁদুর ধরবার জন্যে দৌড় লাগাল, অমনি প্রদীপ উলটে গেল। রাজপুত্র সুযোগ বুঝে রাজকন্যার চাল বদলে দিল। রাজকন্যা হেরে গেল আর রাজপুত্র জিতে বিজয়ীর হাসি হাসল। তখন ছোটোরাজকুমারের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল। বিয়ের পর রাজকুমার কয়েদখানা থেকে তার দাদাদের বের করে আনল, তারপর সব বন্দি রাজপুত্রদেরও মুক্ত করে দিল।

দিন কতক ওখানে কাটিয়ে ওরা দেশে ফেরার আয়োজন করতে লাগল। ইতিমধ্যে ছোটোরাজকুমার দাদাদের সোনার পাখি সোনার গাছ পেয়ে যাবার কথা জানাল। তিন কন্যার সঙ্গে তার বিয়ের কথাও খুলে বলল। তারপর সে গ্রামপ্রান্তের সেই বিনি দরজার মন্দিরের কাছে গিয়ে বলল, 'বাঘের চামড়া ফিরে এসো।' অমনি মন্দির অদৃশ্য হয়ে গেল। তিন কন্যা বাইরে বেরিয়ে এল। সঙ্গে তাদের সোনার পাখি সোনার গাছ। বাঘের চামড়াও এসে হাজির হল। সমস্ত ব্যাপার দেখে বড়ো দু-ভাই হিংসায় জ্বলতে লাগল। ওরা দেশে ফেরার পথে ছোটোরাজকুমারকে মেরে ফেলে চার কন্যাকে ভাগ করে নেবার ষড়যন্ত্র করতে লাগল আর সোনার পাখি সোনার গাছ নিয়ে গিয়ে বাবার কাছে বাহাদুরি নেবে ঠিক করল। ছোটো নিয়ে গেলে তো ওই সব প্রশংসা পাবে আর রাজত্বও পাবে ও ।

তারপর একদিন বাঘের চামড়ায় চেপে সবাই বেরিয়ে পড়ল। বাঘের চামড়া হড়র হড়র করে চলতে লাগল। রাস্তায় বিশ্রাম করবার জন্যে ওরা এক জায়গায় থামল। সবাই বাঘের চামড়া থেকে নেমে পড়ল। ছোটোরাজকুমার একটু আড়ালে যেতেই বড়ো দু-ভাই একটি কুয়োর ওপর আসন পাতল। দু-জন দু-পাশে কুয়োর পাড়ে বসল। মধ্যিখানে ওরা ছোটোভাইয়ের

জন্যে জায়গা রাখল। ছোটো আসতেই বলল, 'আয় ছোটো, একটু জিরিয়ে নে।' ছোটোরাজকুমার যেই মাঝখানে বসতে গেছে, অমনি সে কুয়োর ভেতর পড়ে গেল। তখন বড়োরাজপুত্রেরা চার কন্যা আর সোনার পাখি সোনার গাছ নিয়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে গেল। রাজা ছেলেদের কাজে খুব খুশি হলেন আর পঞ্চমুখে ওদের প্রশংসা করতে লাগলেন। রাজ্যের লোকজন ভেঙে পড়ল রাজদরবারে সোনার পাখি সোনার গাছ আর চার কন্যাকে দেখবার জন্যে। কিন্তু কন্যাদের দেখে সবাই হতাশ হল। কারণ, ইতিমধ্যে কন্যাদের রূপ মলিন হয়ে গেছে, রং একেবারে কুচকুচে কালো হয়ে গেছে। সবাই ছি ছি করতে লাগল। ছি ছি, রাজকুমাররা আবলুস কাঠের মতো কালো বউ এনেছে! রাজা কিন্তু সোনার পাখি সোনার গাছ পেয়েই খুশি। রাজা বড়োরাজপুত্রদের ছোটোরাজকুমারের কথা জিজ্ঞেস করলেন, ওরা ছোটোর কথা শুনে হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল, 'ওই অকর্মার ঢেঁকিকে দিয়ে কিছু হবে? ও কুয়োর ভেতর পড়ে মরে গেছে।' ছোটোরাজকুমারের ব্যাপারটা কেউ গুরুত্ব দিল না। শুধু ছোটোরানি গোপনে চোখের জল মুছলেন।

ও দি কে ছোটোরাজকুমার কুয়োর ভেতর যেই পড়ল, অমনি সে তার দাদাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বুঝতে পারল। তখন সে জলের ভেতর জল-মাকে অনুনয়-বিনয় করে বলতে লাগল, 'জল-মা, তুমি কুয়োটা জলে ভরে দাও।' জলের ধারা পাড় ছাপিয়ে উছলে পড়ল। তখন ছোটোরাজকুমারও জলের ধারার সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এল। তারপর সে হাঁটতে হাঁটতে একদিন নিজেদের রাজ্যে এসে পৌঁছোল। তক্ষুনি সে রাজদরবারে রাজার সঙ্গে দেখা করল। রাজা তাকে দেখে খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'অকর্মার ধাড়ি, তুই আবার কী জন্যে মুখ দেখাতে এলি? ওরা বলল, তুই কুয়োর ভেতর পড়ে মরে গেছিস, মরে থাকলেই ভালো ছিল।' ছোটোরাজকুমার বলল, 'ওরা ষড়যন্ত্র করে আমাকে কুয়োর ভেতর ফেলে দিয়েছিল। আমিই সোনার পাখি সোনার গাছ এনেছি। ওই চার কন্যা আমার বিবাহিতা স্ত্রী। দাদারা পাশা খেলতে গিয়ে চার কন্যার ভেতর এক কন্যার কাছে হেরে গিয়ে এতকাল কয়েদখানায় ছিল। আমি ওদের উদ্ধার করি রাজকন্যাকে পাশা খেলায় হারিয়ে, আর ওরাই কিনা ফন্দি করে রাজকন্যা আর রাজত্ব পাবার লোভে আমাকে কুয়োর ভেতর ফেলে দিয়েছিল।' রাজা ছোটোছেলের কথা শুনে অবাক হলেন। ছোটো বলল, 'আপনি দাদাদের ডাকুন আর চার কন্যাকে বাইরে নিয়ে আসুন।' রাজার আদেশে বড়োরাজপুত্রেরা আর চার কন্যা বাইরে বেরিয়ে এল। ছোটোকে দেখতেই চার কন্যার সেই কালো রূপ কোথায় গেল, তাদের রূপের ছটায় চারপাশ আলো হয়ে গেল। রাজা একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন। তখন ছোটো বড়োভাইদের বলল, 'দাদা, তোমরা সোনার পাখি সোনার গাছ কোথায় পেলে, কী করে পেলে, আর কয়েকটা নিয়ে এসো তো দেখি?' দাদারা বিপদ গুনল, কেননা ছোটো ওদের সব কথা খুলে বললেও, কোথা থেকে সোনার পাখি সোনার গাছ পেয়েছিল কিংবা তিন কন্যাকেই-বা সে কীভাবে পেয়েছিল, তা বলেনি। ও ওদের শুধু সোনার পাখি সোনার গাছ পাওয়ার কথা বলেছিল, তিন কন্যার সঙ্গে তার বিয়ের কথাও বলেছিল। বড়ো দু-ভাই এই বিপদে ঠেকা দেবার জন্যে কিছু এলোপাথাড়ি কথা বলল। ছোটো বলল, 'তোমরা সব মিথ্যে কথা বলছ। কই সোনার পাখি সোনার গাছ তৈরি করে দাও, তবে বুঝব তোমরা সত্যি কথা বলছ।' তখন ওরা রেগেমেগে বিদ্রূপ করে বলল, 'যেমন তুই অকর্মার ধাড়ি, তেমনি তোর কথা। চাইলেই কি আর সোনার পাখি সোনার গাছ পাওয়া যায়?' তখন ছোটো বলল, 'তোমরা সত্যি-সত্যিই মিথ্যে কথা বলছ, দাদা। সোনার পাখি সোনার গাছ চাইলেই পাওয়া যায়, সত্যি-সত্যিই পাওয়া যায়।' তখন বড়োরাজকুমাররা বলল, 'বেশ তো, তুই অত যখন জানিস তখন সবার সামনে সোনার পাখি সোনার গাছ তৈরি করে দেখিয়ে দে না।' ওরা ভেবেছিল, এহেন অসম্ভব কর্ম করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটোরাজকুমার ওদের বিদ্রূপে মোটেই কান দিল না। ও তিন কন্যাকে সামনে এসে দাঁড়াবার জন্যে বলল। তারপর কেউ কিছু বুঝবার আগেই তলোয়ালের তিন কোপে তিন কন্যার শিরচ্ছেদ করে ফেলল। অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত ওপরে উঠতে লাগল আর সেই রক্ত থেকে আরও তিনটি সোনার পাখি সোনার গাছ হল। সবাই খুব অবাক হল, ব্যাপারটা যে ঘটেছে তাই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর ছোটোরাজকুমার তিন কন্যার কাটা মাথা শরীরের সঙ্গে আবার জুড়ে দিল, অমনি তিন কন্যা বেঁচে উঠল। রাজা এবার বুঝতে পারলেন, ছোটোছেলে ঠিক কথাই বলেছে। তখন রাজা বড়োছেলেদের নিজের রাজত্ব থেকে নির্বাসন দিলেন আর ছোটোরাজকুমারের সঙ্গে চার কন্যার ধুমধাম করে বিয়ে দিলেন আর ওর হাতেই রাজত্ব তুলে দিলেন। ■

প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক-সহ নানা পরীক্ষা হয়। ফল বেরোলে সংবাদপত্রে নাম ওঠে কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রীর। গর্বিত হন বাবা-মা। গৌরব বাড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও। কিন্তু, র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যের পেছনে কী রসায়ন কাজ করে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই-বা কী ভূমিকা? এই সংখ্যায় বলছে ২০১৫ সালের মাধ্যমিকে রাজ্য স্তরে ১৯-তম স্থানাধিকারী (আল-আমীন মিশনের মধ্যে প্রথম)

মহম্মদ হাসিব হোসেন

আমাদের দ্বিতীয় বাড়ি

আল-আমীন মিশনের দশটি বালক শাখা এবং পাঁচটি বালিকা শাখা থেকে মোট সাতশো তেইশ জন ছাত্র-ছাত্রী ২০১৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। এই সাতশো তেইশ জনের মধ্যে ৬৬৫ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে প্রথম হয়েছিল মহম্মদ হাসিব হোসেন। রাজ্য স্তরে তার স্থান ছিল ১৯। ২০১৫ সালে রাজ্যে মোট মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল দশ লক্ষ সাতাশ হাজার ছ-শো নব্বই জন। ৬৮৪ নম্বর পেয়ে রাজ্য স্তরে প্রথম হয়েছিল বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র সুরজিৎ লোহার। প্রথম স্থানাধিকারীর থেকে হাসিব ১৯ নম্বর কম পেয়ে ১৯-তম স্থান অধিকার করলেও দুজনের অঙ্ক আর ভূগোলের নম্বর ছিল একই— ৯৮। হাসিবের বিষয়ভিত্তিক নম্বর আমরা জানব এই লেখাতেই, তার সঙ্গে বিস্তারিত কথোপকথনের মাধ্যমে। আর কত নম্বর পেলে প্রথম দশের মেধা-তালিকায় ঢুকে পড়তে পারত এই মেধাবী ছাত্রটি বা কোন কোন বিষয়ে আরও নম্বর তোলার সুযোগ ছিল, তার মুখ থেকেই আমরা জেনে নেব।

● কোথায় বাড়ি তোমার?

❑ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার উত্তর জগদীশপুর গ্রামে।

● পরিবারে কে কে আছেন?

❑ মা-বাবা আর এক বোন।

● বাবা-মা কী করেন?

❑ বাবা মহম্মদ জাকারিয়া হোসেন বেসরকারি সংস্থায় ছোটো একটা চাকরি করেন।

● আর মা?

❑ মা হালিমা হোসেন গৃহবধূ।

● জমিজমা, চাষবাস আছে নাকি তোমাদের?

❑ না, আমাদের জমিজমা সেরকম নেই। দেড় কাঠা জায়গার ওপর একতলা বাড়ি আমাদের।

● আল-আমীন মিশনে কোন ক্লাস থেকে পড়ছ?

❑ ক্লাস নাইন থেকে।

● তার আগে কোথায় পড়তে?

❑ আমাদের বাড়ি গ্রামে হলেও গ্রামটা উলুবেড়িয়া শহর সংলগ্ন। আমার প্রাথমিক পড়াশোনা, মানে কে জি থেকে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছি উলুবেড়িয়া টাউন মিশন স্কুলে। ওটা খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল ছিল।

● ক্লাস ফাইভ থেকে কি গ্রামেরই স্কুলেই পড়েছ?

স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে হাসিব।

❑ না। মাঝে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি নাইনে ভর্তি হওয়ার আগে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়ে এক বছর পড়েছি মিশনে।

● মানে মিশন একবার ছেড়ে দিয়ে, আবার দ্বিতীয় বার ভর্তি হয়েছিলে নাইনে।

❑ হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।

● ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?

❑ অন্য কোনো কারণে নয়, খুব শরীর খারাপ হত। ভালো লাগত না।

● দ্বিতীয় বার ভর্তির সময় মনে হয়নি আবার সমস্যা হতে পারে?

❑ না। তখন অনেকটা বড়ো হয়ে গেছি। তা ছাড়া আমার দিক থেকে অন্য একটা সমস্যা তৈরি করে ফেলেছিলাম।

● কী সমস্যা, বলা যাবে?

❑ আল-আমীন মিশন ছেড়ে গিয়ে আমি ভর্তি, হয়েছিলাম উলুবেড়িয়া হাই স্কুলে। সিক্স থেকে এইট— এই তিন বছর ক্রিকেট খেলার প্রতি খুব বেশি আসক্ত হয়ে পড়ি। ক্রিকেটার হওয়ার বিরাট স্বপ্ন আমার ছিল না। নিজে যে খুব ভালো ক্রিকেট খেলতাম, তা-ও না। সেই আসক্তি এমন ছিল টিভিতে কোনো খেলা দেখা বাদ যেত না। এমনকী কোনো খেলা না থাকলে পুরোনো দিনের যেসব খেলা টিভিতে দেখায়, সেগুলোও দেখতাম। এইসব করতে গিয়ে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছিল। মনে হল হস্টেলে গেলে পড়াশোনাটা হবে। বাবাও বোঝালেন। তারপরই ফর্ম তুলে ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে পাস করে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আজ যা-কিছু করেছি, ভবিষ্যতে যদি কিছু করতে পারি, তা-ও মা-বাবার জন্যই করতে পারব। আর মিশনের ক্ষেত্রে বলব, আল-আমীন মিশন আমাকে অর্ধেক ছাড়ে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে, এই আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি হাসনেচা ব্রাঞ্চের স্যারদের আন্তরিকতাও ভোলার নয়।

● এবং সেই সিদ্ধান্তেরই ফল আজকের এই সাফল্য।

❑ হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

● বরাবরই কি এমন ভালো রেজাল্ট করে এসেছ?

❑ মোটেও না। ক্লাস ফোরে পড়ার সময় দ্বিতীয় হয়েছিলাম। আর হাই স্কুলে দ্বাদশ হতাম।

● এত ভালো মেধা তোমার, এরকম রেজাল্ট কেন হত?

❑ একটা কারণ তো আগেই বলেছি— ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতি। তা ছাড়া আমার মনে হয় তখন লেখাপড়াটাকে সিরিয়াসভাবে নিতে শিখিনি। পড়াশোনা করতে হয় করছি। তার বাইরে কোনো ভাবনা ছিল না। মিশনে এসে পড়াশোনা করার গতিটাই বদলে গেল।

● কীরকম?

❑ মিশনে পড়াশোনা আর বাড়ির পড়াশোনা করার মধ্যে পদ্ধতিগতভাবে বেশ কিছু ফারাক আছে। বাড়িতে যেমন পড়াশোনা করার জন্য পড়াশোনা করতাম, আর মিশনে ভালো রেজাল্ট করার জন্য পড়াশোনা করে সবাই।

● মিশনের কোন শাখায় পড়াশোনা করেছ?

❑ আমি হাসনেচা শাখায় মাধ্যমিকটা, মানে নাইন-টেন পড়েছি। এখন পড়ছি পাঁচুড় শাখায়।

● হাসনেচা শাখা কি নিজে পছন্দ করে নিয়েছিলে?

❑ না। আমাদের প্রাথমিক পছন্দ ছিল খলতপুর, বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীর যেমন থাকে। স্যার, মানে সেক্রেটারি স্যার হাসনেচা নিতে বলেছিলেন। প্রাথমিকভাবে মন-খারাপ হলেও, পরে এটাই প্লাস পয়েন্ট হয়েছিল।

● কীরকম?

❑ হাসনেচা শাখায় নাইন থেকে টুয়েলভ— এই চারটে ক্লাসের ছাত্র পড়ে। ছাত্র সংখ্যা অন্যান্য অনেক শাখার তুলনায় কম। আমাদের ব্যাচে যেমন আমরা জনা কুড়ি ছাত্র ছিলাম। ফলে এই শাখায় পার্সোনাল কেয়ারটা অনেক ভালো নেওয়া হয়। স্যার ছাত্র সবাই সবাইকে চেনে। আমাদের নিজেদের মধ্যে এমন সম্পর্ক হয়েছিল, মনে হয়নি বাড়ির বাইরে আছি। পরিবারের মতোই ছিলাম। মিশন ছিল আমাদের দ্বিতীয় বাড়ি। মিশনের ছোটো শাখায় এই সুবিধা বাড়তি পাওয়া যায়।

● তুমি তো মিশনের মধ্যে প্রথম হয়েছিলে। তোমাদের শাখার সামগ্রিক রেজাল্ট কেমন হয়েছিল?

❑ আমাদের শাখা গড় রেজাল্টে প্রথম হয়েছিল। ছাত্রদের পাওয়া গড় নম্বর ছিল ৮৭ শতাংশ। আমাদের শাখার কুড়ি জনের মধ্যে ছ-জনের নম্বর ছিল ৯০ শতাংশের বেশি, আর উনিশ জনই ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর নিয়ে পাস করেছিল। মিশনের মাধ্যমিক পাস করা সাতশো তেইশ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম দশ জনের মধ্যে আমাদের শাখার ছিল দুজন।

● তোমার বিষয়ভিত্তিক নম্বর কেমন ছিল?

❑ আমি পেয়েছিলাম বাংলায় ৯০, ইংরেজিতে ৮৭, অঙ্কে ৯৮, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৯, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, ইতিহাসে ৯৪, ভূগোলে ৯৮।

● রাজ্য স্তরের মেধা-তালিকায় আসতে গেলে, মানে প্রথম দশ জনের মধ্যে, তাহলে তোমাকে আরও ৯ নম্বর পেতে হত। তোমার কী মনে হয় এই ৯ নম্বর তুমি পেতে পারতে?

❑ অবশ্যই পেতে পারতাম। বাংলা আর ইংরেজি মিলিয়ে আরও ১০-১২ নম্বর যোগ করা যেত।

● মাত্র ৫-৭ নম্বর বেশি পেলে প্রতি বছরই মিশনের ছাত্র-ছাত্রীরা মেধা-তালিকায় থাকতে পারে। তোমার কী মনে হয়, কেন পাচ্ছে না এই ক-টা নম্বর?

❑ একটা সূক্ষ্ম কারণ হতে পারে যে, মিশনের ছেলেমেয়েরা বাংলা-ইংরেজির ওপর একটু কম জোর দিচ্ছে। তবে আমার মনে হয় মাত্র পাঁচ-সাত নম্বর না পাওয়াটা লাক-ফ্যাক্টর ছাড়া আর-কিছু না। জেতা ম্যাচ যেভাবে একটা টিম হেরে যায়, সেভাবেই নাগালের মধ্যে এসেও বেরিয়ে যায় ভাগ্য সাথ না দেওয়ায়। এটা আমার নিজস্ব ভাবনা।

মিশনে পড়াশোনা আর বাড়ির পড়াশোনা করার মধ্যে পদ্ধতিগতভাবে বেশ কিছু ফারাক আছে। বাড়িতে যেমন পড়াশোনা করার জন্য পড়াশোনা করতাম, আর মিশনে ভালো রেজাল্ট করার জন্য পড়াশোনা করে সবাই।

● ছিলে একদম সাধারণ ছাত্র, সেখান থেকে এত ভালো ফল করলে— কার ভূমিকা সবথেকে বেশি বলে মনে হয়?

❑ আলাদা করে নির্দিষ্ট একজনের ভূমিকার কথা বলা যাবে না, অনেকে আছেন। প্রথমে আমি আমার বাবা-মার কথা বলব। আজ যা-কিছু করেছি, ভবিষ্যতে যদি কিছু করতে পারি, তা-ও মা-বাবার জন্যই করতে পারব। আর মিশনের ক্ষেত্রে বলব, আল-আমীন মিশন আমাকে অর্ধেক ছাড়ে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে, এই আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি হাসনেচা ব্রাঞ্চের স্যারদের আন্তরিকতাও ভোলার নয়। বিশেষ করে দু-জনের কথা বলতে চাই। একজন হাসনেচা ব্রাঞ্চের সুপার সাইফুল ইসলাম। অন্যজন শিক্ষক সেখ তৌফিক আলম। সাবজেক্টের বাইরেও উনি বহু বিষয় শেখাতেন। বহির্বিশ্বের খবর দেওয়া থেকে কীভাবে ইমাজিনেশন পাওয়ার স্পিকিং পাওয়ার বাড়ানো যায়, কী করলে নম্বর বেশি তোলা যাবে, সেসব উনি যত্ন নিয়ে শিখিয়ে দিতেন।

● এখন তো আল-আমীন মিশনের পাঁচুড় শাখায় পড়ছ, ভবিষ্যতে কীভাবে এগোতে চাইছ?

❑ উচ্চ-মাধ্যমিকের পর ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। অল ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স দেব। আইআইটি-তে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছে আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে সুবিধা না হলে ম্যাথ নিয়ে রিসার্চ করব।

● দুটো অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলে তোমার সঙ্গে কথোপকথন শেষ করব। আজকের দিনে দেখো মোবাইল ছাড়া জীবন অচল। অথচ তোমাদের মিশনে ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আছে। খারাপ লাগে না? তোমার কী মনে হয়?

❑ মোবাইল টাইম কিলার। প্রচুর সময় খেয়ে নেয়। মোবাইলের ইচ্ছেমতো ব্যবহার বেশিরভাগ পড়ুয়ার ক্ষতিই করবে। মোবাইল থাকা দরকার, কিন্তু তার ব্যবহার হতে হবে সীমিত। মিশনে মোবাইল পুরোপুরি নিষিদ্ধ নয়। ব্যবহার খুবই সীমিত, মিশন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায়। এটা না করলে পড়াশোনার ক্ষতি হতই।

● আর-একটা অন্য ধরনের প্রশ্ন করি। 'আল-আমীন বার্তা' পড়?

❑ হ্যাঁ, পড়ি।

● কোন বিভাগগুলো পড়?

❑ মিশনের দাদাদের লড়াইয়ের কথা, 'শিখরদেশ' আর বাচ্চাদের সম্পর্কে একটা লেখা থাকে, ওটা।

● 'আমার বাড়ি আল-আমীন' না 'আমাদের পাতা'— কোনটা?

❑ 'আমার বাড়ি আল-আমীন'। 'আমাদের পাতা' নিয়ে আমার একটা কথা আছে।

● কী?

❑ 'আমাদের পাতা'য় মিশনের ছেলেমেয়েদের যেসব লেখা প্রকাশিত হয়, আমার মনে হয় মিশনের ছেলেমেয়েরা আরও বেশি ভালো লিখতে পারে।

● আমাদের দপ্তরে তো আসে না।

❑ এর জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে, যাতে জড়তা কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। ছেলেমেয়েরা নিজেদের আড়াল করে রাখে, সংকোচ কাজ করে। সংকোচটা দূর করতে পারলে সমস্ত কালচারাল প্রোগ্রামেই ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাড়বে।

সেরার পরামর্শ

● প্রত্যেক বিষয়ের টেক্সট বই খুঁটিয়ে পড়তে হবে।

● ইতিহাস, ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়ে, প্রধানত ওই দুটো ক্ষেত্রে, আরও দু-তিনরকম বই ভালোভাবে পড়তে হবে। ইতিহাস, ভূগোল নোট করার প্রবণতা ত্যাগ করে, এমন করে পড়তে হবে, যেন যেভাবেই প্রশ্ন আসুক, কনসেপ্ট দিয়ে উত্তর লিখে দেওয়া যায়।

● দুর্বল জায়গাগুলোতে নিয়মিত চোখ বুলোতে হবে।

● বাংলা সাহিত্য পড়ার প্রবণতা বাড়ালে ভালো হয়।

● উত্তর লেখার সময় সঠিক টেকনিক বা কৌশল অনুসরণ করতে হবে। এমনভাবে লিখতে হবে, যাতে খুব বেশি না লিখেও পরীক্ষককে সন্তুষ্ট করা যায়।

● লেখার স্টাইল, পয়েন্টিং এমনভাবে করতে হবে, যেন খাতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। উত্তর দেখে তৃপ্তি আসে।

● ভূগোল ও জীবনবিজ্ঞানে প্রয়োজনে প্রতিটি প্রশ্নে ডায়াগ্রাম দেওয়ার প্রবণতা ও অনুশীলন রাখতে হবে। ভূগোলে আঁকলে নম্বর অনেকটা বাড়ে।

● শিক্ষকরা যেভাবে উত্তর লিখতে বলবেন, সেভাবে, বিশেষত টু দি পয়েন্ট উত্তর লিখতে হবে।

● পরিশ্রমই শেষ কথা। যেন আফশোস না করতে হয়, আর-একটু পড়লে হত। তবে সারাদিন অপরিকল্পিতভাবে পড়া নয়। পরিকল্পনা করে, পরীক্ষায় কীভাবে প্রশ্ন আসবে, সেই অনুযায়ী পড়তে হবে।

● সর্বোপরি আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং দোওয়া করতে হবে। রেজাল্টে লাক বড়ো ফ্যাক্টর। ■

জলজ প্রাণীদের জগৎ বিচিত্র ও রহস্যময়। নানান স্বভাবের গুণে তারা চিরকালের আকর্ষণের বিষয়। তাদের নিয়ে নিরন্তর মানুষের কৌতূহল। তাদের সম্পর্কে জানবার অন্ত নেই। কেউ কেউ মানুষের নিকট-বন্ধু, কেউ-বা দূরত্বে থেকে যায়। এই পাতায় তাদের কথা।

চোখ দিয়ে যায় চেনা

এন জুলফিকার

আজ বিকেলটা ভারি মনোরম। দুপুরে এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় গরমের সেই ঝাঁজটাও নেই। তাই অফিসের পরে চলে এলাম মাতলার ধারে। নদীতে এখন ভাটার টান। খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে বলে, পরিষ্কার একটা জায়গা দেখে বসে পড়লাম। হঠাৎ দেখি ছোটো সরুমতো কী যেন একটা নদী থেকে উঠে আসছে। খুব কৌতূহলে একটু এগিয়ে গেলাম জলের দিকে। দেখি, ছোটো চকচকে একটা মাছ, কিন্তু তার চোখদুটো ব্যাঙের মতো। আর কত দ্রুতই-না সে উঠে আসছে ডাঙায়। চলার সময় ছোট্ট মাছগুলো তাদের পাখনা দিয়ে ভিজে মাটিতে কী সুন্দর আলপনার মতো এঁকেও ফেলছে। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক জেলেকে ইশারায় ডাকলাম। সে কাছে আসতেই, তাকে ওটা দেখিয়ে বললাম, এটা কী মাছ জান?

— হ্যাঁ বাবু। ওটা তো ঝাঁই মাছ।

— ঝাঁই মাছ! অনেকটা কই মাছের মতো করে ডাঙায় উঠে আসে বলে এমন নাম নাকি?

— তা তো জানিনে বাবু। তবে এখেনে সবাই ওই বলে ডাকে।

— এ-মাছ খায় লোকে?

— হ্যাঁ, খুব স্বাদের মাছ ওটা। তবে জলে থাকলি ধরা খুব কষ্ট।

ঝটপট সেলফোনে ঝাঁই মাছের কয়েকটা ছবি তুলে ফেললাম। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বইপত্র ও ইন্টারনেট ঘেঁটে পেয়ে গেলাম লোনা জলের এই মাছ সম্পর্কে আরও নানান তথ্য। পেরিয়োফথালমাস বর্গের গোবি পরিবারভুক্ত এ-মাছের ইংরেজি নাম 'মাডস্কিপার'। এদের শরীরের অনেকটা টর্পেডোর মতো। সাধারণত ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের খাঁড়ি অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স ও সন্নিকটবর্তী দেশগুলিতে প্রায় চৌতিরিশ প্রজাতির মাডস্কিপারের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়া পশ্চিম আফ্রিকা, জাপানের উপকূলবর্তী অঞ্চল, আরব সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চলেও এদের দেখা মেলে। যখন ইন্টারনেটে এসব দেখছি, বর্ষা এসে পাশে বসল। মাছটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আব্বু, মাছটাকে ভালো করে দেখো।'

— দেখেছি তো। এ হল মাডস্কিপার। আর খাঁড়ি অঞ্চলের লোকজন একে ঝাঁই মাছ বলে।

— না না, আমি তা বলছি না। দেখো, মনে হচ্ছে যেন কোনো পরি এসে ব্যাঙ বানাতে গিয়ে অর্ধেক তৈরি করে তারপর ভুলে গিয়ে অন্য কাজে চলে

আধজলে ঝাঁই মাছ।

গিয়েছিল।

— মন্দ বলিসনি তো! সেজন্যই বোধ হয় জল ও ডাঙা দু-জায়গাতে এরা সমান স্বচ্ছন্দ।

— তা-ই বুঝি!

— হ্যাঁ রে। জানিস তো, জলের চেয়ে মাডস্কিপার ডাঙাতেই বেশি থাকতে ভালোবাসে।

— কিন্তু বাঁচে কীভাবে? অন্যান্য মাছের মতো এদেরও তো ফুলকা আছে, ফুসফুস নেই!

— ঠিক কথা। জলের বাইরে এলে কিছুক্ষণের মধ্যে ওই ফুলকা শুকনো হয়ে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে যায়।

— তাহলে কীভাবে তখন ওরা শ্বাস নেয়?

— আসলে ঝাঁই মাছের কানের পেছনে একটা বিশেষ গহ্বর আছে, আর তাতে জমা থাকে নদীর লোনা জল। ডাঙায় উঠে মাডস্কিপার চোখ ঘোরালেই ওই গর্তের উপর চাপ পড়ে তা ওই সঞ্চিত জলে অক্সিজেনের জোগান দেয় এবং ফুলকাকে ভিজিয়ে দেয়। তাই এটা আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ফলে ফুলকা আবার কাজ করতে শুরু করে।

— বাঃ! ভারি মজার ব্যাপার তো।

— আরও অনেক মজার ব্যাপার আছে।

— কীরকম?

— ফুলকা ছাড়াও ওরা ডাঙায় অন্যভাবে শ্বাস নিতে পারে।

— কীভাবে?

— তখন এরা ত্বক ও মুখের নীচে থাকা সূক্ষ্ম নল (ক্যাপিলারি) ব্যবহার করে দেহে অক্সিজেন সরবরাহ করে। তা ছাড়া জানিস তো, মাডস্কিপারের মাথার ওপরে আছে ব্যাঙের মতো ড্যাবডেবে আশ্চর্য দুটি চোখ। এই উভচর গোত্রের মাছের চোখদুটো মাথার ওপর থেকে উঁচু হয়ে থাকে, ফলে মাডস্কিপার তার চারপাশটা একবারে দেখে নিতে পারে। তা ছাড়া প্রত্যেকটা চোখ এরা আলাদাভাবে ঘোরাতে পারে।

— আলাদাভাবে মানে? এক চোখ ডানদিকে তো অন্য চোখটা বামদিকে, বা একটা ওপরে তো অন্যটা নীচের দিকে, এভাবে?

— ঠিক তা-ই। ফলে একই সময়ে এরা জলের ওপরের ও নীচের দৃশ্য দেখতে সক্ষম। আর এদের চোখদুটো আবার একটা পাতলা স্বচ্ছ আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে, যাতে ডাঙা বা জলে ওঠা নামার জন্য নষ্ট না হয়ে যায়।

— কিন্তু এরা ডাঙায় চলে কী করে?

— মাডস্কিপারের বুকের কাছের পাখনাদুটো বড়ো ও পেশিযুক্ত হওয়ায়, তা পায়ের মতো কাজ করে। ফলে ওই পাখনা ও লেজের সাহায্যে ওরা সহজেই মাটিতে চলাফেরা করতে পারে। আর পিঠের লম্বা পাখনা জলে চলার সময় দাঁড়ের কাজ করে।

— ঝাঁই মাছ সম্পর্কে আরও সব খবর বলো না প্লিজ?

— শোন তাহলে। এদের সাধারণত জলা জায়গা, উপহ্রদ ও নদীর মোহনা অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। বেশিরভাগ সময় এরা ডাঙাতেই থাকে, আর কানের পাশে লোনা জল ভরে নেওয়ার জন্যই মাঝে মাঝে জলে নামে। নদীর আশেপাশের গাছের শিকড়, পাথর ও অন্যান্য বস্তুর ওপর থাকতে এরা বেশি পছন্দ করে। কখনও কখনও এরা নদীতে থাকা গাছের ডালেও উঠে পড়ে। কারণ, দীর্ঘক্ষণ জলে থাকলে এরা মরে যায়। ঝাঁই মাছ বাতাসে প্রায় দু-ফুট পর্যন্ত লাফাতে পারে। প্রজাতি-ভেদে মাডস্কিপার প্রায় তিন থেকে দশ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। মেটে ও হালকা খয়েরি রঙের এই মাছের কারো শরীরে সাদা, কারো-বা হালকা নীল রঙের বেশ কিছু ফুটকি থাকে। যখন মুখ ফোলায় তখন ঝাঁই মাছকে অনেকটা ব্যাঙের মতো দেখায়। একটা পূর্ণবয়স্ক ঝাঁই মাছ প্রতি বর্ষায় প্রায় একশো থেকে দু-শোটি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার সময় মাডস্কিপার নদীর চড়ায় বিশেষ ধরনের গর্ত করে। ভাটার সময় সেই গর্তে জল যাতে পরিমাণমতো থাকে, সে জন্য তারা নিপুণভাবে গর্তটি বানায়। এই গর্তগুলো ইংরেজি 'জে', 'ইউ' বা 'ভি' আকৃতির হয়। আর গর্তের দুটি মুখের একটি থাকে জলের নীচে। জোয়ারের সময় স্রোতের টানে তার কোনো রদবদল হলে, ওরা গর্তটা আবার মেরামত করে নেয়। স্ত্রী-মাছ সেখানে বিশেষভাবে বানানো প্রকোষ্ঠে ডিম পাড়ে। এরপর শত্রুদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পুং-মাছটি ডিম না ফোটা পর্যন্ত সারাক্ষণ সেই ডিম পাহারা দেয়।

— বাহ্! এ তো দারুণ ব্যাপার?

— এদের পোষও মানানো যায়।

— তাই নাকি?

— হুঁ। বিদেশে কেউ কেউ অ্যাকুয়েরিয়ামে পোষে। পোষ মানার পর এরা নাকি তাদের হাত থেকে খাবারও খায়।

— এরা কী খায় আব্বু?

— ঝাঁই মাছ তো মাংসাশী। কীটপতঙ্গ, ছোটো মাছ ও চিংড়ি, কেঁচো এইসবই এদের মূল খাদ্য। জানিস তো, লোনা জলে এরা বাঁচে প্রায় পাঁচ বছর। ভারতীয় উপমহাদেশের ঝাঁই মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম 'পেরিয়োফথালমাস নোভেমরাডিয়াটাস'। এ ছাড়াও ভারতে আরেক প্রজাতির ঝাঁই মাছ দেখা যায়, তার বিজ্ঞানসম্মত নাম 'পেরিয়োফথালমাস ক্রিসোসপিলোস'। এদের গায়ে সোনালি-হলুদ ফুটকি থাকে। তবে সবচেয়ে মজার কথা কী জানিস, ঝাঁই মাছ জলে কম দেখে, কিন্তু ডাঙায় উঠলে এরা সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায়। ■

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদ শিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা। লিখছেন

ফরিদা নাসরিন

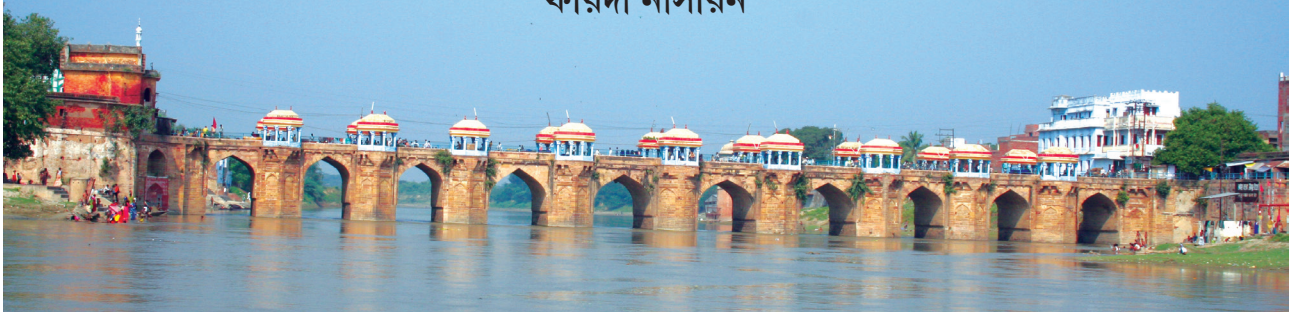

আকবরি ব্রিজ

ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ব্রিজ কোনটি, যেটি এখনও ব্যবহৃত হয়? নির্দিষ্ট করে জানা যাচ্ছে না। তবে সাল-তারিখ ঘেঁটে এখনও পর্যন্ত যেটুকু খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে জৌনপুরের আকবরি ব্রিজই সবচেয়ে পুরোনো।

এককথায় আকবরি ব্রিজ হলেও একাধিক নাম রয়েছে সেতুটির। মুনিম খান ব্রিজ, জৌনপুর ব্রিজ, শাহি ব্রিজ, মোগল ব্রিজ ইত্যাদি।

জৌনপুর কোথায় আর সেতুটাই-বা কত পুরোনো?

উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে গোমতী নদীর তীরে জৌনপুর একটি প্রাচীন শহর। সম্ভবত একাদশ শতকে শহরটির পত্তন হয়। গোমতীর বন্যায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫৯ সালে শহরটি ফের গড়ে তোলেন।

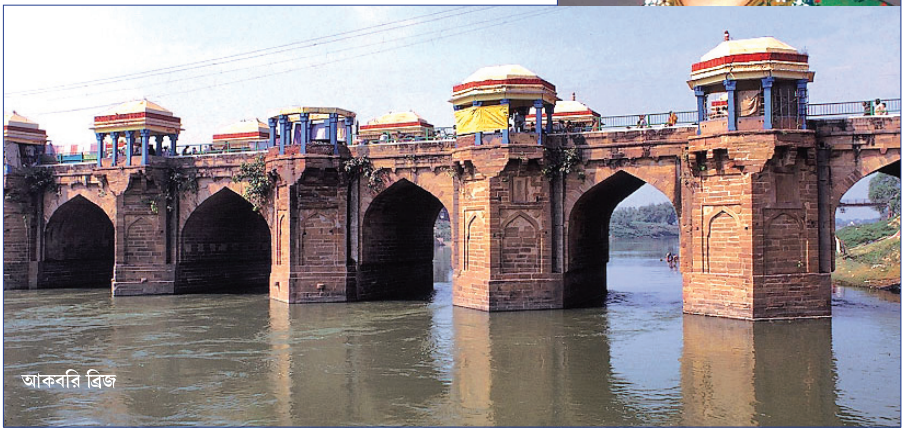

আকবরি ব্রিজ

একটি দুর্গও সেখানে নির্মাণ করেন, যেটি আজও রয়েছে। এরপর দিল্লির বিরুদ্ধে গিয়ে জৌনপুরকে রাজধানী করে স্বাধীন একটি মুসলমান সাম্রাজ্যের পত্তন হয় ১৩৯৪-এ, যেটি ইতিহাসে শারকি রাজবংশ নামে খ্যাত। ১৪৭৯ সাল পর্যন্ত এই রাজবংশ রাজত্ব করার পর নানা হাতফেরতা হয়ে জৌনপুর ফের দিল্লির অধীনে পাকাপাকিভাবে যায় মোগল সম্রাট আকবরের আমলে, ১৫৫৯ সালে। প্রধানমন্ত্রী মুনিম খানকে তিনি যৌনপুরের সুবেদার করে যখন পাঠান (১৫৬৪ সাল), তার চার বছর পর সম্রাটের নির্দেশ আসে গোমতী নদীর ওপর এক সেতু তৈরির। ১৫৬৮-তে মুনিম খান সেতুর কাজ শুরু করেন। শেষ করতে সময় লাগে চার বছর। সেতুটির পরিকল্পনা করেছিলেন আফগান স্থপতি আফজল আলি। সম্পূর্ণ খিলান দিয়ে তৈরি ব্রিজটির সাংঘাতিক ক্ষতি হয় ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে। সাতটি খিলান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের মেরামতিতে ব্রিজটি আবার আগের রূপ ফিরে পায়। সাড়ে চারশো বছরের প্রাচীন সেই সেতুর ওপর আজও গাড়ি, মানুষ পারাপার করছে।

১৫৬৮-তে মুনিম খান আকবরি ব্রিজের কাজ শুরু করেন। শেষ করতে সময় লাগে চার বছর। সম্পূর্ণ খিলান দিয়ে তৈরি ব্রিজটির পরিকল্পনা করেছিলেন আফগান স্থপতি আফজল আলি। ব্রিজটির সাংঘাতিক ক্ষতি হয় ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের মেরামতিতে ব্রিজটি আবার আগের রূপ ফিরে পায়। সাড়ে চারশো বছরের প্রাচীন সেই সেতুর ওপর আজও গাড়ি, মানুষ পারাপার করছে।

ডাকঘরের ইতিকথা

অজস্র কবিতা, গান, নানা বিষয়ে প্রবন্ধ, শ দেড়েক ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অজস্র চিঠি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, আশি বছরের জীবনে নানা জনকে তিনি লিখেছিলেন প্রায় আঠারো হাজার চিঠি! এত চিঠি কি দুনিয়ায় আর কেউ লিখেছেন? জানি না। সেসব চিঠিতে দেশ, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, সংগীত সম্বন্ধে নিজের চিন্তা যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনই সাহিত্যগুণে ভরপুর তাঁর চিঠিগুলি। এ ছাড়াও তাঁর বহু রচনায় চিঠি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'পোস্ট মাস্টার' নামে একটি গল্পে নিঃসঙ্গ জীবনের ছবি যেমন এঁকেছেন, তাঁর 'ডাকঘর' নাটকটি বহু মর্মবিন্দুর আবিষ্কারে অমর হয়ে রয়েছে।

এত কথা কেন লিখলাম? আমরা জানব ভারতীয় ডাক ব্যবস্থার ইতিহাস, যে-ডাক ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথের হাজার হাজার চিঠির মতো কোটি কোটি চিঠি প্রাপকের ঠিকানায় নিত্য পৌঁছে দিচ্ছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ডাক ব্যবস্থা ভারতের, যার এখনকার নাম 'ইন্ডিয়া পোস্ট'। এটি পরিচালনা করে ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অব কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি।

যদিও ষোড়শ শতকেই ভারতে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন শের শাহ সুরি, সে-ব্যবস্থা ছিল মূলত রাজকার্যের জন্য। আধুনিক পোস্ট অফিসের গোড়াপত্তন করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর প্রথম জেনারেল পোস্ট অফিসটি উদ্‌বোধন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস, কলকাতায়, ১৭৭৪ সালের মার্চ মাসে। ১৭৭৬ সালের মধ্যে চেন্নাই এবং মুম্বাইয়ের পোস্ট অফিস চালু হয়ে যায়। বাড়তে বাড়তে সেই পোস্ট অফিসের সংখ্যা ২০১১ সালে দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশো ছেষট্টিটি। এর মধ্যে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার চল্লিশটি পোস্ট অফিস গ্রামাঞ্চলে, পনেরো হাজার আটশো ছাব্বিশটি শহরে।

পৃথিবীর উচ্চতম পোস্ট অফিসটি রয়েছে ভারতে, হিমাচল প্রদেশের হিক্কিমে। উচ্চতা পনেরো হাজার পাঁচশো ফুট। প্রথম ডাকটিকিট ছাপা হয় সিন্ধুপ্রদেশে, সেখানকার কমিশনার বার্টলি ফ্রেরের উৎসাহে, ১৮৫২ সালের ১ জুলাই। এটিই ছিল এশিয়ার প্রথম আঠা লাগানো ডাকটিকিট।

১৮৫৮ সালে কোম্পানির হাত থেকে শাসনক্ষমতা ব্রিটেনের রাজশক্তির হাতে গেলে ডাকবিভাগটিও সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ডাকবিভাগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। একইসঙ্গে বিভাগটির আধুনিকীকরণ হতে থাকে। যেমন পোস্টাল ইনডেক্স নাম্বার চালু হয় এই সেদিন, ১৯৭২-এ।

বিশাল এই দপ্তরটি আপাতভাবে মনে হয় লোকসানে চলছে। ব্যাপারটা আদৌ তেমন নয়। ২০১০-১১ আর্থিক বছরের একটা হিসেব পাওয়া যাচ্ছে। সে-বছর মোট খরচ হয় তিন হাজার পঁচাত্তর কোটি টাকা আর আয় হয়েছিল ছয় হাজার ন-শো বাষট্টি কোটি তিন লক্ষ টাকা। বলতে হবে, লাভটা খারাপ নয়। তবু আমাদের পোস্ট অফিসগুলোকে কেমন যেন মলিন লাগে!

ডাকবাক্স।

ভারতীয় রেল

পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ কোন দেশের? ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার, সংক্ষেপে ইউএসএ-র— যে-দেশটিকে আমরা আমেরিকা নামে চিনি। তাদের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য দু-লাখ পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার। এ-ক্ষেত্রে ভারতীয় রেল চতুর্থ। ভারতে রেল ট্র্যাকের মোট দৈর্ঘ্য এক লাখ পনেরো হাজার কিলোমিটার হলেও ট্রেন চলে পঁয়ষট্টি হাজার কিলোমিটার রেলপথে। দ্বিতীয় রাশিয়া আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে চীন।

তবু নানা কারণে ভারতীয় রেল এক আশ্চর্য প্রতিষ্ঠান। কত নদী পাহাড় গ্রাম সুড়ঙ্গ ঝরনা মরুভূমি পার হয়ে যে যায় আমাদের দেশের ট্রেন, কত শহরের ভেতর দিয়ে পেরিয়ে যায় আর সেইসব শহরের

বর্ণ-গন্ধ-কোলাহল লেগে থাকে ট্রেনের গায়ে, কল্পনা করাই অসম্ভব। অনেকেই জানি, সেই ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল বোরি বন্দর বোম্বাই থেকে থানের একুশ মাইল দূরত্ব পেরিয়ে ভারতীয় রেলের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন সেই রেল কোম্পানির নাম ছিল 'গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে'। দু-জন ভারতীয় ছিলেন তার ডিরেক্টর— জামশেদজি জিজিবয় এবং নানা শংকরশেঠ। তার বছর খানেক পর পূর্ব ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করে হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত, ১৮৫৪ সালের ১৫ অগাস্ট।

পাহাড়ি পথে ভারতীয় রেল।

কিন্তু শুরুর আগেরও শুরু আছে। ভারতে প্রথমে যে-ট্রেন চলেছিল, সেটি ছিল মালবাহী। চাষিদের সেচের জন্য গঙ্গা আর যমুনার মাঝে একটি ক্যানেল কাটার সময় বিপুল পরিমাণ মাটি বইবার জন্য চালু হয় ওই ট্রেন, যেটি বর্তমান উত্তরাখণ্ডের রুরকি থেকে পিরান কালিয়ার পর্যন্ত দশ কিলোমিটার পথে চলা শুরু করেছিল সেই ১৮৫১ সালের ২২ ডিসেম্বর।

প্রথম দীর্ঘতম রেলপথটি চালু হয় ১৮৭০-এর ৭ মার্চ, তৎকালীন বোম্বাই থেকে এলাহাবাদ হয়ে হাওড়া পর্যন্ত। আমরা কি জানি, এই রেলপথটি বিখ্যাত ফরাসি লেখক জুল ভের্নকে প্রভাবিত করেছিল 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ' লিখতে!

প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেনটি চলে ১৯২৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি, বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে কুরলা পর্যন্ত ষোলো কিলোমিটার পথে। স্বাধীনতার পর দেশভাগের ফলে ৪০ শতাংশ রেলপথ পড়ে পাকিস্তানে। তারপর স্বাধীন ভারত সরকার বিয়াল্লিশটি ব্যক্তিগত রেলওয়ে কোম্পানি, যার বত্রিশটি ছিল বিভিন্ন করদ রাজ্যের, সব এক ছাতার তলায় নিয়ে আসে। নাম রাখা হয় 'ভারতীয় রেল'।

সেদিনের সেই আদি যুগের স্টিম ইঞ্জিন রূপ বদল করে কবে যেন উঠে গেছে? সালটা ছিল ১৯৮৫। তার দু-বছর পর কমপিউটার-চালিত আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয় ১৯৮৭ সালে।

এত যে দীর্ঘ রেলপথ, কত রেলস্টেশন রয়েছে ভারতে? ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত সংখ্যাটি ছিল সাত হাজার একশো বারোটি। এইসব রেলস্টেশনেরও অনেক মজার তথ্য রয়েছে। যেমন, ওড়িশার আইআর বা ইর (IR) স্টেশনের নামটিই সবচেয়ে ছোট্ট। লম্বা নামটি কিন্তু বেশ লম্বা— শ্রীভেঙ্কটনরসিংহমরাজুভেরিয়াপেট! এই স্টেশনটি রয়েছে তামিলনাড়ুতে।

সবচেয়ে ব্যস্ত স্টেশন বলা হয় লখনউকে। দিনে চৌষট্টিটি ট্রেন চলাচল করে। দাদার হচ্ছে শহরতলির সবচেয়ে ব্যস্ত স্টেশন। শিয়ালদহ আর-একটি ব্যস্ত স্টেশন, যেটি দিয়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ যাতায়াত করেন। দেশের একমাত্র স্টেশনটি রয়েছে আমাদের রাজ্যেই, যেখানে একই সঙ্গে ব্রডগেজ, ন্যারোগেজ এবং মিটারগেজ রেলপথ রয়েছে। সেটি শিলিগুড়ি। আর পৃথিবীর উচ্চতম স্টেশন ঘুম, তাও আছে এই রাজ্যে। শুধু দেশের মধ্যেই নয়, পৃথিবীর দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্মও রয়েছে এই রাজ্যে, খড়্গপুর স্টেশনে, দু-হাজার সাতশো তেত্রিশ ফুট।

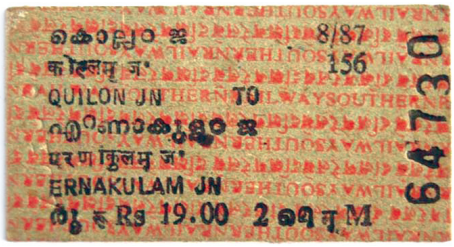

দৈনিক দু কোটি তিরিশ লাখ যাত্রীবহনে সক্ষম ভারতীয় রেল বছরে মালবহন করে ১০৫৮.৮১ মিলিয়ন টন। জটিল আর বিরাট এই রেলের বাৎসরিক আয় কত? ২০১৪-১৫ সালের হিসেবে আয় হয়েছে ষোলোশো চৌত্রিশ বিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে যাত্রীবহন থেকে এসেছে ৪০২.৮০ বিলিয়ন টাকা।

দৈনিক দু কোটি তিরিশ লাখ যাত্রীবহনে সক্ষম ভারতীয় রেল বছরে মালবহন করে ১০৫৮.৮১ মিলিয়ন টন। জটিল আর বিরাট এই রেলের বাৎসরিক আয় কত? ২০১৪-১৫ সালের হিসেবে আয় হয়েছে ষোলোশো চৌত্রিশ বিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে যাত্রীবহন থেকে এসেছে ৪০২.৮০ বিলিয়ন টাকা।

কোনো বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মিসংখ্যার হিসেবে পৃথিবীর সপ্তম স্থানে রয়েছে ভারতীয় রেল। ২০১৩ সালের হিসেব অনুযায়ী তেরো লাখ ছিয়াত্তর হাজার মানুষ সরাসরি কাজ করেন এই বিশাল সংস্থায়। পরোক্ষ কর্মিদের ধরলে সংখ্যাটি যে আরও বিরাট হবে, আন্দাজ করতে পারি।

এতসব আয়োজনের ফলেই আমরা চলন্ত ট্রেনে জানালার ধারটিতে চুপটি করে বসে অজানা তেপান্তরে ছুটিয়ে দিতে পারি মন, যে-তেপান্তর কবে যেন পেরিয়ে গেছে ভারতীয় রেল! ■

শিখরের কাছাকাছি যারা, যারা উজ্জ্বলতর জীবন-জীবিকার জগতে একদিন পৌঁছোবে অবশ্যই— সেই সম্ভাবনাময়দের নিয়ে এই পাতা। লিখেছেন

সেলিম মল্লিক

সূর্যোদয়ের পাখি

গিরিসংকটের পথে যেমন কোথাও কোথাও পাহাড়ি লতার ফুল আলোর নিশান হয়ে ফুটে থাকে, তেমনি সমাজসংকটে সবচাইতে অবজ্ঞাত স্তর থেকেও ধীরে ধীরে মন ও বুদ্ধির দ্যুতি ফুটতে দেখা যায়। সে-জিনিস বিদ্যুতের চাইতেও তীক্ষ্ণ আর পবিত্র। সে-জিনিস বিলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করে অস্তিত্বকে পুনর্জাগরণে উজ্জ্বল করে। সব দেশে সব কালে সমস্ত জাতির জীবনে এমনটা ঘটে বলে অন্ধকারের পাতালে তলিয়ে যেতে যেতে আবার নিমজ্জমান জনগোষ্ঠী উঠে দাঁড়ায়, উড়াল দেয় সভ্যতার শিখর স্পর্শ করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। পেছনে থাকে মহৎ প্রেরণার ভূমিকা, সঙ্গে থাকে মহত্ত্বের গভীর করুণা। থাকে শত শত অন্তরের আর্তি ও প্রার্থনা। আর সামনে চিরাগ হাতে এগিয়ে চলে যারা, তারা পিছিয়ে-পড়াদের কচিকাঁচা ছেলেমেয়েদল। দুর্ভাগ্যের মতো ঝঞ্ঝাবাতাস বাতি নিভিয়ে দিতে চায়, জ্যোতির্ময়ের আশীর্বাদের মতো এরা বুক দিয়ে আগলে রক্ষা করে তাকে। এভাবে আরও আরও এগিয়ে চলে তারা। এভাবে মূক মুখে ভাষা ফুটে ওঠে, এভাবে ম্লান বুকে আশার সঞ্চার ঘটে।

জেসমিন নাহার খাতুন।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ শিক্ষাকে চিরাগ করে, যেভাবে পাড়ি জমিয়েছে নবজীবনের পথে। নিশ্চিত জানি, এই পথে একদিন তার ক্রমমুক্তি ঘটবে, হবে হবে একদিন শাশ্বত সূর্যোদয়। চলেছে হাজার হাজার সূর্যোদয়ের পাখি শিস দিতে দিতে। এইসব সোনার পাখিদের বৃহত্তর অংশ আশ্রয় পেয়েছে যে-সোনার গাছে, তার নাম আল-আমীন মিশন। এখানে আমরা চারজন ছাত্র-ছাত্রীর কথা বলব, যারা এই জাগরণের নবযাত্রী। আল-আমীন প্রতিনিয়ত যাদের শুনিয়ে চলেছে যাত্রাপথের আনন্দগান। এরা আল-আমীনের এখনকার পড়ুয়া। এদের স্কুলজীবনে আল-আমীন ঝিনুকের মতো, আর আল-আমীনের কাছে এরা সুদূরের নীল নক্ষত্রের চোখ থেকে ঝরে-পড়া বহু কষ্টের অনেক কান্নার অশ্রুবিন্দু, ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে মহামূল্য মুক্তা। চাঁদ নয়, যাদের বিকাশে বিভাসে উদ্‌যাপিত হবে আমাদের নিশান্তিকা।

আসুন, আমরা জেসমিন নাহার খাতুনের কথা শুনি। 'তোমার বয়স কত?' 'আমার জন্মসাল ১৯৯৯, মানে বয়স সতেরো বছরের কিছু বেশি হবে।' 'কোন ক্লাসে পড়ছ?' 'সামনের বছর ২০১৭-তে উচ্চ-মাধ্যমিক দেব। এখন টুয়েলভে পড়ছি।' আল-আমীনের মেমারি শাখার এই ছাত্রী ক্লাস ফাইভ থেকেই এই মিশনে পড়ছে। দশ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে খলতপুর শাখায়। ২০১৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। পেয়েছিল ৬৪৩ নম্বর। কথায় কথায় ইংরেজি বলা ছিপছিপে গড়ন বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখের জেসমিনকে এত সপ্রতিভ লাগছিল, কে বলবে, সে উঠে এসেছে একটা পিছিয়ে-পড়া সমাজ থেকে। সে উঠতে চাইছে আরও ওপরে। যে-উচ্চতায় উঠতে পারলে পৃথিবীর জনজীবনের সমস্ত চূড়াগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে, আর সেই চূড়াগুলো থেকে দেখা যাবে তার অবস্থানকেও। জেসমিনের কথায় ফুটে উঠল তার অভিপ্রায়— স্বপ্ন কখনও ছোটো হতে নেই, মানুষ তবে আরও ছোটো হয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে। এমন ধারণায় যার বিশ্বাস, সে ভবিষ্যতে সত্যি-সত্যি বড়ো একটা স্বপ্নের মতো প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াবে। নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানার পাটপুকুর গ্রামের এক অতি সাধারণ পরিবারে তার জন্ম। মা আফরুজা বৈদ্য সাদামাটা গৃহবধূ। বাবা ফরিজুল হক বৈদ্য বাড়ির কাছেপিঠের একটি মাদ্রাসার মৌলানা। সামান্য উপার্জন। কিন্তু নিজের চার মেয়েকে আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত করানোর প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়। তিনি ভাবেন, সহবত আর সম্ভ্রমের ভেতর দিয়ে তাঁর মেয়েরা সমসাময়িক দুনিয়ার দরবারে গিয়ে হাজির হবে এবং নিজেদের স্বাক্ষর রাখবে। ছায়াবৃতা নয়, কর্মে ও চেতনায় হয়ে উঠবে সত্যিকারের পরিপূর্ণ মানুষ। জেসমিনের কাছে জানতে চাইলাম, 'তোমার বাবার যে-আশা, তা তো তুমি পূরণ করবে নিশ্চয়?' তার সপাট জবাব, 'শুধু আব্বা কেন, মা, দিদি, বোন আর আমিও তো তা-ই আশা করি।' 'এই বিষয়ে তোমার সবচাইতে সহায়ক কে?' 'আমাদের মিশন, আল-আমীন মিশন সবরকমভাবে সফল হওয়ার জন্যে যে-যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলছে, এখানে পড়তে না এলে, তা ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে

সমীরণ সেখ।

আব্বা-মার প্রেরণা আর আল্লার মেহেরবানি না থাকলে এক-পাও এগোতে পারতাম না।' 'এখন তো মা-বাবাকে ছেড়ে আছ।' 'হ্যাঁ, তার জন্যে মাঝে মাঝে খুব মনখারাপ করে, বিশেষ করে সন্ধ্যে বেলা আর রাত্রে ঘুমোতে গিয়ে। আমি একটু বেশিরকম কল্পনাপ্রবণ, রাতের আকাশের তারাদের দেখি আর ভাবি, একটা তারা আমার আব্বা, একটা মা, খুব ছোটো তারাটিকে বোন মনে হয়। তখন বাড়ির জন্যে অস্থির লাগে।' কিন্তু এই উতলা ভাবকে সে বেশিক্ষণের জন্যে আসকারা দেয় না, সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে কঠোরভাবে লেখাপড়ার চিন্তার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। কারণ, তাকে যে ডাক্তার হতে হবে, যথার্থ চিকিৎসা দিয়ে মানুষকে সুস্থ করতে হবে, সে দেখতে পাচ্ছে, আর্ত আর রুগ্‌ণ অগণিত মানুষ তার জন্যেই যেন অপেক্ষা করে আছেন। উৎসাহিত হলাম এই জেনে, ভবিষ্যতে সে সঠিক অর্থে রাজনীতি করতে চায়, কারণ, জীবিকা ছাড়াও সময়ের প্রতি আমাদের কিছু দায় আছে। তার ভাবনা, মহৎ রাজনীতি দিয়ে সেই দায় পালন সম্ভব। জেসমিন ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালোবাসে, রুচিশীল গান আর ছায়াছবির প্রতিও তার গভীর ভালোবাসা। ওই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জেসমিনের পায়ে পায়ে সীমা ছাড়িয়ে অসীমার দিকে এগিয়ে চলেছে পিছিয়ে-পড়া সমাজের ছেলেমেয়েরা।

হাদিসা হালদার।

তাকে যে ডাক্তার হতে হবে, যথার্থ চিকিৎসা দিয়ে মানুষকে সুস্থ করতে হবে, সে দেখতে পাচ্ছে, আর্ত আর রুগ্‌ণ অগণিত মানুষ তার জন্যেই যেন অপেক্ষা করে আছেন।

এবার আমরা দেখব আল-আমীনের মেদিনীপুর বালক শাখার দ্বাদশ শ্রেণির সমীরণ সেখের ছাত্রজীবন। এর বাড়িও নদীয়া জেলায়। ঠিকানা তেহট্ট থানার কুলগাছি গ্রাম। সমীরণ ক্লাস এইটে মিশনে ভর্তি হয়। প্রথম থেকেই মেদিনীপুর শাখাতে পড়ছে। ২০১৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৬০৪ নম্বর পেয়েছিল। সমীরণের নিজের জবানিতে শোনা গেল, 'আব্বা তো দিনমজুরি করে আর সামান্য জমিতে চাষের নামমাত্র আয়ে সংসার চালান। মিশনে না এলে কবে কোন ছেলেবেলা লেখাপড়ার পাট চুকে যেত।' মিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় দেখি তার চোখ ছলছল করছে। এ-সময় যে-কাউকে সবচাইতে নিবেদিত মনে হয়, সমীরণকেও তেমনটা মনে হচ্ছিল। তার দাদু সাপের কামড়ে মারা যান, তখন তার বাবা খুব ছোটো। ফলে সমীরণের বাবা আজাদ সেখের পড়া বলতে ফোর পর্যন্ত। মা মেহেন্নেগা বিবি লেখাপড়া করেছেন সাত ক্লাস অবধি। তাই, বলা যেতে পারে, সমীরণ তাদের পরিবারের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। ২০১৭ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক দেবে। তার প্রাথমিক সংকল্প ডাক্তার হয়ে অসুস্থ মাকে নিজের হাতে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলা। সে ভালোবাসে ফুটবল খেলতে আর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি পড়তে। তার ভালো লাগে ঘুরে বেড়াতে। দেশে দেশে মানুষের কীর্তি এবং নিসর্গপ্রকৃতির শোভা দেখবার জন্যে সে ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে। সে ভাবে, এর মধ্যে দিয়ে স্রষ্টার মহিমাকে কিছুদূর অনুভব করা সম্ভব। আশা করি, সমীরণ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, তার এ-স্বপ্নও পূর্ণ হবে একদিন।

আসুন, এখন শুনি মেমারি শাখার বারো ক্লাসের ছাত্রী হাদিসা হালদারের কথা। হাদিসার বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর থানার বাইশহাটা গ্রামে। বাবা হারুন রশিদ হালদার পেশায় রিকশাচালক। মা সাহারা বানু বিবি মারা গেছেন হাদিসার দেড় বছর বয়সের সময়। মেধা থাক আর না-থাক, এমন নিঃসহায় মেয়ের তো শৈশবেই হারিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি, কারণ, এখনও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কোথাও সহৃদয়তা বেঁচে আছে। হাদিসার জীবনে সেই আন্তরিক আশ্রয় এখন আল-আমীন মিশন। নয় ক্লাসে মেদিনীপুর বালিকা শাখায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ২০১৫ সালে মাধ্যমিক দিয়ে ৫৯৯ নম্বর পেয়েছিল। মিশন তার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে। হাদিসার দায়িত্ব শুধু অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে যাওয়া। তাকে যে বিজ্ঞানী হতে হবে। বাঙালির বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে স্বভাবত অন্তর্মুখী হাদিসা হালদার রেখে যেতে চায় তার গভীর নির্জন স্বাক্ষর।

চার রত্নকথা শেষ করব যার কথা বলে, সে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের আঙারিয়া গ্রামের দিলদার খান। আল-আমীন মিশনের মেদিনীপুর বালক শাখার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। দিলদারের বাবা একরামুল খান অতি সাধারণ কৃষিজীবী মানুষ, মায়ের নাম সানজিদা খাতুন। তার দাদু অভাবের কারণে ছেলেদের লেখাপড়া করাতে পারেননি, তাই ছেলের ঘরের ছেলেকে পড়িয়ে বহুকালের মনস্তাপ ঘোচাতে চেয়েছেন। কিন্তু সেজন্যেও চাই অনেক টাকা, আজকাল পড়াশোনা করানোর যা খরচ! এসব ক্ষেত্রে এইরকম মানুষজনের স্বপ্নের পতিত জমিনে আবাদ করতে সাহস জোগায় আল-আমীন মিশন। আবাদ করলে সেখানে সত্যি-সত্যি সোনা ফলে। ফলেওছে। ক্লাস সেভেনে দিলদার মিশনের মেদিনীপুর বালক শাখায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ২০১৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। পেয়েছিল ৫৯০ নম্বর। ২০১৭ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক দেবে। আমাদের বিশ্বাস, তার ক্রম-উত্তরণ একদিন-না-একদিন জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠা দেবেই। কিন্তু এর চাইতেও লক্ষ করার বিষয়, তার চরিত্রের বিষয়বৈভবের প্রতি অনীহার দিকটি। একটু আগে এরই সহপাঠী সমীরণ সেখের মধ্যে দেখেছি গতির প্রতি অনুরাগ। গতিই তার কাছে জীবনের অন্য নাম। আর দিলদার শান্ত মন্থর নিঝুম স্বভাবের। একা একা স্থির চারপাশের সবকিছু দেখতে বুঝতে তার ভালো লাগে। তার জীবনের উদ্দেশ্য সাধারণ একটা আটচালা বাড়িতে নিমগ্ন থেকে এই মানবজনম কাটিয়ে দেওয়া। পিছিয়ে-পড়া সমাজের এই মেধাবী ছাত্র কী করে জানল— দীনতা অন্তিম গুণ। আজকাল বিলাসব্যসনের দিনে এমন নিরাভরণ শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার পড়ুয়া পাওয়া আল-আমীন কেন, যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরম ভাগ্যের। ■

দিলদার খান।

আল-আমীনের নানা আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে লেখাপড়া করছে দুঃস্থ পরিবারের অজস্র মেধাবী ছেলেমেয়েও। আল-আমীনের আশ্রয় না পেলে হয়তো হারিয়ে যেত তারা। কেমন আছে এই কচিকাঁচারা, যারা একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আল-আমীনের বিশ্বাস? নিজেই বলছে বাবনান ক্যাম্পাসের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী

রুকাইয়া খাতুন

আল-আমীনে লেখাপড়ার পদ্ধতি আলাদা

● কোন ক্লাস তোমার?

❑ সেভেন। গত বছর ক্লাস সিক্সে ভর্তি হই আল-আমীনে।

● কোথায় বাড়ি তোমাদের?

❑ সংগ্রামপুর। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। ডায়মন্ড হারবার লাইনে। স্টেশন থেকে দশ থেকে পনেরো মিনিটের হাঁটাপথ।

● আব্বা-মায়ের নাম বলো। তাঁরা কী করেন?

❑ আব্বা সুজন মোল্লা। মা আরজিনা বিবি। হার্টের অসুখ আব্বার। কাজকর্ম কিছু করতে পারেন না। মা কাঁথা সেলাই করেন। ওতেই কোনোভাবে সংসার চলে।

● তোমরা কয় ভাই-বোন?

❑ তিন। আমি বড়ো। তারপর বোন, সে ক্লাস ফোরে পড়ে, তারপর ভাই। সে ছোট্ট, ক্লাস ওয়ানে।

● আব্বা কিছু করেন না, মায়ের কাঁথা সেলাইয়ের উপার্জনে যে সংসার চলে, মানে চলে না, সেই সংসারে তোমাদের লেখাপড়া চলছে কীভাবে?

❑ আমাদের তিন ভাই-বোনদের লেখাপড়ার খরচ যেটুকু লাগে, সব জুগিয়ে যাচ্ছেন আমাদের নানা।

● নানা কী করেন?

❑ ফেরি করেন। ওই বাড়ি-বাড়ি পুরোনো কাগজ কেনা বা এরকম কাজ।

● চূড়ান্ত অভাবের সংসারে এমন স্বপ্নই-বা দেখলে কী করে যে, আল-আমীন মিশনের হস্টেলে থেকে তুমি পড়বে? ভর্তি হলে কী করে?

❑ প্রতি ক্লাসে আমি ফার্স্ট হতাম। সবাই বলত, মেয়েটা বুদ্ধিমতী। তাই আমাকে আল-আমীনে পড়াবে। আমার খালাতো ভাই নয়াবাজে পড়ে, আর খালাতো বোন পড়ে পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাসে। দু-জনেই ভর্তি হয়েছিল ক্লাস ফাইভে, আমার এক বছর আগে। ওদের দেখেই মায়ের আশা হয়েছিল যে, হয়তো সম্ভব। ভর্তির পরীক্ষায় বসেছিলাম ডায়মন্ড হারবার হাই মাদ্রাসায়। নাম উঠলে আমার নানা আমাকে আর মাকে নিয়ে খলতপুরে যান। সেখানে

ইন্টারভিউয়ে সেক্রেটারি স্যার নানার আর মায়ের মুখে পরিবারের সব কথা শুনে ফ্রি-শিপে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। মাসে মাত্র দু-শো নব্বই টাকা লাগে থাকা খাওয়া আর পড়ার জন্যে। এই সুবিধাটা না-পেলে আমার লেখাপড়াই হয়তো হত না। ওই টাকাটাও মায়ের দেওয়ার সামর্থ্য নেই। নানা দেন।

● এর আগে তুমি কোথায় পড়তে?

❑ আমাদের ওখানে সপ্তগ্রাম কিশলয় মিশনে। ওখানে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি। বাড়ি থেকে আধ ঘণ্টা হেঁটে যেতে হত।

● কেন? তোমাদের ওখানে সরকারি প্রাইমারি স্কুল নেই?

❑ আছে। তবে সবাই বলে, ওখানে লেখাপড়া হয় না। তাই নানা আমাকে প্রথম থেকেই সপ্তগ্রাম কিশলয় মিশনে দিয়েছিলেন।

● ক্লাস ফাইভের অ্যানুয়াল পরীক্ষায় তোমার রেজাল্ট কেমন ছিল?

❑ ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলাম।

● আর আল-আমীনে এসে সিক্সের অ্যানুয়াল পরীক্ষায় কত পেয়েছ?

❑ (সলজ্জ হাসি) ৬৫ শতাংশ। ভালো হয়নি।

● কেন?

❑ নতুন জায়গা। নতুন পদ্ধতি পড়াশোনার। আল-আমীনে যে-পদ্ধতিতে পড়ানো হয় আর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পড়ে উত্তর দিতে হয়, সেটা অনেকটাই আলাদা। এটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কষ্ট হয়েছে। তাই খারাপ হয়েছে রেজাল্ট। আশা করছি সামনের বছর অনেকটাই ভালো ফল করতে পারব।

● তোমাদের বাড়িটা কেমন?

❑ ছিটেবেড়ার। খোলার ছাউনি। বর্ষায় জল পড়ে। এককামরার ঘর। সরকারি খাস জমিতে।

● নিজেদের কোনো জায়গা-জমি নেই?

❑ না। বসতবাড়ি ছিল। ফুফুদের বিয়ে দিতে দাদুকে বিক্রি করতে হয়।

● আল-আমীনে যে-বাড়িতে তুমি রয়েছ, বাবনান ক্যাম্পাসের সেই গার্লস হস্টেলটি কেমন?

❑ পাঁচতলা বাড়ি। আমরা থাকি একতলায়। ষোলো জন মেয়ে একটা হলঘরে। সবাই ক্লাস সেভেনের। সঙ্গে থাকেন একজন ম্যাডাম। ইসমোতারা বেগম। উনিই আমাদের অঙ্কের ক্লাস নেন।

● মিশনে তোমার বন্ধু হয়েছে এই এক বছরে?

❑ হ্যাঁ। একসঙ্গে থাকি। বন্ধু তো হবেই। তবে আড়াইশো জন মেয়েদের মধ্যে সেরা বন্ধু মুসাহিনা। আসলে মুসাহিনার বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে চল্লিশ মিনিট দূরে খোলার মোড়ে।

● আল-আমীনের সারাদিনের রুটিনটা একটু বলবে?

❑ দিন শুরু হয় ভোর সাড়ে চারটেয়। (মাথা নামিয়ে) আপা তুলে দেন। সারাদিন মিশনের নিয়ম মেনে পড়া, খাওয়া, নমাজ ইত্যাদি করতে হয়। সাবজেক্ট টিচাররা ক্লাস নেন। এটা চলে রাত ১১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত। ওই সময় আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। শুধু বিকেলে যে-যার ইচ্ছেমতো খেলাধুলা করতে পাই।

● কী খেলা?

❑ (আবার হাসি) কিৎ-কিৎ, কবাডি, ব্যাডমিন্টন। আমি ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালোবাসি। কেউ কেউ আবার ঘুমোয় বা গল্প করে।

দিন শুরু হয় ভোর সাড়ে চারটেয়। সারাদিন মিশনের নিয়ম মেনে পড়া, খাওয়া, নমাজ ইত্যাদি করতে হয়। সাবজেক্ট টিচাররা ক্লাস নেন। এটা চলে রাত ১১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত। ওই সময় আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়।

● কী হতে চাও বড়ো হয়ে?

❑ ডাক্তার।

● কোন বিষয় তোমার প্রিয়?

❑ ম্যাথ, জিয়োগ্রাফি আর ইংলিশ।

● ইংরেজি ভালো লাগে কেন?

❑ চমৎকার ভাষা। তা ছাড়া আমি যদি বিদেশে যাই, ধরুন আমেরিকায়, ইংরেজি জানতেই হবে।

● বিদেশে যাওয়া বা উচ্চশিক্ষা ছাড়া ইংরেজি জানার আর-কোনো উপযোগিতা আছে?

❑ আছে স্যার। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন কেউ পড়তে পারল না, গাঁয়ের মানুষ তো, ইংরেজি জানলে আমি সেটা পড়ে বুঝিয়ে দিতে পারি।

● আর অঙ্ক?

❑ ম্যাথ খুব সহজেই করতে পারি। অবশ্য আটকে গেলে খুব রাগ ধরে অঙ্কটার ওপর। তখন গ্রুপ-লিডারের কাছে যাই। আমাদের গ্রুপ করে লেখাপড়া হয়। ছোটোখাটো সমস্যার সমাধান গ্রুপেই হয়ে যায়। যদি না মেটে, তখন আপার কাছে যেতে হয়। তবে না-পারলে নিজেকে ছোটো লাগে।

● সারাদিনের মধ্যে কোন সময়টা সবথেকে ভালো লাগে?

❑ বিকেল। নিজের ইচ্ছেমতো কাটানো যায়। একটু মুক্তি পাওয়া যায়।

● সারাদিন যদি এমনই মুক্তি পেতে, তাহলে তো ভালোই হত, কী বলো?

❑ (একটু থেমে, একটু নিঃশব্দে হেসে) না। সারাদিন মুক্তি পেলে ভালো লাগত না। সারাদিন পড়লেও মাথায় ঢুকত না কিছু। তাই ওই বিকেলটুকুর দরকার।

● ধরো, তিন দিন টানা একা থাকলে কোথাও। কোনো শব্দ নেই। এমনকী ঝিঁঝি পোকারও। কেমন লাগবে এমন নিঃশব্দ পরিবেশে একা থাকতে?

❑ ভয় করবে।

● কী করতে ভালোবাস?

❑ পড়তে।

● কী খেতে ভালো লাগে?

❑ ভাত ছাড়া আর কীই-বা ভালো লাগবে!

● সবচেয়ে খুশি হবে কীসে?

❑ ভালো রেজাল্ট করতে পারলে।

● ভালো রেজাল্ট কোনটা?

❑ অ্যাবাভ নাইনটি পারসেন্ট।

● সবচেয়ে খারাপ লাগে কী?

❑ অপমানিত হতে। ■

● এই আল-আমীনে তোমাকে পড়তে পাঠিয়েছেন তোমার মা, নানা— কোন উদ্দেশ্যে?

❑ গাঁয়ের মেয়েদের মতো অন্ধকারে না থেকে, যাতে আমি মানুষের মতো মানুষ হতে পারি।

● 'মানুষের মতো মানুষ' কথাটার মানে কী?

❑ আদর্শ মানুষ। বিনয়ী, বড়োদের সম্মান করা, ছোটোদের ভালোবাসা। অন্যকে আঘাত না করা। আর, ভালোভাবে লেখাপড়া করা, যাতে আমি বাবা-মায়ের আল-আমীনের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি। বিশেষ করে সেক্রেটারি স্যারকে আর আমাদের ব্রাঞ্চের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যেন খুশি করতে পারি।

এটি নানান টুকরো-টুকরো বিভাগের সমন্বয়। ভাষা, দেশ, বই, মহাকাশ, কী নেই! রত্নে ভরা আলিবাবার গুহা যেন।

দে শ

চা দ

দেশটিকে বলা হয় আফ্রিকার মৃত হৃদয়, যার আবহাওয়ায় নেই প্রকৃতির করুণা, নেই রাজনৈতিক স্থিরতা। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে জীবনীশক্তি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা দেশটিকে পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশরূপে চিহ্নিত করেছে। এই দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। পাঁচ থেকে চোদ্দো বছর বয়স্ক বেশিরভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা ছেড়ে শিশু-শ্রমিক হয়ে যায়, তবু দেশটি লড়ে যাচ্ছে তার এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হতে। আশার আলো আসছে।

দেশটির নাম চাদ। উত্তর-মধ্য আফ্রিকার দেশ এই চাদ। চারিদিকেই স্থল দিয়ে ঘেরা এই দেশটির আয়তন বারো লক্ষ চুরাশি হাজার বর্গকিলোমিটার। ২০১৫ সালের হিসেব অনুযায়ী জনসংখ্যা এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার চুরাশি জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ৮.৬ জন মানুষের বাস। চাদ দেশটির উত্তরে রয়েছে লিবিয়া, পূর্বে সুদান, দক্ষিণে মধ্য-আফ্রিকি প্রজাতন্ত্র এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ক্যামেরুন ও নাইজেরিয়া ও পশ্চিমে নাইজার। আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে আয়তনে চাদ পঞ্চম ও সমগ্র বিশ্বের দেশগুলোর নিরিখে এর স্থান ২১-তম।

চাদের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এর উত্তর অংশ জুড়ে রয়েছে মরুভূমি, মধ্য অংশ বৃষ্টিপাতহীন শুষ্ক সহেলীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ অংশ অপেক্ষাকৃত উর্বর সুদানীয় সাভানা অঞ্চল। চাদ দেশটির নামকরণ হয়েছে দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে অবস্থিত চাদ হ্রদের নাম থেকে। চাদের রাজধানীর নাম নিজামিনা। নিজামিনা সমুদ্র থেকে প্রায় ষোলোশো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ত্রিসীমানায় কোনো সমুদ্র না থাকার জন্যে চাদ দেশটির বেশিরভাগ অঞ্চলই মরুপ্রায়। চাদে প্রায় দু-শো রকম জনগোষ্ঠীর মানুষ আছে— এদের মধ্যে প্রধান হল সারা, আরব, মায়ো-কেবি, কানেম-বরানি, ওয়ুদ্দাই, হাদজারাই, তান্ডজিল্লে প্রভৃতি।

যিশু খ্রিস্টের জন্মের সাত হাজার বছর আগে থেকেই এই দেশে মানুষ বসবাস করতে শুরু করে। চাদের উত্তর অংশের আবহাওয়া তখন বসবাসের অনুকূল ছিল। এইসব সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বর্তমানে বরকৌ-এননেদি-তিবেসতি অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে, যা প্রায় চার হাজার বছরের পুরোনো। চাদের এই অঞ্চল নানান সভ্যতার উত্থান-পতন দেখেছে। এখানের প্রাচীনতম রাজবংশ সাত্ত রাজবংশ। তাদের কথা এ-দেশের নানা কিংবদন্তি, মৌখিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। কানেম রাজবংশ এই সাত্ত রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কানেম রাজবংশের রাজত্বকাল ৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৭৬ খ্রিস্টাব্দ। এরপর বাগুইরমি ও ওয়াদাই রাজবংশ ষোলো ও সতেরো শতাব্দী নাগাদ রাজত্ব করেছিল। এই রাজবংশের সম্রাটরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ১০৮৫ সালে চাদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রথম পরিচয় হয়।

কানেম ও তার পরবর্তী রাজবংশগুলি ট্রান্স-সাহারান বাণিজ্যপথের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করত। এই সময় দাস ব্যবস্থার ছিল রমরমা, কানেম প্রদেশে জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগই ছিল দাস।

১৯২০ সালে ফ্রান্স চাদ দখল করে এবং চাদকে ফরাসি নিরক্ষীয় আফ্রিকি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর চাদকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালের ১১ অগাস্ট চাদ স্বাধীন হয়। সারা জনগোষ্ঠীর নেতা ফ্রাঁসোয়া তোমবালবায়ে হন স্বাধীন দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। কিন্তু ক্ষমতা পেয়েই তোমবালবায়ে বিরোধী দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ও একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই দমন-পীড়ন দেশের উত্তর অংশের মুসলমান জনগণের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

১৯৬৫ সালে শুরু হয়ে যায় গৃহযুদ্ধ। ১৯৭৯ সালে বিদ্রোহীরা রাজধানী নিজামিনা দখল করে নেয়। এই পরিস্থিতিতে লিবিয়া আবার চাদ আক্রমণ করে। তখন হিসেন হাব্রের নেতৃত্বে সমগ্র চাদের জনগণ অভূতপূর্ব লড়াই করে লিবিয়াকে হারায়। হিসেন হাব্রে রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার পর ১৯৯০ সালে তাঁর সেনাবাহিনীর জেনারেল ইদ্রিশ দেবীর দ্বারা তিনি পদচ্যুত হন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার পর থেকেই দেশটি রাজনৈতিকভাবে কোনো স্থিরতা পায়নি। চাদে তুলার চাষ ভালো হয় এবং তুলা শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হলেও প্রধান আয়ের উৎস অশোধিত তেলের রপ্তানি। এ ছাড়া বিলটাইন প্রদেশে সোনাযুক্ত কোয়ার্জ পাথর পাওয়া যায়।

চাদের ভূমিরূপে পাহাড় মালভূমির পরিমাণই বেশি। এর উত্তরে রয়েছে এননেদি মালভূমি এবং তিবেসতি পর্বতমালা। এই পর্বতমালার অন্তর্গত সুপ্ত আগ্নেয়গিরি এমি কোওসির উচ্চতা প্রায় তিন হাজার চারশো চোদ্দো মিটার। চাদের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখা যায়। মরুভূমি অংশে শুধুমাত্র মরূদ্যানেই খেজুর গাছের দেখা মেলে। সহেলীয় অঞ্চলে দেখা যায় বাবলা ও খেজুর গাছ। দক্ষিণে সুদানীয় সাভানা অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ও প্রেইরি ঘাসের জঙ্গল। এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য অতুলনীয়। প্রায় একশো চুয়ান্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী ও পাঁচশো নয় প্রজাতির পাখি দেখা যায়। এ ছাড়া ষোলোশো ভিন্ন প্রজাতির গাছ দেখা যায়। হাতি, সিংহ, গণ্ডার, জিরাফ, চিতা, হরিণ-সহ বিভিন্ন প্রকার প্রাণী তৃণভূমি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। একটি সমস্যা হল, হাতির দাঁতের লোভে চোরাশিকারিদের নির্বিচারে হাতি-শিকার। বাবলা গাছ থেকে আঠা প্রস্তুতির শিল্প এখানকার একটি বড়ো উপার্জনের মাধ্যম।

চাদের ৫৫ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী, এ ছাড়া ২২ শতাংশ ক্যাথলিক খ্রিস্টান ও ২৩ শতাংশ প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান। দেশের বেশকিছু মানুষ এখনও অতি প্রাচীন ধ্যান-ধারণাতে বিশ্বাস করেন। চাদে ৪০ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। ২০০৩ সালে সুদানের দাফুর অঞ্চলের গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রায় দু লক্ষ আশি হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে চাদে আশ্রয় নিয়েছে। চাদ দেশটির মাত্র ১০ শতাংশ জমি চাষযোগ্য অথচ দেশের ৮০ শতাংশ মানুষই কৃষিজীবী। জোয়ার বাজরা এখানকার প্রধান উৎপাদিত খাদ্যশস্য। সহেলীয় অঞ্চলে ছাগল, ভেড়া, গোরু প্রভৃতি পশু লাভজনক উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করা হয়। প্রকৃতির হাজারো বিরুদ্ধতা সয়ে দাঁড়িয়ে আছে চাদ। সামান্য বানানের ভুলে চাঁদ হয়ে যেতে পারে। সত্যি-সত্যি দেশটা সেরকম হলে আমাদের ভালো লাগবে।

অতনুমিথুন মণ্ডল

ভাষা

আ ল তা ই ক

আলতাইক কোনো একক ভাষা নয়। এটি একটি ভাষাগোষ্ঠী। ভাষাগোষ্ঠী কী? একটি ভাষা থেকে হাজার হাজার বছর ধরে নানা ভাষার জন্ম হলে সেই মূল ভাষাটির নামে তৈরি হয় একটি গোষ্ঠী। যেমন ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী, ভারতের বেশ কয়েকটি ভাষার মতো আমাদের মাতৃভাষা বাংলাও যার সদস্য বলে অনেকে মনে করেন। এই গোষ্ঠীটি এসেছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে, যাকে এককথায় আমরা বলি এরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বা আর্য ভাষা। আবার নোয়াম চমস্কির মতো পণ্ডিত বলেছেন, কোনো ভাষাই অন্য ভাষার সন্তান হতে পারে না। তিনি বলছেন, প্রতিটি ভাষাই স্বয়ম্ভূ— একেক অঞ্চলে নিজে-নিজেই ভাষার জন্ম হয়।

আলতাইক এমন একটি ভাষাগোষ্ঠী, যেটার প্রকৃত রূপ নির্ধারণ নিয়ে আজও বাদানুবাদ চলছে। একদল ভাষাবিজ্ঞানী আলতাইক ভাষাগোষ্ঠীর রূপরেখা স্পষ্ট দেখতে পেলেও, অন্য দল এখনও এই ভাষাগোষ্ঠী বিষয়ে সন্দিহান। বলা যায়, এটি এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর নতুনতম একটি ভাষাগোষ্ঠী এবং সেই কারণে ভাষাবিজ্ঞানীদের চর্চার বিষয়।

যেসব ভাষাগোষ্ঠীকে সবাই মেনে নিয়েছে, সেগুলো হাতে গোনা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কথা আগে বলেছি। এ ছাড়াও রয়েছে সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠী— এই গোত্রের ভাষা আরবি, হিব্রু ইত্যাদি। অস্ট্রিক বা অস্ট্রোলয়েড ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে সাঁওতালি, মুন্ডারি ইত্যাদি। দ্রাবিড় একটি ভাষাগোষ্ঠী— যার শাখা তামিল, কন্নড়, তেলুগু, মালয়ালম প্রভৃতি। এ ছাড়াও রয়েছে আরও কয়েকটি ভাষাগোষ্ঠী। আমাদের জানবার বিষয় আলতাইক ভাষা। প্রথমেই জেনে নিই, কেন ভাষাগোষ্ঠীটির নাম আলতাইক হল।

পূর্ব রাশিয়া, মোঙ্গোলিয়া, চীন আর কাজাখস্তানের সীমান্ত যেখানে মিলেছে, সেই অঞ্চলে রয়েছে আলতাই নামের পর্বত। 'আল' অর্থে মোঙ্গোলীয় ভাষায় সোনা, 'তাই' অর্থে সংযুক্ত। অর্থাৎ, সোনার পর্বত। আলতাইক গোষ্ঠীর আরও কয়েকটি ভাষাতেও ওটি সোনার পর্বত। মধ্য এশিয়ার স্তেপভূমিতে এবং তার সংলগ্ন আলতাই পর্বতের পাদদেশে এক জাতি বাস করত অতি প্রাচীন কালে। হাজার হাজার বছর আগে তারা যে-ভাষায় কথা বলত, সেই ভাষাটির নাম ভাষাবিজ্ঞানীরা দিয়েছেন প্রোটো-আলতাইক। আলতাইক ভাষাগোষ্ঠীর আদি রূপ সেটিই। ক্রমে সেইসব মানুষ এশিয়ার পুবে আর পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকী, ইউরোপেও।

আলতাই পর্বতমালা।

পূর্ব রাশিয়া, মোঙ্গোলিয়া, চীন আর কাজাখস্তানের সীমান্ত যেখানে মিলেছে, সেই অঞ্চলে রয়েছে আলতাই নামের পর্বত। 'আল' অর্থে মোঙ্গোলীয় ভাষায় সোনা, 'তাই' অর্থে সংযুক্ত। অর্থাৎ, সোনার পর্বত। আলতাইক গোষ্ঠীর আরও কয়েকটি ভাষাতেও ওটি সোনার পর্বত।

আলতাইক ভাষাগোষ্ঠীর ভূমি।

মোট তিনটি প্রধান শাখা রয়েছে এই ভাষার— তুর্কিক (Turkic), মোঙ্গোলিক (Mongolic), তঙ্গুজেক (Tungusic)। এ ছাড়া আরও দুটি ভাষা— কোরিয়ানিক (koreanic), আর জাপোনিক (Japonic)। এদের কয়েকটি ভাষার একাধিক শাখাও রয়েছে। যেমন আদি-মধ্যযুগের তুর্কি ভাষা ভেঙে আজ বেশ কয়েকটি ভাষা গড়ে উঠেছে। একটির নাম বলি— তুর্কমেনিস্তানের ভাষা তুর্কমেন। পণ্ডিতেরা বলছেন, অন্তত পঞ্চাশটির মতো আলতাইক ভাষা রয়েছে দুনিয়া জুড়ে। এবং কমপক্ষে তেরো কোটি পঞ্চাশ লাখ মানুষ এই ভাষাগোষ্ঠীর কোনো-না-কোনো ভাষায় কথা বলছেন।

সেই ভাষাগুলো কী? ভাবলে গালে হাত দিতে হয় যে, পশ্চিম প্রান্তে ইস্তানবুলের মানুষের ভাষা তুর্কি যেমন একটি আলতাইক ভাষা, তেমনই মধ্য এশিয়ার মোঙ্গোলীয় ভাষাও আলতাইক। সাইবেরিয়ার পুবদিকের লোকেও বলে আলতাইক ভাষা। এ-কথা প্রমাণ করতে বহু পণ্ডিত সক্ষম যে, এশিয়ার শেষ-পুবের কোরীয় এবং জাপানি ভাষাও আসলে আলতাইক গোষ্ঠীর সদস্য।

এত দূরে দূরে বসবাসকারী নানা জাতির মানুষের ভাষা এসেছে আলতাইক থেকে, এটা কী করে বোঝা গেল?

আমাদের মাথায় না ঢুকলেও, ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে কাজটা বেশ সহজ। তাঁরা গবেষণা করে দেখেছেন আলতাইক ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো। যেমন পূর্ব এশিয়ার আলতাইক ভাষায় (মোঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, উত্তর চীন ইত্যাদি) সম্মানসূচক শব্দ (আপনি, তুমি, তুই) নেই। নারী-পুরুষের পার্থক্যও নেই। এমনকী ব্যাকরণেও নেই লিঙ্গভেদ। অথচ ওই এলাকার অন্য ভাষায় সেসব প্রকট। সমস্ত আলতাইক ভাষায় স্বরবর্ণের গুরুত্ব খুব বেশি। আটটি মূল স্বরবর্ণের দেখা পাওয়া যায় এবং দুটি স্বরবর্ণের মিশেলে আরও বহু স্বরধ্বনি তৈরি হয়। প্রায় প্রতিটি শব্দ শেষ হয় স্বরবর্ণের ব্যবহারে।

আন্তর্জাতিক শব্দভাণ্ডারে আলতাইকের অবদান কী? যেমন দালাই (দালাই লামা), খান বা খাঁ, মোগল বা মুঘল, কশাক, ইয়োগার্ট (দই), সামান (ওঝা), হোর্ড (Horde, বড়ো দল)। এগুলো আলতাইক গোষ্ঠীর মোঙ্গোলিক ভাষার শব্দ। আমরা অনেকেই বলি 'দস্তরখানা' শব্দটি। কিন্তু জানি না যে, এটিও আলতাইক ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ। কাজাখস্তানের লোকেরা বলে দস্তরকান, উজবেকে দস্তুরকান, কিরঘিজে দস্তোরকন, আজারবাইজানিতে দস্তরকোন, তাজিকে দস্তরখান। মূলে এটি আলতাইক ভাষাগোষ্ঠীর তুর্কি শব্দ 'দস্তরখান' থেকে নানা ভাষায় ছড়িয়েছে। ভারতে শব্দটি হিন্দি, উর্দু ছাড়াও বাংলায় বহুল প্রচলিত।

নেহা চৌধুরী

তা রা য় তা রা য়

রো হি ণী

দার্শনিক গাজালি বলেছিলেন, দুটি জিনিস আমার মনকে সবসময় নতুন বিস্ময়ে আর অজানিত শিহরনে ভাবায়— আমার ভেতরের নীতির বোধ আর আমার বাইরের ওই তারায় ভরা আকাশ। তারায় তারায় উজ্জ্বল রাতের আকাশ আদিকাল থেকেই মানুষকে অভিভূত করেছে। মানুষ বুঝতে চেয়েছে তারাদের সৃষ্টির রহস্য। প্রাচীনদের সৃষ্টিশীল মন তারাদের নিয়ে গড়ে তুলেছিল নানান লৌকিক কাহিনি। আকাশে বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো তারা একসঙ্গে জোট বেঁধে থাকে, এদের বলে তারামণ্ডলী। আগেকার দিনের মানুষেরা এই জোট বেঁধে থাকা তারাগুলোকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে পর পর জুড়ে, মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনা করত নানান আকার-আকৃতির। কোনো তারামণ্ডলী তাদের কল্পনায় ছিল বীর যোদ্ধা, কোনোটা-বা ভয়ংকর বিষাক্ত কাঁকড়াবিছা। শুধু বিভিন্ন আকার-আকৃতি কল্পনাই নয়, তারা মনে করত এই তারাদের প্রভাব তাদের ভাগ্যকেও নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। আজ আমরা যে-তারাটির সম্পর্কে জানব, বিজ্ঞানী মহলে তার পরিচিতি আলফা টাওরি নামে। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এই তারাটিকেই আলদেবারান নামে ডাকা হয়। প্রাচীন ভারতে এই তারাই রোহিণী নামে খ্যাত ছিল।

বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখেছেন, রোহিণী সূর্যের চেয়ে আকারে অনেক বড়ো। এর ব্যাস সূর্যের প্রায় তেতাল্লিশ গুণ। আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে রোহিণীর দূরত্ব পঁয়ষট্টি আলোকবর্ষ।

উত্তর গোলার্ধে বসন্ত ও শীতকালের সন্ধ্যার আকাশে একদল তারাকে দেখা যায়, যাদের কাল্পনিক রেখা দিয়ে জুড়লে একটা ষাঁড়ের আকৃতি পাওয়া যাবে। এই ষাঁড়ের আকৃতির তারামণ্ডলীর নাম 'বৃষ তারামণ্ডলী'। এই তারামণ্ডলীর কথা মানুষ সেই সুদূর ব্রোঞ্জ যুগ থেকেই জানত। ষাঁড়ের চোখ হিসেবে যে-তারাটি কল্পনা করা হয়েছে, সেটিই হল আলদেবারান বা রোহিণী। আকাশে চোখ রাখলে আমরা দেখব রোহিণী তারাটির রং উজ্জ্বল লালচে কমলা। তাই আগেকার দিনের মানুষজন মনে করত ষাঁড়টি রাগে লাল-চোখো হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখেছেন, রোহিণী সূর্যের চেয়ে আকারে অনেক বড়ো। এর ব্যাস সূর্যের প্রায় তেতাল্লিশ গুণ। আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে রোহিণীর দূরত্ব পঁয়ষট্টি আলোকবর্ষ। অর্থাৎ রোহিণী এই মুহূর্তে যদি নিভে যায়, তবু পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত আমরা দেখতে পাব তারাটিকে। ফের জ্বলে উঠলে তার আলো আমাদের কাছে পৌঁছোতে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর লাগবে।

রোহিণী একটি দৈত্যাকার K5 III প্রকারের তারা। এই ধরনের তারাদের বৈশিষ্ট্য হল, এদের ভেতরকার হালকা মৌলগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে ক্রমে ফুরিয়ে যায় ও ভারী মৌল তৈরি করে। রোহিণীর ভেতরকার হাইড্রোজেন ধ্বংস হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী মৌল হিলিয়াম উৎপন্ন করে এবং এর বাইরের অংশে যেটুকু হাইড্রোজেন অবশিষ্ট আছে, তা তীব্রভাবে জ্বলছে। এইভাবে রোহিণী একটি লাল বামন শ্রেণির তারায় পরিণত হয়েছে। রোহিণী তারার উজ্জ্বলতা সূর্যের প্রায় একশো তিপ্পান্ন গুণ। যদিও এর উপরি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা সূর্যের থেকে অনেকটাই কম। সূর্যের উপরি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা যেখানে পাঁচ হাজার আটশো কেলভিন, সেখানে রোহিণীর উপরি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা চার হাজার কেলভিন। আকাশে যে-তারাগুলো খালি-চোখে দেখা যায়, তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতার নিরিখে রোহিণী ১৪-তম স্থান পেয়েছে।

আকাশে রোহিণী তারাটি খুঁজে নেওয়া কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। আমরা আকাশে কালপুরুষ নামে তারামণ্ডলীকে চিনি। এই কালপুরুষকে কল্পনা করা হয় বীর যোদ্ধা বা শিকারি হিসেবে, যার এক হাতে ধরা রয়েছে তির, অন্য হাতে ধনুক, কোমরে ঝুলছে কোমরবন্ধ বা বেল্ট। পায়ের কাছে রয়েছে শিকারি কুকুরদল। যদি কেউ কালপুরুষের কোমরবন্ধের তারা তিনটি পর পর কাল্পনিক রেখা দিয়ে জুড়ে সামান্য ডানদিকে এগিয়ে যায়, তাহলে দেখতে পাবে লালচে কমলা রঙের উজ্জ্বল রোহিণীকে।

আলদেবারান শব্দটি আরবি শব্দ 'আল-দাবারনে'রই বিকৃত রূপ। 'আল-দাবারন' শব্দের অর্থ হল অনুসরণকারী বা অনুগামী। রোহিণী তারা যে-কাল্পনিক ষাঁড়ের চোখ, সেই ষাঁড়ের কাঁধ তৈরি করেছে সাতটি তারার একটি দল। এই তারামণ্ডলীর নাম হল কৃত্তিকা। কৃত্তিকাকে উত্তর আকাশের সুন্দরতম নক্ষত্রগুচ্ছও বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আদিম অধিবাসীদের পুরাকাহিনিতে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জকে সাত বোনরূপে কল্পনা করা হয়েছে। অনেক পুরাকাহিনিতে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জকে তিতির পাখির ঝাঁক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে এবং রোহিণী তাদের শিকারের লক্ষ্য নিয়ে অনুসরণ করছে।

অল-বিরুনি (৯৭৩—১০৪৮) বলেছেন, রোহিণী তারাটি আরবে আরও অনেক নামে পরিচিত ছিল। একে কখনও কখনও ডাকা হত আল-ফানিক বা ঘোড়াউট নামে, কখনও-বা আল-ফাতিক বা মোটাউট নামে, আবার কখনও আল-মুহদিজ বা মেয়েউট নামে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর বিভিন্ন নাম আছে, সেগুলিও আমরা জানব। গ্রিকরা রোহিণীকে ডাকত ওম্মা বুস নামে। ল্যাটিন ভাষায় এর নাম ছিল ওকুলাস টাওরি। প্রাচীন ইংরেজরা একে চিনত ষাঁড়ের চোখ অর্থাৎ বুল'স আই নামে। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার মানুষরা এই তারাকে ডাকত পিদনু-সা-শেম নামে ও আক্কাদিয়ানদের কাছে এর পরিচিতি ছিল জিস-দা নামে। শেষ দুটি নামেরই অর্থ স্বর্গের মাটিতে লাঙলের দাগ।

প্রাচীন পারস্যে রোহিণীকে শ্রেষ্ঠ চারটি তারার অন্যতম ধরা হয়েছে। এই চারটি তারা স্বর্গের বিভিন্ন দিকের দরজাগুলোর পাহারাদার। রোহিণীকে স্বর্গের পূর্ব দরজার পাহারাদার হিসেবে ভাবা হত। হিন্দু পুরাণে রোহিণীকে নিয়ে অনেক মজাদার গল্প আছে, যা পরে কখনও আমাদের আলাদা একটা লেখার বিষয় হতে পারে।

মিসাম উপজাতির মানুষজন মনে করত রোহিণী বৃষ্টিকে ডেকে আনে এবং রোহিণী রেগে গেলে সেই বছর ভয়ংকর খরা হবে। আমেরিকার আদিবাসীদের বিশ্বাস ছিল রোহিণী তারা আকাশ থেকে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে বেশ বড়ো একটা সাপকে মেরে ফেলেছিল, সেই মরা সাপই এখন মিসিসিপি নদীরূপে বয়ে চলছে।

অতনুমিথুন মণ্ডল

বইভব

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা, ইন্দ্রমিত্র,
আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

চি র চে না এ ক আ প ন জ ন

এমনকী দশ ক্লাসে পড়ার সময়ও স্কুলের যে-মাঠ অনিঃশেষ মনে হত, একশো মিটার দৌড়ের ট্র্যাক ফুরোনো যেত না, আজ চল্লিশের কোঠায় এসে, সেই মাঠকেই পুঁচকে মনে হয়। কিন্তু সেই ছেলেবেলাতেই স্কুলপাঠ্য বইতে যে পড়েছিলাম, রামজয় তর্কভূষণ বলছেন, কই, আমি তো মনুষ্যবিষ্ঠা এ-গ্রামে দেখি না, সকলেই গোরু, সুতরাং সকলই গোময়— এ-কাহিনিটি পড়ে মানুষের রসবোধ, বুদ্ধিমত্তা, শ্লেষ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের আশ্চর্য সমবায় সম্পর্কে যে-সম্ভ্রম ও মুগ্ধতা জেগে উঠেছিল, আজও 'বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা'য় সে-ঘটনাটির বিবরণ পড়ে একইরকম আনন্দ হল। এই কাহিনির আবেদন যে পোড়-খাওয়া, কঠোর, কাণ্ডজ্ঞানে জর্জরিত মনেও অক্ষত রইল, তা যেমন রামজয় তর্কভূষণের প্রভাবে, তেমন ইন্দ্রমিত্রের রচনার প্রসাদগুণেও। এই মানুষটিরই উত্তরাধিকারী বিদ্যাসাগর।

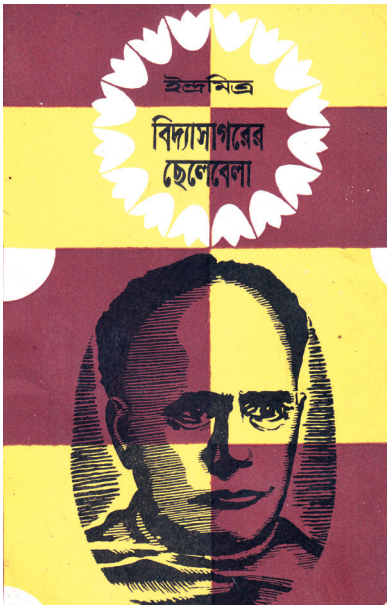

শৌর্য, বিদ্যাবত্তা, অভিমানশূন্যতা সম্বল করে বিদ্যাসাগর যেসব কাণ্ড করেছিলেন, এই বাস্তব জগতে, আজ এতদিন পরে সেসব রূপকথাতুল্য মনে হয়। মনে হয়, কোনো কল্পিত অবতারের দ্বারা সংঘটিত অবিশ্বাস্য কার্যের বিবরণ পড়ছি। জগৎ এত দীর্ণ, রিক্ত ও নিঃসম্বল হয়ে গেছে যে, বিদ্যাসাগরের বাস্তব জীবনখানিও পৌরাণিক বলে ভ্রম হতে থাকে। এর দায় শুধু দেবত্ব আরোপের সংস্কৃতির মধ্যেই নেই, নানা ঋণাত্মক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আমরা যে আত্মত্যাগ, সাহস, তিতিক্ষা, মনঃসংযমের বল প্রদর্শন করতে কিংবা এমনকী প্রত্যক্ষ করতেও অসমর্থ, সেই সমাজ-পরিস্থিতির মধ্যেও আছে। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, তখন সবই ছিল ভালো আর আজ সবই মন্দ। তখন হিন্দু-সমাজ এত কদাচারে পূর্ণ হয়েছিল যে, বিদ্যাসাগরকে আজীবন তার বিরুদ্ধে, সতীদাহ ও বাল্যবিবাহের মতন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তবু আজ এই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষীয় সমাজে বসেও কেন তাঁকে এত অচেনা লাগে, কেন সমাজ-সংসার থেকে এমন সমর্থন মেলে না যে, তাঁকে আমাদের চিরচেনা এক আপনজন মনে করে মনে মনে জড়িয়ে ধরতে পারি! ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সমাজ-পরিসর অনুকূল নয় বলেই, ভয়ে লজ্জায় বেঁচে থেকে থেকে পিষে যাচ্ছি বলেই এই মানুষটিকে নক্ষত্রপ্রতিম অজানা উড়ন্ত এক বস্তু মনে হচ্ছে! এই বেদনা জাগিয়ে তুলল ইন্দ্রমিত্রের 'বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা'।

একজন একাহাতে ভালুক মেরে ফেলছেন। একজন বলছেন, আমায় অজ্ঞান না করেই ছুরিকাঁচি চালাও— এসব পড়লে আজ যেমন পুলক হয়, তেমন অস্বস্তিও কম হয় না। সংকুচিত মানুষদের দেখতে দেখতে আমরা কি সত্যিই এমন সংকুচিত হয়ে পড়েছি যে, সৌন্দর্য ও কল্পনা আমাদের ছেড়ে একেবারে চলে গেছে। না কি সন্দিগ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার এই যে-দশা আমাদের, তাকেই উদ্‌যাপন করে জীবন শেষ করার কোনো অভ্রান্ত যুক্তিও আমাদের রইবে। একটা খুব বড়ো আক্ষেপ এই যে, সমসময়ের সমাজ-পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের খবর ছেলেমেয়েরা এই বই থেকে পাবে না। এ যে শুধুই তাঁর ছেলেবেলার বিবরণ। তবে আন্দাজ করে নিতে পারবে কদাচিত। শম্ভুচন্দ্রকে তিনি ছেলেবেলাতেই পুনর্বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। কী অসামান্য সেই বিবরণ। বৃদ্ধাবস্থায় একলা শম্ভুচন্দ্র পুনর্বিবাহ করতে একপ্রকার বাধ্যই হচ্ছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সম্মতি তিনি পাননি। তিনি যখন ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন, তোমার মাকে দেখে যাও, বিদ্যাসাগর তখন কাঁদছেন আর পণ করছেন কোনোদিন সেই ভিটেতে আসবেন না। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির তিনি আপনজন, কিন্তু মেয়েটির আগামী জীবনের দুর্বিষহ কষ্ট তাঁকে গ্রাস করেছে তখন। বিড়াল মারা গেলে বিড়ালের বাচ্চারা যখন কেঁদেছে, তখন তিনিও তাদের সঙ্গে কাঁদতে পেরেছেন। সারাজীবন দুর্দান্ত এক দস্যুর পরাক্রম নিয়ে শত প্রতিকূলতার মধ্যে লেখাপড়া চালিয়ে এসে শেষজীবনে কেঁদে বলেছেন, সংসার তাঁকে পড়তে দিল না। এই অশ্রুপাতের মুহূর্তগুলি অবিশ্বাস্য, কেননা, এ এক অধ্যবসায়ী, সংযমী মানুষের চোখের জল আর তাই তার মূল্য গুনেগেঁথে ঠাহর করার উপায় থাকে না। অনুপম এই বইটা পড়তে গিয়ে ছেলেবেলায় 'অমর চিত্রকথা সিরিজে' বিদ্যাসাগরের যে-সচিত্র জীবনকথা পড়েছিলাম, তার পৃষ্ঠাগুলোও স্মৃতিপটে ভেসে উঠল।

শৌর্য, বিদ্যাবত্তা, অভিমানশূন্যতা সম্বল করে বিদ্যাসাগর যেসব কাণ্ড করেছিলেন, এই বাস্তব জগতে, আজ এতদিন পরে সেসব রূপকথাতুল্য মনে হয়। মনে হয়, কোনো কল্পিত অবতারের দ্বারা সংঘটিত অবিশ্বাস্য কার্যের বিবরণ পড়ছি।

'অমর চিত্রকথা সিরিজে'র বইগুলো কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় পুরোনো বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়, অনলাইনেও মেলে। যেসব ছেলেমেয়েরা ইন্দ্রমিত্র বিরচিত 'বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা' বইটি পড়বে, তাদের আমি 'অমর চিত্রকথা সিরিজে'র বইটিও সংগ্রহ করে নিয়ে পড়বার জন্যে প্ররোচনা দিচ্ছি। একে অন্যের সঙ্গে সহযোগ করে তারা অপূর্ব বয়ান হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। আর তার যা আবেদন হবে কিশোর-মনে, সে-কথা ভাবতেই রোমাঞ্চিত হই। জানি না আজকের কিশোর-কিশোরীরা আমাদের ফেলে-আসা সময়ের অভিজ্ঞতার বলয়ে প্রবেশ করার জন্যে ঐতিহাসিকভাবেই অসমর্থ কি না! এই সন্দেহ যাবার নয়। তারা ইন্টারনেটে কতকিছু দেখে, কতকিছু পায়। তবু কামনা করব, আমার সন্তানপ্রতিমরা অন্তত একবার এই বইটি পড়তে গিয়ে টের পাবে, মানুষের জীবন একটার পর একটা পাহাড় টপকে যেতে গিয়ে কত ক্ষতবিক্ষত ও হিল্লোলিত হয়ে মর্তলোকেই অমর্ত্যলীলার আস্বাদ পেতে পারে।

চিরন্তন সরকার

সবজান্তা

জা নু য়া রি ক থা

জুলিয়ান এবং গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানুয়ারি হচ্ছে প্রথম মাস। আরও সাতটি মাসের মতো এই মাসটি একতিরিশ দিনের। এই মাসটি উত্তর গোলার্ধে শীতলতম আর দক্ষিণ গোলার্ধে উষ্ণতম। জানুয়ারি (January) শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ইয়ানুয়ারিয়াস বা জানুয়ারিয়াস (Ianuariuas) থেকে, যার মূল শব্দ ইয়ানুয়া বা জানুয়া (ianus)। মানে হচ্ছে দরজা— এখানে নতুন বছরে ঢোকার দরজা।

এই মাসের অন্তত দুটো দিন ভারতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৫ জানুয়ারি এবং ২৬ জানুয়ারি।

১৫ জানুয়ারি: এই সময়, অর্থাৎ এক-দু দিন আগে-পরে, পৌষ মাসের শেষে আর মাঘের শুরুতে সারা ভারত উৎসবে মেতে ওঠে। পাঞ্জাবে লহরী, বাকি উত্তর ভারতে মকরসংক্রান্তি, নেপালে মাঘে সংক্রান্তি, অসমে মাঘ বিহু, তামিলনাড়ুতে এবং সেইসঙ্গে গোটা দক্ষিণ ভারতে পোঙ্গাল— নানা নামের এই উৎসবটি আসলে নতুন ফসলের আবাহন। আজও পশ্চিমবাংলার নানা জায়গায় গ্রামে-গঞ্জে পৌষসংক্রান্তির মেলা বসে।

২৬ জানুয়ারি: ১৯৩০ সালের এই দিনটিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'পূর্ণ স্বরাজ' ঘোষণা করেছিল, যা পাওয়া যায় ১৭ বছর পরে, ১৯৪৭ সালে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের নিজস্ব সংবিধান রচনা শেষ হয় এবং সেই সংবিধান চালু হয় ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি। দিনটি তখন থেকেই প্রজাতন্ত্র দিবস নামে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। সরকারি স্তরে এমন গুরুত্বপূর্ণ দিন আমাদের দেশে আছে আর মাত্র দুটি— স্বাধীনতা দিবস (১৫ অগাস্ট) আর গান্ধী-জয়ন্তী (২ অক্টোবর)।

ফে ব্রু য়া রি ক থা

এটি জুলিয়ান এবং গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের দ্বিতীয় মাস। এবং, বছরের একমাত্র মাস, যেটি তিরিশ দিনের কম। সাধারণভাবে আটাশ দিনের, লিপি ইয়ারে উনতিরিশ দিনের। Leap মানে, আমরা জানি— লাফ। সংক্ষেপে বলা যায়, হিব্রু চান্দ্র বছর থেকে যখন সৌর বছরে এল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার, জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী বছরকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে আসতে একটা দিনের আগমন ঘটল লাফ দিয়ে।

জেমস জয়েস।

ফেব্রুয়ারি শব্দটি এল কোত্থেকে? ল্যাটিন শব্দ ফেব্রুম (februum) থেকে এসেছে রোমান মাস ফেব্রুয়ারিয়াস (Februarius), যার অর্থ শুদ্ধীকরণ। ফেব্রুয়া (februa) নামে শুদ্ধীকরণের এই আচার ছিল রোমানদের। তাদের পুরোনো চান্দ্র ক্যালেন্ডারে দিনটি ছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি, পূর্ণিমার দিন।

জেমস জয়েস: ১৮৮২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বিশ শতকের যুগান্তকারী লেখক ও কবি জেমস জয়েসের জন্ম আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে।

পুরো নাম জেমস অগাস্টিন অ্যালোয়েসিস জয়েস। ১৯২২-এ লেখা তাঁর 'ইউলিসিস' একটি আশ্চর্য উপন্যাস, যেটির রচনাশৈলীকে হোমারের 'ওডিসি'র সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই উপন্যাসে তিনি চেতনাপ্রবাহ-কৌশলকে কাজে লাগিয়েছেন সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। নিজের লেখা সম্বন্ধে খুঁতখুঁতে জয়েসের ছোটোগল্প সংকলন 'ডাবলিনার্স' (১৯১৪), উপন্যাস 'আ পোর্ট্রেট অব দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ আ ইয়ং ম্যান' (১৯১৬) এবং 'ফিনিগানস ওয়েক' (১৯৩৯)। এ ছাড়া রয়েছে তাঁর তিনটি কবিতার বই।

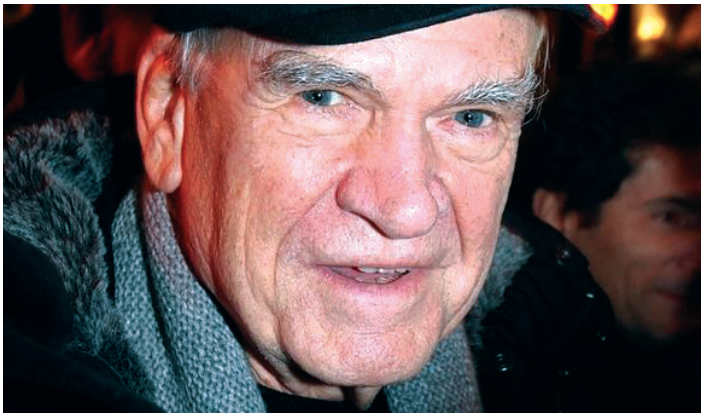

মিলান কুন্দেরা।

মা র্চ ক থা

বছরের তৃতীয় মাস। ল্যাটিন মারতিউস (Martius) থেকে এসেছে নামটি, যেটি ছিল রোমান ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস। রোমানদের যুদ্ধের ও কৃষির দেবতা মার্স (Mars)-এর নাম থেকে আজকের মার্চ।

সান্দ্রো বতিচেলি: ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে জন্ম এই বিখ্যাত চিত্রকরের। পুরো নাম— আলেসান্দ্রো দি মারিয়ানো দি বান্নি ফিলিপেপি। ইউরোপীয় রেনেসাঁ পর্বের প্রথম দিকের শিল্পী বতিচেলির জন্ম ইতালির ফ্লোরেন্সে, যেটি তখন ছিল পৃথক একটি রাষ্ট্র। নাম ছিল রিপাবলিক অব ফ্লোরেন্স। পোপ চতুর্থ সিক্সটাসের আমন্ত্রণে তিনি যান রোমে, সিস্টিন চ্যাপেলে ফ্রেস্কো আঁকতে। সেখানে রয়েছে তাঁর টেম্পটেশন অব ক্রাইস্ট, পানিসমেন্ট অব দি রেবেলস এবং ট্রায়াল অব মোজেস। আলো আর ছায়ার স্বল্প-পরিসর সংঘাতে তাঁর ছবিতে ফুটে উঠেছে স্পষ্ট দেহরেখা— এককথায় এটাই বতিচেলির ছবির বিশিষ্টতা। বিখ্যাত ছবি— দি বার্থ অব ভেনাস, প্রাইমাভেরা। মৃত্যু ১৭ মে ১৫১০।

এ প্রি ল ক থা

এটি চতুর্থ মাস। নামের ইতিহাস বেশ লম্বা। পিছিয়ে গেলে চোখে পড়বে, গ্রিক দেবী আফ্রোদিতের ছায়া। সেখান থেকে আফ্রিলিস এবং ল্যাটিন অ্যাপ্রিলিস হয়ে আজকের এপ্রিল। এটি ছিল রোমানদের দ্বিতীয় মাস।

মিলান কুন্দেরা: ১৯২৯ সালের ১ এপ্রিলে তৎকালীন চেকোশ্লোভাকিয়ায়, বর্তমানে চেক প্রজাতন্ত্রে জন্ম এই ভুবনবিখ্যাত লেখকের। বাবা লুডভিক কুন্দেরা, মা মিলাডা কুন্দেরা-জানোসিকোভা। বাবা ছিলেন নামকরা সংগীতবিশারদ। তাঁর লেখায় মিশে আছে সংগীতের মৃদু আবহে বিষাদমিশ্রিত বিদ্রূপ। মিলান কুন্দেরাকে বলা হয় বিশ শতকের ইউরোপের নতুন ঘরানার লেখক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য আনবিয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং'। এ ছাড়াও তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'দি বুক অব লাফটার অ্যান্ড ফরগেটিং'। তাঁর একাধিক উপন্যাস, গল্প এবং সাক্ষাৎকার অনূদিত হয়েছে বাংলায়। বহু পুরস্কারে সম্মানিত কুন্দেরা ১৯৭৫ থেকে সস্ত্রীক রয়েছেন প্যারিসে। এখন বয়স সাতাশি বছর। ■

সহযোগিতা আর প্রতিযোগিতা দুই বন্ধুর মতো। এ-কথা আমাদের বুঝতে হবে এবং মূল্য দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্কলারশিপ যেমন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তেমনি প্রতিযোগিতা আমাদের প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে চলে আরও আরও সফলতার দিকে। এই পাতায় থাকল স্কলারশিপ ও প্রতিযোগিতার কিছু খবর।

স্কলারশিপ ও প্রতিযোগিতা

মহম্মদ মহসীন আলি

জে এন টাটা এনডাওমেন্ট

বিবরণ: এটি একটি লোন স্কলারশিপ। স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট এই স্কলারশিপ প্রদান করে। বিদেশে উচ্চশিক্ষায় পঠনপাঠনের জন্যে এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়ে থাকে। পূর্বনির্ধারিত ট্রাস্টের নিয়ম অনুযায়ী ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও প্রায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপহার স্কলারশিপ দেয় এই ট্রাস্ট। যাতায়াত খরচ বাবদ দেওয়া হয় আরও ৫০ হাজার টাকা।

যোগ্যতা: (i) এই স্কলারশিপ ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়কেই দেওয়া হয়। (ii) ভারত সরকার অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে। (iii) পেশাগত বিদ্যায় পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী যদি সেই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার পড়াশুনার জন্যে বিদেশে যেতে চান। (iv) কয়েক বছর চাকরির অভিজ্ঞতা-সহ মধ্যপেশার ব্যক্তিও আবেদন করতে পারেন।

শর্তাবলি: (i) প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। (ii) আবেদনকারীর বয়স অবশ্যই ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। (iii) বিদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার জন্যে ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন, এমন ছাত্র-ছাত্রীরাই কেবল এই স্কলারশিপের আবেদন করতে পারবেন। (iv) বিদেশে পঠনপাঠনের জন্যে নির্বাচিত এবং বৈধ ভিসাপ্রাপ্ত প্রার্থীদেরই কেবল এই স্কলারশিপ প্রদান করা হবে।

আবেদন-পদ্ধতি: এই স্কলারশিপের জন্যে আবেদনের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। বছরের যেকোনো সময় আবেদন করা যায়। তবে বিদেশে চলে যাওয়ার অন্তত ৪৫ দিন আগে আবেদন করতে হবে। বিভাগীয় ওয়েব সাইট www.jntataendowment.org বা www.dorabjita-tatrust.org থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে, তা পূরণ করে নির্দিষ্ট বিভাগে পাঠাতে হবে। ডাউনলোড করা এই ফর্ম ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে অফলাইনে পূরণ করতে হবে। সযত্নে পূরণ করা এই আবেদনপত্র নিজের কম্পিউটারে বা ল্যাপটপে সেভ করে তারপর পাঠাতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ভুল আবেদনপত্র পাঠালে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদনকারীর অতি অবশ্যই নিজস্ব ই-মেল আইডি থাকতে হবে এবং নিজস্ব ই-মেল আইডি থেকেই আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে— (a) সর্বাধিক ৮০০ শব্দের মধ্যে বিদেশে এই কোর্স পড়তে যাওয়ার উদ্দেশ্য লিখে পাঠাতে হবে। (b) প্রার্থী যে-ইনসটিটিউটের সঙ্গে জড়িত, সেখানকার লেটারহেডে প্রফেসর, প্রিন্সিপাল অথবা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, জে এন টাটা ট্রাস্টিকে সম্বোধন করে একটি সুপারিশপত্র পাঠাতে হবে। আবেদনপত্র, উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং সুপারিশপত্র jnte@tatatrust.org— এই ই-মেল আইডি-তে পাঠাতে হবে। আবেদনপত্র পাঠানোর পর যদি কোনো তথ্য পরিবর্তন বা যোগ করতে হয়, তাহলে তা কর্তৃপক্ষকে মেল করে অনুমতি নিয়ে করা যায়।

বাছাই-পদ্ধতি: প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত বাছাই করা হয়। এই ইন্টারভিউ পরিচালিত হয় মার্চ ও জুন মাসে, মুম্বাইতে। ইন্টারভিউ করা হয় প্রার্থীর বিষয় সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর।

বি.দ্র.: এই লোন স্কলারশিপের জন্যে বছরে ২ শতাংশ সরল সুদ ধার্য করা

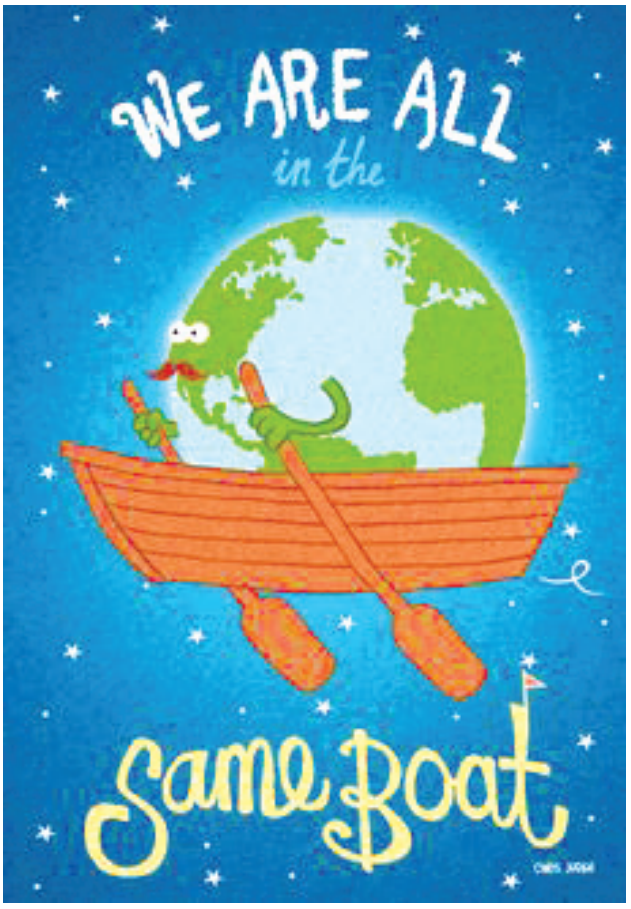

হয়। তবে কোনো প্রার্থী যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লোন ফেরত দেন, তাহলে ট্রাস্ট সুদের অংশ মকুব করে দিতে পারে।

যোগাযোগ: The J N Tata Endowment, Administrative Office, Mulla House, 4th Floor, 51, M G Road, Mumbai 400 001, Phone: (022) 6665-7681/7198/7774, ই-মেল: jnte@tatatrusts.org, alotankar@tatatrusts.org, sjadav@tatatrusts.org, srane@tatatrusts.org

ওয়েবসাইট: www.jntataendowment.org, www.dorabjitatatrust.org

ন্যাশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কলারশিপ টেস্ট (NEST), জুনিয়র স্কলারশিপ

বিবরণ: নেস্ট জুনিয়র স্কলারশিপের জন্যে একটি যোগ্যতা মাপক পরীক্ষায় বসতে হয়। দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা এই পরীক্ষায় বসতে পারে। পরীক্ষার বিষয় অনুযায়ী দুটি বিভাগ থাকে। একটি বিভাগে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ইংরেজি, যুক্তিবিদ্যা, সাধারণ জ্ঞান ও গণিত থাকে। অন্য বিভাগে থাকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীবনবিজ্ঞান। প্রায় ১৬ বছর ধরে এই স্কলারশিপ প্রদান প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এই পরীক্ষায় শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নাগরিক ছাত্র-ছাত্রীরাই বসতে পারবে।

যোগ্যতা: (i) আবেদনকারীকে দশম, একাদশ অথবা দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে। (ii) বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাই কেবল এই পরীক্ষায় বসতে পারবে। (iii) আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীকে ভারতবর্ষের যেকোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে পাঠরত হতে হবে।

আবেদন-পদ্ধতি: অনলাইন ও অফলাইন দু-ভাবেই আবেদন করা যায়। অনলাইনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করা যায়। এ-ক্ষেত্রে আবেদনকারীর একটি পাশপোর্ট সাইজের ছবি স্ক্যান করে (১০০কেবি) জেপিজি, জেইপিজি, জিআইএফ অথবা টিআইএফ ফর্ম্যাটে প্রস্তুত রাখতে হবে। আবেদন বাবদ ফিজ অনলাইনে জমা করা যায় অথবা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমেও জমা করা যায়। অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে, তা প্রিন্ট করে নির্ভুলভাবে পূরণ করে রেজিস্টার্ড পোস্ট বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফিজের ড্রাফট-সহ নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদনের ফিজ: (i) ৩১ মার্চ ২০১৬-র মধ্যে আবেদন করলে ৫০০ টাকা। (ii) ১ এপ্রিল ২০১৬ থেকে ৩১ মে ২০১৬-র মধ্যে আবেদন করলে ৬০০ টাকা। (iii) ১ জুন ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৬-র মধ্যে আবেদন করলে ৭০০ টাকা।

এই পরীক্ষায় আবেদন ফিজ একবার জমা পড়লে ফেরত দেওয়া হয় না। যুক্তিপূর্ণ কোনো কারণে পরীক্ষা বাতিল হলেও ফিজ বাবদ কোনো অর্থ ফেরত দেওয়া হয় না। অনলাইন ও অফলাইন দু-ভাবেই ফিজ দেওয়া সম্ভব। অফলাইনের ক্ষেত্রে 'SEMCI INDIA' payable at Mumbai নামে ডিমান্ড ড্রাফট বানাতে হয়। পাঠানোর আগে ডিমান্ড ড্রাফটের পেছনে আবেদনকারীর নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে পাঠাতে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ: আবেদন শুরু ৪ জানুয়ারি ২০১৬। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন ২০১৬। অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে ২৫ জুলাই ২০১৬। নেস্ট জুনিয়র পরীক্ষা ৩১ জুলাই ২০১৬। পরীক্ষার ফল ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

পরীক্ষা-পদ্ধতি: এই পরীক্ষা নেওয়া হবে পুরোপুরি অনলাইনের মাধ্যমে। পরীক্ষার সময়সীমা ২ ঘণ্টা। ২০০-টি প্রশ্ন থাকে, মোট নম্বর ২০০। সাধারণত SSC / HSC / CBSE / ICSE অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য বোর্ডের অনুমোদিত বই থেকেই প্রশ্ন তৈরি করা হয়। বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ও নম্বর নিম্নরূপ:

বিষয়	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর
পদার্থ বিজ্ঞান/ রসায়ন	৫০	৫০
গণিত	৫০	৫০
ইংরেজি	৫০	৫০
যুক্তিবিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞান	৫০	৫০

পুরস্কার: প্রথম স্থানাধিকারীকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নগদ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। যে-অনুষ্ঠানে জ্ঞানীগুণী জনেরা অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। পর পর প্রথম ২০ জনের প্রত্যেককে নগদ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া এই পরীক্ষায় ৪০ শতাংশের অধিক নম্বর প্রাপকদের একটি উৎসাহমূলক মূল্যায়ন শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

যোগাযোগ: The Director, NEST, C/O: SEMCI INDIA, B-1 Piccadilly Flats, 57-J, lare Road Byculla, Mumbai 400 008 (MS), Phone: (022) 6529-2506 / 2507, Mobile: 0897608445, ই-মেল: info@nest.net.in / support@exon.in, ওয়েবসাইট: www.nest.net.in

ওয়ার্ল্ড হ্যান্ডরাইটিং কনটেস্ট

বিবরণ: অ্যানুয়াল অ্যামেরিকান হ্যান্ডরাইটিং কম্পিটিশন (AAHC) এবং

ওয়ার্ল্ড হ্যান্ডরাইটিং অ্যাচিভমেন্ট কনটেস্ট (WHAC) অত্যন্ত সম্মানজনক প্রতিযোগিতা। যেকোনো বয়সের প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। কোনো প্রতিযোগী যদি এই প্রতিযোগিতায় তিন বার প্রথম পুরস্কার পান তাহলে তাঁকে 'লাইফ টাইম উইনারে'র সম্মান প্রদান করা হয়। যেকোনো প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারলেও লাইফ টাইম পুরস্কার বিজয়ী ব্যক্তি আর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না।

যোগ্যতা: (i) ছেলে-মেয়ে, ছাত্র-ছাত্রী, নারী-পুরুষ বা যেকোনো লিঙ্গের ব্যক্তিই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। (ii) পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের ব্যক্তি এই প্রতিযোগিতায় আবেদন করতে পারেন। (iii) আবেদনকারী যেকোনো বয়সেরই হতে পারেন। বিভিন্ন বিভাগের বয়সসীমা নিম্নরূপ: (a) চিলড্রেন: ৭ বছর বয়স পর্যন্ত। (b) প্রি-টিনস: ৮ বছর থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত। (c) টিনস: ১৩ বছর থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত। (d) অ্যাডাল্টস: ২০ বছর থেকে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত। (e) সিনিয়ারস: ৬৫ বছর ও তার বেশি।

আবেদন-পদ্ধতি: এই প্রতিযোগিতায় একজন প্রতিযোগী কেবল একটি আবেদন করতে পারেন। অনলাইন আবেদনের কোনো সুবিধা নেই। আবেদনপত্র পাঠাতে হয় পোস্টের মাধ্যমে। আবেদনপত্রে নিজস্ব নাম, পুরো ঠিকানা, বয়স, ফোন নম্বর, ই-মেল আইডি লিখে পাঠাতে হয়। এইসব তথ্য একটিই পত্রে লিখে পাঠাতে হবে। এর জন্যে আলাদা সিট ব্যবহার করা যাবে না।

প্রতিযোগীরা ফাংশনাল হ্যান্ডরাইটিং ও আর্টিস্টিক হ্যান্ডরাইটিং, এই দুটি পদ্ধতির যেকোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন। ফাংশনাল হ্যান্ডরাইটিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা হয়— স্পষ্টতা, দ্রুততা, পটুতা ইত্যাদি। আর আর্টিস্টিক হ্যান্ডরাইটিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা হয় এর শৈল্পিক প্রভাব।

প্রতিযোগিতায় পরিচালকগণের দেওয়া উদ্ধৃতি বয়সসীমা অনুযায়ী যেভাবে লিখে পাঠাতে হয়:

- ৮ বছর বয়স পর্যন্ত: পুরো উদ্ধৃতি না লিখলেও চলবে, কিন্তু উদ্ধৃতির প্রথম দুটি লাইন অবশ্যই লিখে পাঠাতে হবে।
- ১২ বছর বয়স পর্যন্ত: প্রদত্ত দুটি উদ্ধৃতির ছোটোটি পুরোটাই লিখে পাঠাতে হবে।
- ১৩ বছর এবং তার থেকে বেশি বয়স: প্রদত্ত দুটি উদ্ধৃতির বড়োটি পুরোটাই লিখে পাঠাতে হবে।

হাতের লেখার জন্যে কাগজ ও কলম:
কলম: বল পয়েন্ট কলম, ফাউন্টেন কলম, ফেল্ট-ফাইবার টিপ মার্কার, অথবা ক্যালিগ্রাফি কলম বা ব্রাশ।
কাগজ: দাগটানা বা ফাঁকা সাদা অথবা হালকা রঙিন কাগজ। কাগজে আগে থেকে কোনো কিছু ছাপা বা লেখা থাকা চলবে না। কাগজে কোনোরকম পূর্বসজ্জিত কিছু থাকা চলবে না। প্রদত্ত উদ্ধৃতির একটি কাগজে এক পিঠেই পুরোটা লিখতে হবে। লিখিত অংশ বাদে কাগজটির চারিদিকে ১-২ ইঞ্চি করে মার্জিন ছাড়তে হবে। পুরো লেখাটি কালো কালিতে হতে হবে।

বাছাই-পদ্ধতি: বিশেষভাবে যেসব বিষয়গুলি বিচার করা হয়— স্পষ্টতা, স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য, প্রবাহ, বিন্যাস, লেখার চারপাশে অক্ষরের মধ্যে দূরত্ব, লাইনের মধ্যে ফাঁক, অক্ষরের মাপের সামঞ্জস্য ও গঠন, উদ্ধৃতিটির সঠিকতা, পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য, দক্ষতা, বানান ইত্যাদি।

যোগাযোগ: World Handwriting Contest, Healthy Handwriting, Mohan Ray, 2327, Sector 22 C, Chandigarh, India 160022, Phone: Mohan Ray 0172-5067977 / 09915755177/ 09815017977, ই-মেল: healthyhandwriting@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.handwritingrepair.info/WHAC

অল ইন্ডিয়া পোয়েট্রি কম্পিটিশন

বিবরণ: পোয়েট্রি সোসাইটি মধ্য ও উচ্চশিক্ষা দপ্তর এবং ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অব হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের অনুমোদন ও সহায়তায় ভারতবর্ষ ব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। প্রবাসী ভারতীয় ও ভারতবর্ষের যেকোনো নাগরিক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। ১৯৯৮ সাল থেকে পোয়েট্রি সোসাইটি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়। যেকোনো বয়সের এবং যেকোনো লিঙ্গের প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই প্রতিযোগিতায় অন্যের লেখা কোনো কবিতা হিন্দি অথবা ইংরেজিতে অনুবাদ করে পাঠালে যোগ্যতা বিচার করে প্রশংসা পুরস্কারও প্রদান করা হয়।

শর্তাবলি: (i) এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় নাগরিক এবং প্রবাসী ভারতীয়রাই কেবল অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। (ii) একজন প্রতিযোগী একাধিক কবিতা পাঠাতে পারেন, তবে কবিতা-পিছু নথিভুক্তীকরণ বাবদ ২০০ টাকা করে পাঠাতে হবে। নথিভুক্তীকরণ ফিজ শুধুমাত্র ডিমান্ড

ড্রাফটের মাধ্যমে জমা করতে হবে। নগদ অর্থ বা চেক জমা করা যাবে না। (iii) পোয়েট্রি সোসাইটির গভর্নিং বডি এবং এগজিকিউটিভ কমিটির কোনো সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না। (iv) এই প্রতিযোগিতায় আগে প্রথম স্থানাধিকারী কোনো প্রতিযোগী পুনরায় অংশ নিতে পারবেন না। (v) প্রতিটি কবিতা অবশ্যই ৪০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে হতে হবে। (vi) কপিরাইটের আওতায় থাকা কোনো কবিতা অনুবাদ করে পাঠাতে হলে, অবশ্যই লেখকের অনুমতিপত্র নিয়ে, তার একটি স্ক্যান কপি বা ফোটোকপি আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

আবেদন-পদ্ধতি: এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যে বিভাগীয় ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে, যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্র, যেমন— স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণপত্র, অনুবাদ কবিতার ক্ষেত্রে লেখকের অনুমতিপত্র, ফিজ বাবদ ডিমান্ড ড্রাফট ও লিখিত কবিতা নির্দিষ্ট ঠিকানায় কুরিয়ার অথবা পোস্টের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। এ ছাড়া উক্ত নথিপত্র এবং আবেদনপত্রের সফট কপিও নির্দিষ্ট বিভাগে ই-মেল করতে হবে। 'The Poetry Society (India)' Payble at New Delhi— এই ঠিকানায় ডিমান্ড ড্রাফটি পাঠাতে হবে।

পুরস্কার: (i) প্রথম পুরস্কার: নগদ অর্থ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। (ii) দ্বিতীয় পুরস্কার: নগদ অর্থ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। (iii) তৃতীয় পুরস্কার: নগদ অর্থ ৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। (iv) অনুবাদ কবিতার ক্ষেত্রে সবথেকে ভালো অনুবাদের জন্যে প্রশংসা পুরস্কার: নগদ অর্থ ১০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

যোগাযোগ: The Poetry Society (India), L-67 A, Malviya Nagar, New Delhi 110 017, Phone: (011) 2674-1111, Mobile: 9891016667, ই-মেল: hkkaul@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.indiapoetry.org

গ্রিন অলিম্পিয়াড

বিবরণ: দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্সেস ইনসটিটিউট (TERI) পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক বাতাবরণের ওপর 'গ্রিন অলিম্পিয়াড' প্রতিযোগিতার একটি লিখিত পরীক্ষার আয়োজন করে। টেরি এই প্রতিযোগিতা ১৯৯৯ সালে প্রথম শুরু করে। এ-পর্যন্ত প্রায় দু-লক্ষ প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এই প্রতিযোগিতা সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE) পরিবেশ সচেতনার অঙ্গ হিসেবে সমর্থন করে। ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন (UNESCO) এবং ডিকেড অব এডুকেশন ফর সাসটেনেবেল ডেভেলপমেন্ট (DESD) এই প্রতিযোগিতাকে অনুমোদন দিয়েছে। এ ছাড়া গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্টস এই প্রতিযোগিতার পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা করে। এই প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু প্রতি বছর আলাদা থাকে। এ-বছর অর্থাৎ ৩০ অগাস্ট ২০১৬ এবং ২২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু 'OUR ENVIRONMENT'। চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরাই কেবল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। গ্রিন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীর শ্রেণি অনুযায়ী তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন— প্রথম স্তর: চতুর্থ শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি। দ্বিতীয় স্তর: সপ্তম, অষ্টম এবং নবম শ্রেণি। তৃতীয় স্তর: নবম ও দশম শ্রেণি।

শর্তাবলি: (i) প্রতিযোগীকে অবশ্যই চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণির মধ্যে পাঠরত হতে হবে। (ii) পৃথিবীর যেকোনো জায়গার ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। (iii) এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যে প্রতিটি প্রতিযোগীকে নিজের নিজের স্কুলের মাধ্যমেই আবেদন করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে পাঠানো পৃথক কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

টেরা কুইজ: স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশের ওপর এটিই প্রথম কুইজ। দৈনন্দিন স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিষয়ে টেরা কুইজে ১৩-টি পর্ব থাকে। গ্রিন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে ৩২-টি স্কুলের প্রথম ৬৪ জন প্রার্থীকে বাছাই করে টেরা কুইজ প্রতিযোগিতার জন্যে নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। এটি একটি বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা, সেখানে সাতটি দল গঠন করা হয় ভারতবর্ষ থেকে এবং আন্তর্জাতিক চারটি দল থাকে। এই প্রতিযোগিতা জনপ্রিয় বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রসারিত হয়।

আবেদন-পদ্ধতি: বিভাগীয় ওয়েবসাইট থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষকে আবেদনপত্রের খসড়া জোগাড় করে, তা পূরণ করে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা-সহ নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ভারতীয় প্রতিযোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী-পিছু ৭৫ টাকা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী-পিছু ৫ ডলার করে নথিভুক্তীকরণ ফিজ বাবদ জমা করতে হবে।

পুরস্কার: গ্রিন অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্টস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের শংসাপত্র প্রদান করে। রাজ্যের সর্বোচ্চ নগদ আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং মেরিট অব ডিস্টিংক্ট শংসাপত্রও প্রদান করা হয়। এ ছাড়া প্রথম ৬৪ জনকে টেরা কুইজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। টেরা কুইজ বিজেতাদের 'গ্রিন হিরো অ্যাম্বাসাডর' ঘোষণা করা হয়। 'গ্রিন হিরো অ্যাম্বাসাডর' খুবই সম্মানজনক। এ ছাড়াও নানান পুরস্কার এবং সম্মাননা প্রদান করা হয়ে থাকে।

যোগাযোগ: The Energy and Resources Institute (TERI), Darbari Seth Block, I HC Complex, Lodhi Road, New Delhi 110 003, Phone: (011) 24682100 / 41504900, ই-মেল: rajeswary.cbse@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.teriin.org/olympiad ■

লেখাপড়ার ফাঁকে ছোটোদের কল্পনা ডানা মেলে পাড়ি দেয় রূপ ও কথার দেশে।
দিগন্তের নীল আর পরির পালক দিয়ে সেখানে তারা রচনা করে স্বপ্নের জগৎ।
কাঁচা মনের সেইসব রং দিয়ে সাজানো এই পাতা।

স্বপ্ন

আলি আসগার লস্কর
নবম শ্রেণি, উনসানি ক্যাম্পাস

সবুজের হাসি দেখে কচি মুখে বলছে,
কাননের সাথে সে যে কত খেলা করছে।
লাল নীল চারিধারে মাথা তুলে নাড়ছে,
মনে হয় এইবার আকাশেতে উড়ছে।
চারিদিকে সবকিছু ঝোপ-ঝোপ লাগছে,
তবু শুধু মন তার উড়ে যেন ভাসছে।

বসুধার বুক চিরে পবনের স্রোত বয়,
খেচর দুহিতারূপে আমোদের গান গায়।
নারিকেল তাল বন বাঁশ বন চুপ রয়,
তারি মাঝে একা সে নিজে নিজে বড়ো হয়।
ভাবে শুধু পাশে তার কেউ নেই, একা যায়
সহস্র শতদল সবকিছু পার হয়।

একবার আকাশের বুক চিরে উঠবে,
ভুবনের সবকিছু জেনে তবে নামবে।
মনে তার ইচ্ছে প্রান্তর ছাড়বে
চারিদিকে কলরব একাই সে লড়বে?
মাঠ ঘাট পার হবে কত কিছু ঘুরবে,
জগতের প্রতি কোণে সবকিছু দেখবে।

মনে তার আছে শুধু সবকিছু ছাড়িয়ে,
গগনেতে পর্দাকে তবু ঠেলে সরিয়ে
তটিনীর স্রোত বয়ে, যাবে তবে হারিয়ে,
সমুদ্র উপকূল সবকিছু পেরিয়ে।
মাঝে মাঝে জঙ্গাল পর্বতশৃঙ্গ,
তারই মাঝে হারিয়েছে জীবনের রঙ্গ।
স্বপ্নের আলো সে পাবেই তখন,
হবে সে একদিন নবীন যখন।

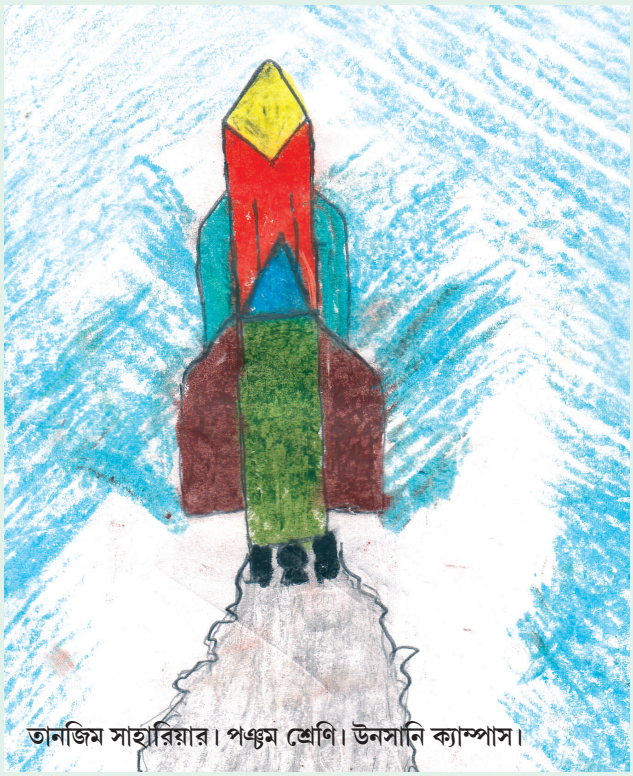

তানজিম সাহারিয়ার। পঞ্চম শ্রেণি। উনসানি ক্যাম্পাস।

মায়ের মতো

মনিরা রওশান
একাদশ শ্রেণি, মেমারি ক্যাম্পাস

সেইখানে সেই নীল আকাশ,
বৃষ্টিভেজা সুবাতাস।
সেইখানে সেই পাখির ডাক,
হাজার ফুল মধুর চাক।
সেইখানে সেই চাঁদের আলো,
গাছের পাতা লাগছে ভালো।
সেইখানে সেই গাছের সারি,
উড়ছে দেখো সবুজ পরি।
সেইখানে সেই শান্ত হাসি,
মায়ের মতো ভালোবাসি।

বনদ্বীপে আমি ভালো আছি

মহম্মদ রাইহান সরদার
পঞ্চম শ্রেণি, উনসানি ক্যাম্পাস

বনদ্বীপে আমি ভালো আছি
ভোরে পাখির কূজন আর দুপুরে বাঘের ডাক
আমাকে মুগ্ধ করে তোলে।
দুপুরে ভাত খেয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার আনন্দ
কোনোদিন ভোলা যায় না।
মাঝেমধ্যে নদীতে মাছ লাফানো
দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়তাম।
বনের মধু কাঠ সংগ্রহ করতাম।
সেখানে ঘুম-জাগানো পাখি
আমার মনে কবিতা প্রকাশ করত।

বনদ্বীপে আমি ভালো আছি।

আগমন

খাদিজা পারভিন
দ্বাদশ শ্রেণি, মেমারি ক্যাম্পাস

বনোৎসব। বনের সমস্ত প্রাণীরা তাদের সেই রোমাঞ্চকর উৎসবে মাতোয়ারা। সেই বনোৎসব তাদের কাছে ছিল হাতে আকাশের চাঁদ পাবার মতো। সেই বনের পাশে ছিল একটি ঝোপের মতো ছোটো গাছ, যে-গাছের নীচে বাস করত একটি পরি। তার কোনো আপনজন ছিল না। তাই তার খুব ইচ্ছে হয়েছিল বনের প্রাণীদের সঙ্গে তাদের সেই বনোৎসবে যোগদান করবে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। কিন্তু সেই উৎসবে যোগদান করেনি একটি সুন্দর তোতা পাখি। সেই উৎসবের দিন পরির প্রথমবার বনে আগমন ঘটে এবং সেই তোতা পাখির সঙ্গে তার দেখা হয়। সেই সময় তোতা পাখিটিকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। কারণ জিজ্ঞেস করে পরি জানতে পারে, তার প্রিয় বন্ধু অন্য তোতা পাখিটি নেই। পাখিটি পরিকে আরও বলে, কিছু দূরে ছোটো একটি দেশ রয়েছে। যেখানকার রাজা তার সিপাহিদের দ্বারা বন্ধু তোতা পাখিটিকে ধরে নিয়ে যায়। বন্ধু তোতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য পরির কাছে অনুরোধ করতে থাকে। প্রতিশ্রুতি দেয়, পরি হবে তাদের তৃতীয় বন্ধু এবং তার জন্য তারা অর্থাৎ দুই বন্ধু তোতা পাখি বড়ো আরেকটি বনোৎসবের আয়োজন করবে। আর সেই বনোৎসবের প্রধান অতিথি হবে তাদেরই বন্ধু সেই পরিটি। বন্ধুত্ব রক্ষা করার জন্য পরিটি উড়ে যায় সেই রাজার দেশে বন্ধু তোতাটিকে ছাড়ানোর জন্যে। সুন্দরী মেয়ের ছদ্মবেশে পরিটি রাজার সঙ্গে দেখা করতে যায়। পরির রূপে মহিমান্বিত রাজা সবকিছু ভুলে যায় এবং পরিটিকে বলে, সে কী চায়? সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তার অর্থাৎ রাজার প্রিয় তোতা পাখিটি চেয়ে বসে। রাজা পরিটিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে তোতাটিকে তার হাতে তুলে দেয়। পরিটি কী করবে ভেবে না পেয়ে সব ঘটনা খুলে বলে রাজাকে। রাজা মেনে নেয়। পরিটি বন্ধু তোতাকে নিয়ে বনের দিকে রওনা দেয়। বনে দ্বিতীয়বার আসে পরি। আত্মহারা বনতোতাটি 'থ্যাঙ্কস ফ্রেন্ড' জানায় এবং তারা বন্ধু পরির জন্যে দ্বিতীয়বার বনোৎসবের আয়োজন করে। তারপর পরি সবদিনের জন্যে তাদের কাছে থেকে যায়। সুখে দিন কাটাতে থাকে তারা।

মোনালিসা রহস্য

শেখ মজিবুর রহমান
নবম শ্রেণি, কেলেজোড়া ক্যাম্পাস

২৩ মার্চ

আজ দিনটা খুব সুন্দর। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা। নদীর জল আছড়ে পড়ছে। আজ বাড়িতে খিচুড়ি রান্না হয়েছে। এই ঠান্ডা মেঘলা দিনে খিচুড়ি খাওয়ার মজাটাই অন্যরকম। বৃষ্টি থামার পর বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখি, চারিদিকে শীতল বাতাস বইছে। চারিদিকে জল নালাপথের মাধ্যমে গড়িয়ে যাচ্ছে এবং শব্দ উৎপন্ন করছে। একটা সুন্দর গন্ধ আসছে। পথ, ঘাট, মাঠ সবই জলে ভরে গেছে।

২৪ মার্চ

সকালে খবরের কাগজটা পড়ে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে বিখ্যাত শিল্পী লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসার চিত্রটি চুরি হয়ে গেছে। গার্ড ও ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও কী করে চুরি হয়ে গেল! এই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়িতে এসে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুম থেকে উঠে স্নান করে ভাত খেতে বসব, এমন সময় একটা ফোন এল। ফোন রেখে খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ করে আমার ঘরে চলে গেলাম এবং বসে বসে ভাবতে লাগলাম। ফোনটা করেছিল আমার বন্ধু অ্যান্ডারসন। অ্যান্ডারসন আর আমি একসঙ্গে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলাম। এখন অ্যান্ডারসন হল ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়ামের ম্যানেজার। ওখান থেকে চুরি হয়েছে মোনালিসার চিত্র। তাই ওর ওপর একটু বেশি চাপ। ও আমাকে ফ্রান্সে ডেকেছে। এই চুরিটা কে বা কেন করেছে, সেই রহস্য সমাধান করার জন্য এবং চোরকে জেলের হাওয়া খাওয়ানোর জন্য।

২৫ মার্চ

আমি ফ্রান্সে পৌঁছে গেলাম। প্লেন থেকে নেমেই দেখি, এয়ারপোর্টের বাইরে অ্যান্ডারসন গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। গাড়িতে চেপে আমি অ্যান্ডারসনের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। সে দেখাল, ওর বাড়িতে ওর স্ত্রী, মা ও এক মেয়ে রয়েছে। সকলেই খুব ভালো। সকলেই আমাকে অভিবাদন জানাল।

২৬ মার্চ

আমি অ্যান্ডারসনের সঙ্গে তার মিউজিয়ামে গেলাম। দেখলাম, ক্যামেরায় এক আশ্চর্য জিনিস। কেউ না এসেও হঠাৎ চিত্রটি কোথাও উধাও হয়ে গেল। তারপর আর-একবার দেখার সঙ্গে-সঙ্গে আমি সব বুঝতে পারলাম। ক্যামেরা দু-মিনিট বন্ধ ছিল। ওই দু-মিনিটের মধ্যেই চিত্রটি চুরি হয়েছে। অ্যান্ডারসন বলল, বেল বাজল কেন? এটাই তো রহস্য অ্যান্ডারসন, বললাম আমি। তোমারই কোনো লোক চুরি করেছে এই চিত্রটা। আমার মনে হয়, সে চুরি করার আগে প্রথমে বেলটা বন্ধ করে দেয় এবং ক্যামেরা-রুমে গিয়ে ক্যামেরাম্যানকে অজ্ঞান করে ক্যামেরা বন্ধ করে দেয়। চুরি করার পর বেল ও ক্যামেরা চালু করে দেয় এবং চিত্রটা কোথাও লুকিয়ে দেয় এবং আবার নিজের কাজে লেগে যায়। ক্যামেরাম্যানকে ডাকলাম আমি। যা বললাম, তা-ই হল। ক্যামেরাম্যানকে অজ্ঞান করা হয়েছিল। ও বলল, কোনো একটা লোক ব্যাটম্যানের পোশাক পরে আসে আর একটা ফুলদানি দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে এবং অজ্ঞান হয়ে যাই। তারপর কিছু জানি না। আমি তাকে বললাম, তুমি যাও।

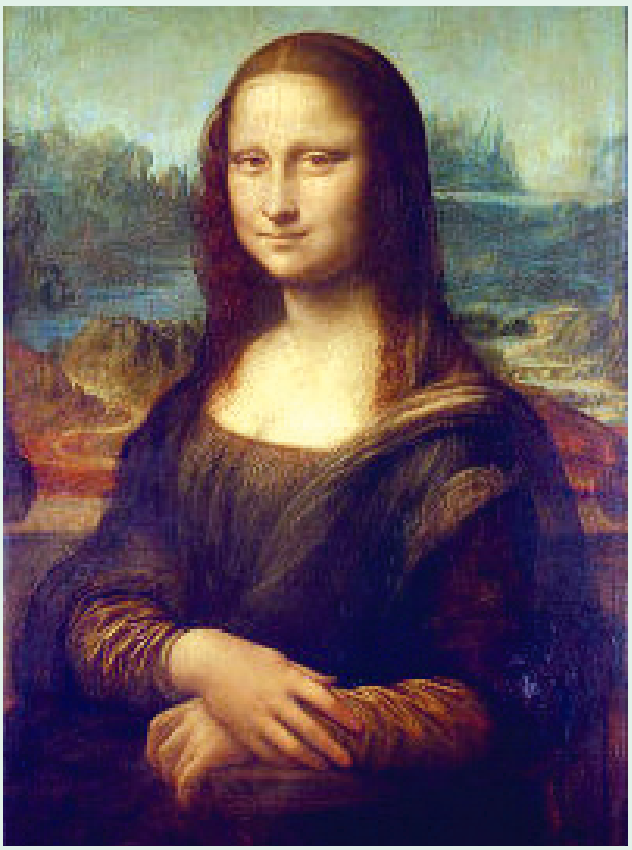

২৭ মার্চ

আমি আর অ্যান্ডারসন তার বাড়িতে বসে কফি খাচ্ছি। একটা ফোন বেজে উঠল। আমি আর অ্যান্ডারসন বেরিয়ে পড়লাম। ফোনটা করেছিল মিউজিয়ামের মালী। তিনি ফোনে বললেন, বাগানের মাঝে একটা বড়ো আম গাছে ব্যাটম্যানের পোশাকটা ঝুলছে।

আমরা ওখানে সকাল ন-টায় পৌঁছে গেলাম। আমি ভাবলাম, চোরটা বেশ বুদ্ধিমান, কিন্তু সে একটা ভুল করে ফেলেছে। এই ভুলটাই তাকে ধরাবে, এটা আমার বিশ্বাস। ভুলটা হল, চোরটা পোশাকের সঙ্গে একটা আংটি এখানে ছেড়ে গেছে। আংটিটা সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। এই আংটিটা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তৈরি হয়। যেটাতে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের নাম লেখা আছে। এটা নেপোলিয়ন মিউজিয়াম থেকে দু-তিন মাস আগে চুরি হয়ে যায়। এই খবরটা আমি পাই মুম্বাইতে। পোশাকটা থেকে ধারণা পাওয়া গেল লোকটা সম্বন্ধে, ওর উচ্চতা হল প্রায় ছয় ফুটের বেশি। যখন আমি ল্যুভর মিউজিয়ামে প্রবেশ করি তখন ছয় ফুট উচ্চতার একটা লোককে দুই নম্বর গেটে দেখেছিলাম। আর ওখান থেকে ওই আম বাগান সামনেই এবং ওই স্থান থেকে কন্ট্রোল রুমটাও কাছে। যেখানে যেতে সময় লাগে কুড়ি সেকেন্ড এবং ওই স্থান থেকে ক্যামেরাম্যানের রুমে যেতে সময় লাগে তিরিশ সেকেন্ড এবং ক্যামেরা-রুম থেকে যেখানে মোনালিসার চিত্রটা আছে, ওই স্থানে যেতে সময় লাগে দশ সেকেন্ড। এবার বুঝতে পারলে অ্যান্ডারসন। অ্যান্ডারসন বলল, আমি সবটা বুঝতে পারলাম। এবার আমি বললাম, সমস্ত পাহারাদারদের ডাকো। দু-মিনিটের মধ্যে সবাই এসে হাজির হল, কিন্তু ওদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত, যে দুই নম্বর গেটে পাহারা দিচ্ছিল। আমরা কয়েক জন ওই লোকটার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। ওর বাড়ি প্যারিস থেকে কুড়ি কিমি দূরে একটা নির্জন জায়গায়। তার বাড়িতে পৌঁছে দেখি, বাড়িতে তালা ঝুলছে। আমরা ওর বাড়ির দরজা কেটে ঢুকে পড়লাম। কিছুক্ষণ ধরে খোঁজার পর একটা কাগজ পেলাম, যেটাতে আঁকা রয়েছে, সে কীভাবে চুরি করেছে, তার বিবরণ। সে বিকেল চারটের প্লেনে লন্ডন যাবে, এটা লেখা আছে। আমরা রওনা দিলাম প্যারিসের দিকে এবং এয়ারপোর্টে তাকে আমি দেখতে পেলাম এবং তাকে ধরে ফললাম। সে বলল আমি নিয়েছি। তার কারণ, চিত্রটা ছিল আমার পূর্বপুরুষদের, যেটা মিউজিয়ামে রাখা হয়। আমি নিয়েছি, কারণ, এটাতে আমার অধিকার আছে।

সময়

নৌরিন সুলতানা
দ্বাদশ শ্রেণি, মেমারি ক্যাম্পাস

থইথই চারিদিকে। তারই মধ্যে মাথা তুলে জেগে আছে সবুজ একটুকরো দ্বীপ। গলাগলি করে সেখানে থাকে সুখ, দুঃখ, সম্পদ, দম্ভ আরও নানান-সহ প্রজ্ঞা ও ভালোবাসা। হঠাৎ একদিন জানা গেল, সবুজ দ্বীপখানি জলে ডুবে যাবে। সবাই যে-যার পথ দেখে নেয় অন্য কোথাও চলে যাওয়ার। সবাই নৌকো বানাল একে একে, চলে গেল। রয়ে গেল কেবল ভালোবাসা। থাকি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, ভাবল সে। তীরটা যখন একেবারে ডুবুডুবু, ভালোবাসার সময় হল।

নৌকো করে যাচ্ছিল সম্পদ। 'নেবে আমায়?'— ভালোবাসা শুধাল।

'দেখছো না সোনা-রুপোয় ভরা আমার নৌকো। তোমার স্বস্তিতে দাঁড়ানোর জায়গাটুকুও নেই যে।'— চলে গেল।

দম্ভ যাচ্ছিল দ্রুত গতিতে। ভালোবাসা তাকে ডেকে বলল, 'ওগো শুনছো, আমার একটু জায়গা হবে তোমার নৌকোয়?' 'ইস, কেমন ভেজা, স্যাঁতসেঁতে তোমার গা। আমার নৌকো যে নষ্ট হয়ে যাবে। তোমায় নেবই না।'— সেও চলে গেল।

দুঃখকে জিজ্ঞাসা করতেই সে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, 'নিজেকে নিয়েই বাঁচিনে, তোমায় নিই কেমন করে।'

সুখ আর আনন্দ গল্পতে এতই বিভোর আর মশগুল যে

মান্তান ওয়াসিস পাইক। অষ্টম শ্রেণি। উনসানি ক্যাম্পাস।

ভালোবাসার ডাক শুনতেই পেল না।

হঠাৎ কার ক্ষীণ কণ্ঠ, 'এসো ভালোবাসা, আমার নৌকায় নেব তোমায়।'

ভালোবাসার এতই ভালো লাগল, ডাক পেয়েই লাফিয়ে উঠল তার নৌকায় আর খুশিতে ভুলেই গেল তার নাম শুধাতে।

তীরে পৌঁছোতেই বুড়োটে লোকটি ভালোবাসাকে তীরে নামিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে চলে গেল। তীরে দাঁড়িয়ে থাকা এক বুড়ি প্রজ্ঞাকে ভালোবাসা জিজ্ঞেস করল, 'ও কে গো? আমায় নিয়ে এল?'

'সময়'— প্রজ্ঞার ছোট্ট উত্তর।

সময়! বিস্মিত হয়ে ভালোবাসা তাকাল প্রজ্ঞার মুখে। ■

সেরা মেধাবীদের সেরা প্রতিষ্ঠান ▮ উচ্চতায় অদ্বিতীয় উজ্জ্বলতায় অম্লান

আল-আমীন মিশন

মাধ্যমিকে ২০১৬-র কৃতীদের হার্দিক অভিনন্দন

দশম

শাহারুক নাওয়াজ
৬৭৪ (৯৬.২%)

দ্বাদশ

ইবতেসাম ফারহাদ
৬৭২ (৯৬%)

Appeared	Outstanding 90%–100%	Excellent (A+) 80%–89%	Very Good (A) 60%–79%
778	100	386	262

৯০ শতাংশের ওপর নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম কয়েকজন

95%

মেহেবুব আলি

95%

জাহাঙ্গির আলম

94.8%

রেশমা পারভিন

94.8%

আব্দুল মোনতাকিম

94.8%

রিজুয়ানুজ্জামান

94.7%

আসমত আলি

94.6%

আব্দুস সাবির

94%

জাসমিন নাহার

93.4%

জামাল উদ্দিন

93.1%

সেরিন সাহারিয়া

93.1%

মোনিশা খাতুন

93.1%

আজিজা আফরিন

93%

সেতারা বানু

93%

সবনম সুলতানা

93%

মোমিনুর হক

93%

ইয়াসমিন খাতুন

92.8%

তারবেজ আলম

92.5%

কৌশিক রাজা

92.4%

আশিক বিল্লাহ

92.4%

হানিফ মহাম্মদ

92.4%

আজহারুদ্দিন শাহ

92.4%

দারিণ সাহিদি

92.2%

মিনহাজুল আলম

92.2%

জারমান সেখ

92.1%

তহমিনা খাতুন

92.1%

গোলাম আম্বিয়া

92%

সাজ্জাক সেখ

92%

নূর নিহার খাতুন

92%

আশিফ আম্বিয়া

92%

আশিফ পারভেজ

91.8%

সেলিনা ওয়াহিদা

91.8%

মহ. সাহিন সেখ

সেরা মেধাবীদের সেরা প্রতিষ্ঠান
আল-আমীন মিশন

২০১৬-র জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে
কৃতীদের হার্দিক অভিনন্দন

র‍্যাঙ্ক ৩৮৮

হাসিব মোল্লা

র‍্যাঙ্ক ৪৩০

হাসিবুল ইসলাম

র‍্যাঙ্ক ৪৩৫

সরিফুল মোল্লা

র‍্যাঙ্ক ৫২৭

মাসুদ রহমান

র‍্যাঙ্ক ৫৪০

সেখ নাজিম উদ্দিন

র‍্যাঙ্ক ৫৮৯

মাসুম ইকবাল

র‍্যাঙ্ক ৮০৮

আসিকুল আনসারি

র‍্যাঙ্ক ৮৫৮

মোরসেলিম মল্লিক

র‍্যাঙ্ক ৮৮৫

সঞ্জয় মণ্ডল

র‍্যাঙ্ক ৯৭৭

ইকবাল হোসেন

এ ছাড়া আরও কিছু র‍্যাঙ্কার ১২৮৯, ১৩০৬, ১৪৬৯, ১৬৭৭, ১৮৬৩, ১৮৯৩, ১৯৩৮, ১৯৮০, ২০৩৬, ২২০৮, ২৩৩৫, ২৩৬১, ২৩৭৪, ২৪০৫, ২৮২৪, ৩০২৪, ৩০৬৩, ৩০৭১, ৩২৩৭, ৩৫২২, ৩৭০৬, ৩৭২৩, ৩৭৮৭, ৪১৬৮, ৪২১৪, ৪২৮৬, ৪৩১২, ৪৩৪৬, ৪৪০৫, ৪৫৪৭, ৪৫৬৫ ...

সাফল্য ২০১৬

ইঞ্জিনিয়ারিং	৫০০০-এর মধ্যে	৭৫০০-এর মধ্যে	১০০০০-এর মধ্যে	১৫০০০-এর মধ্যে
	৪১ জন	৬৫ জন	৮৬ জন	১১০ জন

পরীক্ষা	পরীক্ষার্থী	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	সর্বোচ্চ
মাধ্যমিক	৭৭৮	১০০	২৯৩	৪৮৬	৬০৬	৬৭৯	৭৪৮	৯৬.৩%
উচ্চ-মাধ্যমিক	১৫৩৫	৫৪	৩৩২	৮০৬	১২১৪	১৪৩২	১৫৩৩	৯৭.৪%

মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার প্রস্তুতির কোচিং (অনাবাসিক)

পার্কসার্কাস সেন্টারে ১ ও ২ বছরের ক্লাসরুম কোচিং, মক টেস্ট সিরিজ, পোস্টাল টেস্ট সিরিজে ভর্তি চলছে।

ইংরেজি মাধ্যমে **NEET** এবং **JEE (Main & Advance)** সিলেবাসের ভিত্তিতে কোচিং দেওয়া হবে।

দুঃস্থ, মেধাবী ও এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে।

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৮৩৭৩০ ৫৮৭৪৯

সেন্ট্রাল অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯